অখণ্ড সংহিতা

বা

দশম | শ্রী শ্রী স্বামী | খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

দশম খণ্ড

পঞ্চম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪১০

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী মে

সম্পাদিত।

নায়মাত্মা বলহীনেন ল

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্মার্থ শুল্ক : পঁচিশটি টাকা

(মাতৃভাষা স্বত্ব)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

প্রিন্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২০৭৬

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

দশম-খণ্ডের প্রথম সংস্করণের নিবেদন

(১)

একটা মানুষের জীবনে যত প্রকারের সমস্যা সমুদ্ভূত হইতে পারে, ''অখণ্ড-সংহিতা''র কোথাও না কোথাও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট, সুনিশ্চিত, সুষ্ঠুতম সমাধান রহিয়াছে। ইহা কোনও কল্পিত গ্রন্থ নহে। যে দিন যে-ব্যক্তি যেরূপ উপদেশের জন্য আসিয়াছেন, সে দিন তাঁহার প্রয়োজন-অনুরূপ উপদেশ শ্রীশ্রীবাবামণি দিয়েছেন। বৃদ্ধ, বালক, নারী, পুরুষ, সচ্চরিত্র, দুশ্চরিত্র, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহার কাছে আসিয়াছেন এবং নিজ নিজ প্রয়োজনোপযোগী উপদেশ পাইয়াছেন। সেই সকল উপদেশের ইহা সমাহার-গ্রন্থ। এই কারণেই শুধু এক বয়সের বা এক শ্রেণীর লোকদের উপযোগী উপদেশসমূহ ইহাতে গ্রন্থন করা সঙ্গত জ্ঞান করা হয় নাই। এই মহাগ্রন্থের যাবতীয় খণ্ডগুলির প্রকাশ হইয়া গেলে তখন এক এক রুচির এক এক শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের প্রয়োজনীয় উপদেশ সমূহ পৃথক্ ভাবে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করা হয়ত প্রয়োজন হইবে। ''ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে''। তাৎকালিক সুযোগ বুঝিয়া তাহার সদ্ব্যবহার আমরা করিব।

গ্রন্থের যেই সকল অংশ সর্ব্বসাধারণকে লইয়া একত্র পাঠ করা অসুবিধাজনক, তাহা বাদ দিয়া নিত্য পাঠ-রূপ অনুষ্ঠান অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ঐ সকল উপদেশ শত শত লোকের কাজে আসিয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষভাবে অবগত আছি। এই কারণে গ্রন্থ হইতে ঐ সকল উপদেশ বাদ দেওয়া সাধারণতঃ আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি নাই। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি—পৌষ, ১৩৫৩

(২)

[প্রাক্তন একাদশ খণ্ড হইতে]

মতামতের কলহবর্জ্জিত, সকল মত ও পথের প্রতি উদার, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা মার্জ্জিত, পরমশুদ্ধ ও সর্ব্বজীবের কল্যাণকর শ্রীশ্রীবাবামণির অপূর্ব্বজ্ঞানময় উপদেশ-সমূহ প্রকাশ করিতে আমরা একমাত্র মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার করুণায়ই সাহসী হইয়াছি। নিত্যনূতন অপ্রত্যাশিত বাধা-বিঘ্ন আমাদের গতিপথ যথেষ্ট পরিমাণে কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছে। বিঘ্ন যদি বহুও হয়, তথাপি ইহার প্রকাশ আমাদের পণ। মূল পাণ্ডুলিপির সুবিস্তীর্ণ আয়তন হইতে আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না যে, শেষ পর্য্যন্ত এই মহাগ্রন্থ কত খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অমৃতময়ী উপদেশ-বাণী "অখণ্ড-সংহিতা" রূপে প্রকাশিত হইয়া পূর্ব্ববর্তী খণ্ডসমূহে জন-সাধারণের আধ্যাত্ম জাগরণ সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এই মহাগ্রন্থ যে, দেশের চিন্তা-জগতে

নবচেতনার সঞ্চার করিতেছে, ইহা আমরা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। এই মহাগ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডসমূহের উদার উপদেশ এবং অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক গৌরব নিজ মহিমায় সহস্র সহস্র মানব-মানবীর চিত্তে নবভাব, নবাকাঙ্ক্ষা ও নবোৎসাহের সৃষ্টি করিতেছে। নগরীর দীপমালা-পরিশোভিত অত্যুজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যেও যাঁহার সুপ্রখর প্রতিভা ম্লান হইবার নহে, বর্ত্তমান যুগের অনেক খ্যাতিমান্ ব্যক্তি কৈশোরে ও যৌবনে যাঁহার নিরলস সেবা ও নিরভিমান যত্ন পাইয়া বড়দের মধ্যেও বড় হইয়াছেন, তিনি কিন্তু বড় বড় শহর পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় পল্লীর পর পল্লী পর্য্যটনে এবং চাষা-ভূষা, দিন-মজুর, ছাত্র-ছাত্রী, পেয়াদা-গোমস্তা, দরিদ্র গৃহী প্রভৃতিকে নিজ সঙ্গ দিয়া মানব-জাতির সমুন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সরল অকপট মন লইয়া সকলে সাধুসঙ্গ করিতে আসিয়াছেন, আর অন্তরের গভীরতম প্রদেশের শূন্যতা বিদূরণ করিয়া ভাবে, রসে, প্রেমে, সাহসে, শৌর্য্যে, সন্তোষে ও বিশ্বাসে তাহা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়াছেন। তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ একটি ইতিবৃত্ত এই "অখণ্ড-সংহিতা"। মানব-জীবনের এমন কোনও দুরূহ সমস্যা নাই, যাহার সমাধান শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখে কখনও না-কখনও হইয়াছে। সেই অমৃতময়ী বাণীর কিয়দংশ এই অমূল্য মহাগ্রন্থে বিধৃত হওয়াতে ইহা সর্ব্বসম্প্রদায়ের আত্মোন্নতিপিপাসু জনগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে স্ত্রী-শূদ্রের ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণবে অধিকার-প্রদায়িনী

সমবেত উপাসনার প্রবর্ত্তক। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহার প্রথম প্রচলন হয়, তখন ইহাকে প্রচারিত করিবার জন্য কোনও প্রকার বিজ্ঞাপনের জয়ঢকা ছিল না! বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ-আচার্য্যের যুগের প্রতি শ্রেষ্ঠ দান নিজ শক্তিতেই ক্রমশঃ আত্মবিস্তার করিয়াছে এবং ভারতের প্রদেশে প্রদেশে সমবেত উপাসনার বিপুল সমাদর ও বিস্তার হইয়াছে। সেই সমবেত উপাসনার প্রারম্ভে "অখণ্ড-সংহিতা" হইতে নির্ব্বাচিত অংশ-সমূহ পাঠ করিবার একটি বদ্ধমূল প্রথারও সৃষ্টি হইয়াছে। অখণ্ড-সংহিতার বর্ত্তমান খণ্ড প্রকাশের দ্বারা সমবেত উপাসনার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন সজ্জনগণের একটি উৎকৃষ্ট নূতন সাহিত্য লাভ হইল।

"প্রতিধ্বনি" পত্রিকাতে "অখণ্ড-সংহিতা"র যে অংশগুলি মাসে মাসে বাহির হইয়া পাঠকগণের চিত্তবিনোদন করিতেছিল, তাহাই এই খণ্ডে সামান্য সংশোধনের পরে পুনর্মুদ্রিত হইল। আশা করি, এই গ্রন্থখানা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদর পাইবে।

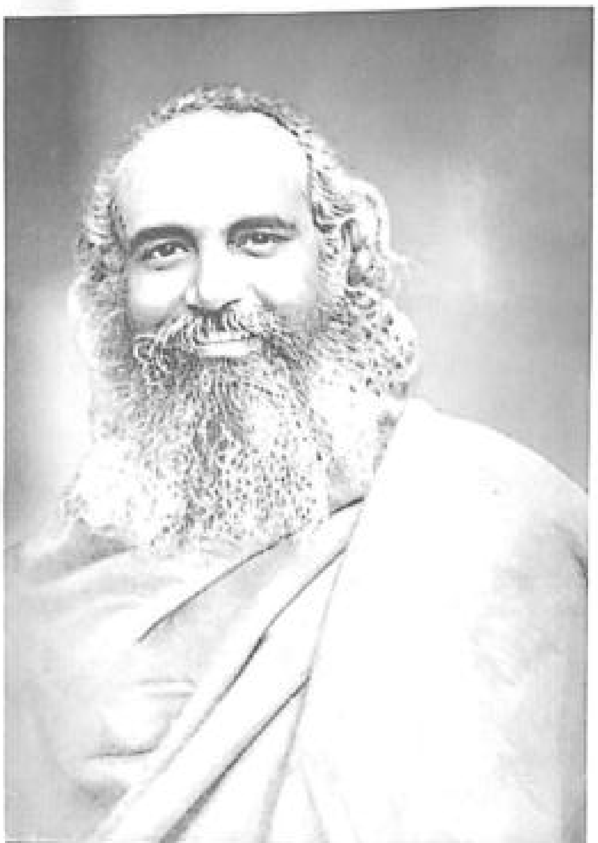
"অখণ্ড-সংহিতা"র অন্যান্য খণ্ডগুলির কোনও কোনও খণ্ড নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। উহাদের পুনর্মুদ্রণের চেষ্টা আমরা করিতেছি। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব অভিক্ষা-মন্ত্রের উদ্গাতা, তাঁহার আশ্রম অযাচক, লোকের দানের প্রত্যাশায় ইহার কার্য্য চলে না। তাই, হয়ত সময় মতন সবগুলির পুনঃপ্রকাশ নাও হইতে পারে। তাই, সর্ব্বাগ্রে নূতন খণ্ডগুলির প্রকাশের দিকে আমরা বেশী মনোযোগ দিয়াছি। সম্প্রতি,

শ্রীশ্রীবাবামণি দুই বৎসরের জন্য মৌনব্রত পালন করিতেছেন এবং একমাত্র পূর্ণিমা দিবসে অপরাহ্নে কিয়ৎকাল ব্যতীত জনসাধারণকে দর্শন দানও করেন না। এই সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব ওজস্বিতাপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ হইতে জনসাধারণ বঞ্চিত রহিয়াছেন বিধায় তাঁহার উপদেশসমূহ প্রচারের দায়িত্ব আমরা অধিকতর গভীরভাবে অনুভব করিতেছি। শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চাঁদপুর, খুলনা, রংপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ফেণী, শিলচর, কুমিল্লা, গৌহাটী, শিলং, ডিব্রুগড়, লামডিং, তিনসুকিয়া, দেরাদূন প্রভৃতি স্থান তাঁহার ধারাবাহিক ভাষণে বাগ্মিতার চরমোৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। যিনি সমগ্র জীবন পল্লীবাসীর সহিত কাটাইলেন, তিনি কয়েকটী বড় বড় শহরে দিনের পর দিন ভাষণ দিয়া, একই মঞ্চ হইতে চারি হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়া শব্দের মহীয়সী শক্তিতে শহরের প্রতিগৃহের প্রত্যেকটি সমর্থ ব্যক্তিকে টানিয়া সভাস্থলে আনিয়াছেন। ভারতের বাগ্মিতার ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কিন্তু সেই কম্বু-কণ্ঠ যেই দুই বৎসর কথা কহিতেছেন না, সেই সময়টীর মধ্যে আমরা, সমগ্র অখণ্ড-সংহিতা না হউক, অন্ততঃ যদি ইহার পঞ্চাশটী খণ্ডও প্রকাশিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে দেশ ও দশের বিশেষ হিত সাধিত হইত। তাই, আমরা সেই চেষ্টায় বিশেষ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। কিন্তু এই সুমহৎ কার্য্য সাধনের জন্য জনসাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহের জন্য অগ্রসর হইব না। ঈশ্বর-নিষ্ঠ তপোব্রত যোগীদের অযাচক নীতিকে ব্যাপক

বিস্তার দিয়া ভারত-সভ্যতার ইতিহাসে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া জন-সেবার ক্ষেত্রে যিনি আনিয়া ফেলিলেন, সেই কর্ম্মযোগ কেশরীর, সেই অলোক-সামান্য মহাপুরুষ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অভিক্ষার জাজ্জ্বল্যমান পদাঙ্ক আমরা পরম নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিব। অলমতিবিস্তরেণ, ইতি—পৌষ, ১৩৫৯।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

দশম খণ্ড

কলিকাতা
৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছেন। বহু যুবক ভক্তেরা সমাগত হইয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতার যুবকের সংখ্যাই বেশী। কয়েকজন মেদিনীপুর জেলানিবাসী ছাত্রও আছেন। আর রহিয়াছেন ঢাকা এবং বরিশাল জেলার তিন চারিজন প্রবীণ সমাজ-কর্ম্মী।

সর্ব্বক্ষণের কর্ত্তব্য

জনৈক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

জীবনের মহত্তম কর্ম্ম ঈশ্বর-সাধন। এর চেয়ে বড় কর্ত্তব্য আর কিছুই নেই। কিন্তু ঈশ্বর-সাধনের জন্য এই দেহটাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যই শরীরকে যত্ন করা, তার স্বাস্থ্য রক্ষার ও শক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য। তোমার শরীর তুমি পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছ। এজন্য তাঁদের সেবাও তোমার মহৎ কর্ত্তব্য। তোমার এই শরীরকে পোষণের জন্য সমাজের সর্ব্বস্তরের সহস্র সহস্র নরনারী প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত সেবা দিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নাই। অতএব, সমাজের সেবা তোমার মস্ত বড় করণীয়। দেশ, সমাজ, পরিবার, পরিজন সকলকে পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত ক'রে নিয়ে প্রত্যেকের সেবা কর, সেই সেবা পরমেশ্বরে পৌঁছুবে। তোমার সেবা যাতে নিষ্কাম, নিষ্কলুষ রয়, তার জন্য সর্ব্বক্ষণ তোমার কর্ত্তব্য ঈশ্বর-স্মরণ আর ঈশ্বর-সাধন।

ঈশ্বরস্মরণ ও ঈশ্বরসাধন

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—

ঈশ্বর-স্মরণ আর ঈশ্বর-সাধন, দুটী আলাদা ব্যাপার নয়। দুটাই এক জিনিষ। তবে, স্মরণ তুমি স্বার্থ নিয়ে বা নিঃস্বার্থ ভাবে কত্তে পার কিন্তু সাধন সর্ব্বক্ষণ নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ। তাঁর প্রীতিসম্পাদনই সাধনের লক্ষ্য, তোমাদের নিজের হিত, নিজের তৃপ্তি, নিজের সুখ বা এমনকি নিজের আত্মপ্রসাদও ঈশ্বর-

সাধনের লক্ষ্য হবে না।

দারিদ্র্য-বিদূরণের চেষ্টা সঙ্গত

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

যে যত দরিদ্র, পরমেশ্বর তার তত আপন, কারণ, দরিদ্রের অহমিকা থাকে না। যে যত বিপন্ন, পরমেশ্বর তার তত নিকট, কারণ, বিপন্নের আত্মাভিমান থাকে না। কিন্তু তাই বলে সাধ ক'রে দরিদ্র হওয়া আর বিপদে পড়া কোনো কাজের কথা নয়। নিজেকে আপদ-বিপদ থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা বা নিজের দারিদ্র্যমোচনের প্রয়াস ধর্ম্মীয় দৃষ্টিতে নিন্দনীয়ও নয়। অপরের অনিষ্ট না ক'রে যে ধনবান্ হতে পারে, সে হোক, দোষ কি? তবে, এ ধনের মালিক যে সে নয়, সব ধনের মালিক যে শ্রীভগবান্ এবং এই ধন ভগবানের সন্তানের সেবায় প্রযুক্ত হলেই যে সার্থক, একথা মনে রাখা চাই।

ভগবানে আপনত্ব-বোধ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

ভগবানকে আপন ব'লে ভাবতে পারলে, বিশ্বভুবন আপন হ'য়ে যায়। যাঁকে দেখ নাই, তাঁকে আপন ভাবা শক্ত। কিন্তু দিকে দিকে তাঁর বিচিত্র লীলা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে অন্তরের বিস্ময়ে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তিনি যে আছেন, যুক্তি দিয়ে এ কথা বোঝার দরকার নেই। তিনি যুক্তি ও তর্কের অতীত, তাই বিনাযুক্তিতে, বিনা তর্কে তিনি ভক্তের অন্তরের

সিংহাসনটী অধিকার করেন। তিনি নিজের গুণেই ভক্তের আপন হন। কিন্তু এই আপনত্বের বোধটী প্রগাঢ় হওয়া ভক্তের সাধনের গভীরতার মুখাপেক্ষী। এই আপনত্ব-বোধ অতীব গভীর হ'লে জীবে জীবে আপনত্ব-বোধ জন্মে। এই আপনত্ব-বোধ জগতের শান্তি আনয়ন ক'রে। এই জন্যই ধর্ম্মকে মানুষ শান্তির অগ্রদূত ব'লে জ্ঞান করে। জীবে জীবে আপনত্ব-বোধ না এলে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। যে ধর্ম্মে যত অধিক জীবের প্রতি আপনত্ব-বোধ দিয়েছে, সে ধর্ম্ম তত শ্রেষ্ঠ।

নিজের ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তির জাগরণ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

সৃষ্টি আর বিলয় দুইটীই ঈশ্বরের লীলা। দুইটীই পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন। কিন্তু সৃষ্টি লাভের পরে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পরে তুমিও একজন স্রষ্টা, তুমিও একজন সংহারকারী। অর্থাৎ তোমার ভিতরে পরমেশ্বরের শক্তির অদ্ভুত বিকাশ ঘট্‌ছে। তুমি তখন স্বাধীন, তুমি শক্তিমান্, তুমি তখন কার্য্যাকার্য্য-করণে সমর্থ পৌরুষদীপ্ত ভগবান্। তুমি তখন কাম-ক্রোধ-লোভদিগকে যদি নিজের অধীন রেখে চলতে পার, বিশ্বময় তুমি শান্তির ও শক্তির প্রকাশ ঘটাবে। যদি না পার, তুমি অশান্তি এবং দুর্ব্বলতার জনক হবে। তোমার সেই ঐশ্বর্য্যের যুগ নিতান্তই সীমিত। ক্ষণভঙ্গুর দেহটীর যতদিন যৌবন এবং প্রৌঢ়, সাধারণতঃ ততদিনই তোমার ভিতরে ঐ শক্তির বিরাজমানতা ও বিকাশ। এই সময়টুকুতে যে নিজেকে ঈশ্বর-চিন্তা থেকে দূরে রাখে না,

সে নিজ কর্ম্মফলে ঈশ্বরই হ'য়ে যায়। যে ঈশ্বরকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজের ঠুনকো অহংকারকে আশ্রয় করে, দুদিন পরে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠানহীন ও শক্তিভ্রষ্ট দেখে শুধু অনুতাপই করে। তোমার ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি জাগিয়ে তোলার জন্য তোমার সংযম প্রয়োজন। এই জন্যই ইন্দ্রিয়-দমনের সাধন ঈশ্বর-সাধনার পাদপীঠভূমি।

মহত্তম পুরুষকার

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছার নিকটে আত্মসমর্পণ জীবনের মহত্তম পুরুষকার। তিনি আমাকে দিয়ে যা করাতে চান, আমি যেন তার বাধক না হই, আমার ব্যক্তিগত সুখ-কামনা, মুদ্রাদোষ, আত্মম্ভরিতা যেন আমাকে তাঁর ইচ্ছার বিরোধী না করে, আমি যেন নিজেকে তাঁর হাতের যন্ত্রটুকু ক'রে নিতে পারি আর তিনি যেন তাঁর কাজ ক'রে নেবার জন্য আমার উপরে যত ইচ্ছা হাতুড়ির ঘা মারেন, আমি যেন তাতে দুঃখবোধ না ক'রে হাসিমুখে তা সহ্য ক'রে নিতে পারি,—এইটী হচ্ছে প্রকৃত সাধকের মেজাজ। আমার ইচ্ছা ব'লে যে জিনিষটীকে মনে ক'রে থাকি, তা যেন প্রতিনিয়ত তাঁর ইচ্ছারই অনুগত থাকে, তাঁর ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি মাত্র হয়। নিজেকে সম্মুখে রেখে নয়, তাঁকেই সম্মুখে রেখে তাঁর ইচ্ছার বৈজয়ন্তী করযুগে ধারণ ক'রে যেন অগ্রসর হ'তে পারি। জীবনের সহস্র ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়েও সর্ব্বভ্রমাতীত নিত্যজাগ্রত সর্ব্ব-ধী-সাক্ষি-স্বরূপ

সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময়কে যেন কদাচ না ভুলি, না ছাড়ি,—এইটিই হবে প্রকৃত সাধকের মনোভঙ্গী।

ভগবানকে নিয়ে তোমার সংসার

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

কাজ কর দুর্জ্জয় সাহস নিয়ে আর বিদ্বেষবর্জ্জিত মন নিয়ে। তোমার সাহসেরও উৎস হউন ভগবান, তোমার প্রাণভরা প্রেমের আকার হউন ভগবান্। ভগবানকে নিয়েই তোমার সংসার রচিত হউক। দিনে, রাতে, জাগরণে, নিদ্রায়, কর্ম্মে, বিশ্রামে ভগবান্ আর তাঁর নাম তোমার আশ্রয় হোক।

ভগবান্ প্রত্যক্ষ সত্য

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

পরমেশ্বরকে কল্পনার সামগ্রী ব'লে মনে করো না। তিনি প্রত্যক্ষ সত্য। তবে তিনি তোমার চর্ম্মচক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ নাও হতে পারেন। তিনি তাঁর কৃপাবলে তোমার অন্তশ্চক্ষুর প্রত্যক্ষ হন। তাঁকে তাঁর অপার করুণার মধ্য দিয়ে, তাঁর অসীম অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায়। তিনি উপলব্ধির ধন, তাঁকে তর্ক দ্বারা, যুক্তিদ্বারা, জিদ্ বা জবরদস্তির দ্বারা প্রত্যক্ষে আনা যায় না। তাকে মানো আর না মানো, যে-কোনও বিষয় বা বস্তুর মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিতে পারলে তিনি স্বয়ম্ভাত প্রজ্ঞারূপে প্রকাশ পান। এই যে জগতে কত কত নূতন নূতন দার্শনিক তত্ত্ব আর বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা পরমেশ্বরেরই আত্মপ্রকাশ জানবে। ধর্ম্মের সাথে বিজ্ঞানের নাকি

বড়ই বিরোধ। দার্শনিকেরা নাকি ধর্ম্মকে একেবারে কোণঠেঁশা ক'রে দিয়েছেন। সবই ভুল কথা। দর্শন ও বিজ্ঞান জেনে না জেনে কেবল পরমেশ্বরকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা কচ্ছে। যেখানে যা কিছু জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকাশ হচ্ছে, সব ভগবানেরই প্রকাশ মাত্র। তবে তা তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়, আংশিক।

অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম চিনিবার উপায়

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের মধ্যে যেখানে যেখানে কলহ বাধে, সেখানে অধর্ম্ম বেমালুম ধর্ম্মের গেরুয়া আলখাল্লা প'রে নেয়। আর ধর্ম্ম নিজেকে সমরক্ষেত্রের যোগ্য করার জন্য অধর্ম্মাচরণকেও নিজের গোত্রে ভুক্ত ক'রে নেয়। ফলে, ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম স্বরূপতঃ এক জিনিষ হ'য়ে যায়। বোতলের উপরে চক্‌চকে লেবেল চমৎকার শোভা পেতে থাকে কিন্তু ভিতরের বস্তু পঙ্কিল হ'য়ে হ'য়ে একই গিয়ে দাঁড়ায়। অন্য দিকে ভাণ কর্ত্তে গিয়ে অধর্ম্ম কতকটা সভ্যজনোচিত আকার পেয়ে আংশিক পরিশোধিতও হয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে সরলতাকে খুঁজে বের করা এবং তার পথ অবলম্বন করা। বাইরের চাক্‌চিক্য আর জাঁকজমকটা যেখানে বড়ই বেশী, মনে মনে শঙ্কিত থাকতে হবে যে, সেখানে হয়ত আসল জিনিষটার যথেষ্ট পরিমাণে ঘাটতি আছে। কিন্তু চতুর ব্যবসায়ী যেখানে সরলতার ভাণ ক'রে লেবেলের চাক্‌চিক্যটা ইচ্ছা ক'রেই কমিয়ে দেয়, সেখানে তোমার আর আমার মতন বোকা লোকদের পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের

তারতম্য-বিচার কঠিন হ'য়ে পড়ে। সেখানে লোকের প্রচারিত তথাকথিত অর্থের উপরে বেশী নজর না দিয়ে নিজের অন্তরে ডুব দিয়ে অন্তর-প্রভুর আদেশ-বাণী স্বকর্ণে শুনে নেবার চেষ্টাই সঙ্গত।

প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

শক্তি বাড়ে কিসে ? মিলনে। শক্তি কমে কিসে ? বিচ্ছেদে। মিলবার কৌশল যারা যত আয়ত্তে আনতে পারবে, তারা তত শক্তিশালী হবে। ঝগড়া-কলহ যারা যত বেশী কত্তে শিখবে, তারা তত দুর্ব্বল হবে, জীবনযুদ্ধে তারা তত হারবে। কেবল হেরে যাওয়ার এক নিদারুণ কুফল আছে। হারতে হারতে এমন অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্ত্তন আসে যে, হেরে যাওয়াটা যে কত বড় একটা আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা, তার ব্যাখ্যায়, তার বিচারে অতীব কূট ন্যায়-শাস্ত্রের অবতারণা শুরু হয়। আমি খেতে পাই না। কেন পাই না ? গরীব ব'লে। কেন গরীব ? দশজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হ'ঠে গিয়ে ভিখারীর জীবন গ্রহণ করেছি, যুদ্ধ ক'রে জয়ী হ'য়ে পৌরুষ-প্রভাবে নিজ দুঃখ নিজে দূর করার শক্তি আপাততঃ নেই। সঙ্গে সঙ্গে দর্শন-শাস্ত্র রচনা শুরু হ'ল। বল্‌তে লাগলাম, "জানিস ? না খেয়ে পেট শুকানো খুব ভাল কাজ। এতে চর্ব্বি কম হয়। এতে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। এতে ভগবদ্দর্শন হয়।" না, তা চল্‌বে না। তোমাদের পেট ভ'রে প্রত্যেককে খেতে হবে, অন্য দশ জন নিরন্নকে পেট ভ'রে

খেতে দেবার রুচি এবং সামর্থ্য লাভ কত্তে হবে, পুত্র কন্যাদের পেট ভ'রে খেতে দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তৈরী কত্তে হবে। এসব দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য-ভার তোমাদের উপরে রয়েছে। তোমরা সংগ্রামকে ভয় ক'রে জীবনকে ফাঁকী দিতে পার না। নিবৃত্তিমার্গ উত্তম মার্গ কিন্তু সে মার্গ শক্তিমানেরা গ্রহণ করুন। পরাজিত দুর্ব্বলেরা নিবৃত্তির পথে চল্‌তে গিয়ে সাত্ত্বিক নিবৃত্তিকে যে অতীব হেয় তামসিক এক বস্তুতে পরিণত ক'রে দিচ্ছে।

মিলনের মন্ত্র

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

পারস্পারিক শ্রদ্ধা, পারস্পারিক বিশ্বাস মিলনের হেতু নির্ম্মাণ করে। যেখানে একজন অপরের সঙ্গে সততা রক্ষা ক'রে চল্‌বে না, সেখানে মিলনের ইচ্ছা একটা অলীক বস্তু, মিলনের চেষ্টা একটা ব্যর্থ প্রয়াস। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ চরিত্রকে এমন ক'রে গড়ে তোল যেন মানুষেরা তোমাদের সংসর্গকে কামনা করে। তোমরা প্রত্যেকে এমন ভাবে নিজেদের তৈরী ক'রে নাও যেন, যে-কেহ তোমাদের সংশ্রবে আসে, সে-ই মনুষ্যজাতির প্রতি, তার ভবিষ্যতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ কত্তে বাধ্য হয়। মানুষকে যদি মানুষ পশুর অধম ব'লে ভাব্‌তে শিখে, তবে একে অপরের কাছে কোন্ মহদ্‌বস্তুর প্রত্যাশা কর্‌বে ? মানুষ যদি মানুষের চরিত্রের হীন দিক্‌টাই কেবল দেখতে থাকে, তবে মানুষকে বিশ্বাস করবে কোন্ সাহসে। মানুষের আচরণ যদি ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ সুখ, হেয় সুবিধাবাদ ও নীচ স্বজনপুষ্টির

উর্দ্ধে না যেতে পারে, তবে স্বার্থের হানাহানি করা ছাড়া আর অন্য কোন্ প্রয়োজনে মানুষ মানুষের সন্নিহিত হবে ? আমরা সবাই যদি নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীর বাইরে নিজেদের মন, রুচি, অভীপ্সা এবং প্রচেষ্টাকে নিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের মিলনের পথ সুগম হবে। "এস আমরা মিলি" বলে ডাক হাঁক দিলেই মিলন সম্ভব হয় না। সবাই যেখানে সমান হবে, এমন ক্ষেত্রটী নির্ম্মাণ ক'রে দিতে পারলে মিলন সম্ভব হবে, সহজ হবে। কেবল ক্ষেত্র প্রস্তুত কর। জনে জনে প্রণে প্রাণে প্রবেশ কর, সমতার মন্ত্র নিয়ে, মমতার বীণাযন্ত্র নিয়ে, নিঃস্বার্থপরতার তন্ত্র নিয়ে। তাহ'লে যা করার জন্য জগতে এসেছ, তা ক'রে যেতে পার্ব্বে।

সমদৃষ্টির সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—

সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখা এক বিরাট সাধনা। সংস্কারবশে চোখ কাউকে ছোট, কাউকে বড় দেখতে চায়। জ্ঞানের বলে চোখের সেই দোষ সংশোধন কর্ত্তে হবে। জগতের কার ভিতরে তোমার প্রাণারাম পরমেশ্বর নেই ? আছেন সকলেরই ভিতর। কিন্তু তিনি যে আছেন, তা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। দেখতে পাচ্ছ না বলেই তিনি নেই, তা নয়। তুমি দেখতে পাচ্ছ না বলেই তাঁকে অবজ্ঞা করবে, এ ত' হ'তে পারে না। সর্ব্বজীবের ভিতরে তাঁকে প্রণাম কর, সর্ব্ববস্তুর ভিতরে তাঁকে অন্তরের অকপট ভক্তি জানাও। চেষ্টা ক'রে এই প্রত্যয় অন্তরে জাগাতে

থাক যে, তিনি আছেন, সর্ব্বত্র আছেন সর্ব্বভূতে আছেন, সর্ব্বদা সর্ব্বকালে সর্ব্বতোভাবে আছেন। ছোট, বড়, হেয়, আদরণীয়, সবল, দুর্ব্বল, ক্ষণিক, শাশ্বত, ভঙ্গুর, অক্ষয় সব কিছুতে তিনি আছেন, তিনি ছিলেন তিনি থাকবেন।

অবিরাম নাম কর

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—

অবিরাম নাম কর। নামের মধ্য দিয়ে প্রেম আহরণ কর। এই প্রেম বিশ্বজনে বিলাও। এই প্রেমের স্পর্শে সকল আত্মসুখী মানুষের সঙ্কীর্ণতা নাশ কর। এই প্রেমের মহিমায় কলহ-কোলাহলে অশান্তির ধরণীকে শান্তির আগারে পরিণত কর। নামের সেবার প্রত্যক্ষ ফল এই যে, নামে বিশ্বাস আসে, প্রেম আসে। সেই বিশ্বাস, সেই প্রেম বিশ্বজনীন হয়। নামের গুণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রেমময় হ'য়ে যায়। নামের গুণে পরমদয়াল ভগবান্ সর্ব্বভূতে আত্মপ্রকাশ করেন, সর্ব্বস্থানে শরণাগত ভক্তকে দর্শন দেন। নামের চেয়ে মহত্তর বান্ধব তোমার আর কেউ নেই, এই বিশ্বাস থেকে কদাচ স্খলিত হয়ো না। সুতরাং অবিরাম নাম কর, অবিশ্রাম নাম কর। নামকে জীবনের সার কর।

চরিত্রের আন্দোলন চালাও

শ্রীশ্রীবাবামণি অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

সম্পদ অনেক লোককে বিপথে চালিত করেছে। এই জন্যই ভগবান্ তাঁর প্রিয়জনদের দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ দিয়ে

সৎপথে ধ'রে রাখেন। এই যে একটা কথা ঋষি-মুনিদের মুখে সর্ব্বদা শুনছি, কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত হ'য়ে তোমরা জীবনের উদ্দেশ্যকে বিকৃত ক'রো না। সহস্র অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েও সরল মেরুদণ্ডে সংসারে বিচরণ করার সৎসাহস ভগবানের চরণে নিয়ত প্রার্থনা করবে। ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি, বিত্ত-বেসাত অধিকাংশ মানুষের মনকে দুর্ব্বলতার আকর ক'রে রেখেছে। বিত্তহীন হ'য়েও চরিত্রধনে ধনী থাকার গৌরব কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য লাভের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। দেশের প্রত্যেকটী লোককে তোমরা চরিত্রবান্ করার সাধনায় অবতীর্ণ হও। এই যে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধ'রে ভারতবর্ষে এক স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমশঃ চারিদিকে বিস্তারিত হচ্ছে, চরিত্রকে তার মেরুদণ্ড করা হ'য়েছে ব'লেই শাসকরা এই আন্দোলন সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত। বাংলায় যখন প্রথম আন্দোলন শুরু হয়, তখন নেতারা চরিত্রটাকেই সব চেয়ে বড় ব'লে জ্ঞান করেছেন। মানুষের জীবনে মুখ্য প্রয়োজন চরিত্রের, তার পরের প্রয়োজন ধন-সম্পদের। দরিদ্রেরা সব দিক সামাল দিয়ে চলতে পারে না, তাই অভাবের দায়ে চুরি করে,—একথা যেমন সত্য, সম্পৎশালীরা অর্থের ব্যবহারের সত্যিকারের পথ খুঁজে পায় না, এজন্য অতি কুৎসিত কদর্য্য কাজে বিপুল ধনক্ষয় করে এবং নগদ মূল্য দিয়ে নিদারুণ ব্যাধি সব ক্রয় করে আর জাতিধ্বংসের বীজাণু দেশময় ছড়ায়—একথাও তেমন সত্য। তোমরা রাজনীতি কর আর না কর, চরিত্রের আন্দোলনকে প্রবল ভাবে চালাও। তাতে দেশের কল্যাণ হবে।

রাজনীতিতেও চরিত্রবল আবশ্যকীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ধরে নাও, একদিন তোমাদের দেশের স্বাধীনতা এল কিন্তু তোমাদের চরিত্র শিথিল। সঙ্গে সঙ্গে নানা কদর্য্য ব্যাপার শুরু হ'য়ে যাবে। ক্ষমতা হাতে নেবার জন্য লোককে তোমরা ঘুষ দেবে, লোকেরা তুচ্ছ কিছু অর্থের লোভে বা অন্য কোনও স্বার্থের প্রত্যাশায় নিজ নিজ বিবেক অবহেলে বিক্রী করবে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে দরকার হ'লে অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমরা গুপ্তহত্যা করবে বা তার প্রশ্রয় দেবে। দুষ্ট দমনের ক্ষমতা তোমরা হারিয়ে ফেলবে, শিষ্টদের পালন কত্তে তোমরা অক্ষম হবে। তোমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থকে দেশের স্বার্থ বা জাতির কল্যাণ ব'লে ব্যাখ্যা কত্তে তোমাদের লজ্জা হবে না। মানুষের হাহাকার তোমাদের হৃদয়ে পাষাণ গলাতে অক্ষম হবে, তোমরা নিজেদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বুঝতে পেরেছ, তার চেয়ে বেশী কেউ বুঝলে তাকে কৌশলে দাবিয়ে রাখবার জন্য ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করবে। মোট কথা, চরিত্রের সাধনাকে যদি সমগ্র জাতির সর্ব্বস্তরে না প্রসারিত কত্তে পার, তাহ'লে রাজনীতি কত্তে গিয়ে তোমরা দেশের সেবা বা জনগণের কল্যাণ কিছুই কত্তে পার্ব্বে না। স্বাধীনতা প্রাংশুলভ্য ফল, অনেক সাধনায় মিলে। কর্ম্মের প্রতাপে বা দৈবের অনুকূলে যদি তা পেয়ে যাও, তবে তাকে রাখবার জন্যও প্রচণ্ড পৌরুষ এবং চরিত্রবলের দরকার। যে জাতির নেতৃস্থানীয়েরা চরিত্র-ভ্রষ্ট, সে জাতির জনসাধারণের কথা আর ব'লে লাভ নেই। সে জাতি

দীর্ঘকাল ধ'রে অশেষ দুঃখ ভোগ কত্তে বাধ্য হয়।

দেশ-সেবা এবং বিশ্বসেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

মনকে দেশ-কালের উর্দ্ধে তুলে নিয়ে তুমি তোমার দেশের সেবা কর, তোমার সংঘের বা সম্প্রদায়ের সেবা কর, তুমি তোমার কালের উপযোগী ভাবে সকল সমস্যার সমাধান কর। এভাবে যদি কাজ কর, তাহ'লে তোমার কাজের একটী শাশ্বত মূল্য হ'য়ে যাবে, যার দরুণ তার ফল অনাগত কালের অনাগত মনুষ্যসমাজ সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে দেশনিরপেক্ষ হ'য়ে পাবে। কিন্তু বিশ্বজনীনতার নাম ক'রে তুমি যদি এমন কাজ কর, যার ফলে তোমার সমাজ, তোমার দেশ, তোমার জন্মভূমি তোমার পিতৃপুরুষাগত শুভসংস্কার ও ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হ'তে পারে, তবে তেমন বিশ্বজনীনতাকে এক প্রকারের আত্মপ্রতারণাই জানতে হবে। মহাত্মা বা মহাপুরুষ সাজতে গিয়ে জগতে অনেকে অনেক সময়ে এমন অনেক মারাত্মক ভুল করে, যার মাশুল তাদের পরবর্ত্তী কালের লোকদের কড়ায় গন্ডায় শোধ কত্তে গিয়ে সর্ব্বস্ব হারাতে হয়। উচ্চ চিন্তার সঙ্গে নীচ জীবনের কোনও আপোষ হ'তে পারে না, একথা যেমন সত্য, উচ্চ চিন্তার প্রেরণায়ই সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, ছোট ছোট কর্ত্তব্যগুলিকে সম্পাদন ক'রে যাওয়ার চেষ্টাও অত্যন্ত আবশ্যক, এ কথাও তেমন সত্য। সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেমিক হ'য়ে দেশের মানুষের মন থেকে হিংসার ভাব দূর ক'রে দেওয়া যেমন প্রশংসনীয়

কাজ, দেশবাসীর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে হিংসকেরা দেশের শান্তির বনিয়াদ ডিনামাইটে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা কর্লে, তাকে প্রতিরুদ্ধ কর্ব্বার জন্য সীমাবদ্ধ স্বীয় সমাজটুকুর প্রতি যথেষ্ট দরদ রাখা এবং তার জন্য প্রয়োজন হ'লে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া তেমন অতিশয় শ্লাঘ্য কাজ জানবে। দেশের সেবায় এবং বিশ্বসেবায় বিরোধ নাই, যদি তুমি দেশকে বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লে জ্ঞান কর।

জৈব প্রেম আর দৈব প্রেম

আর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

প্রেমের গতি অবাধ। সর্ব্বত্র তার রাজত্ব। ধনীর প্রাসাদ আর দরিদ্রের কুটীর সর্ব্বস্থানে সে সমান শক্তিমান্। সুখবিলাসীর ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যেও প্রেম, দুঃখ-বিদলিতের অন্তহীন অনটনেও প্রেম। বিলাসের পালঙ্কে আর ধরার ধূলিতে সব স্থানে তার প্রকাশ। নগরীর কোলাহলে আর অরণ্যের নিঃস্তব্ধতায়, সর্ব্বত্র তার লীলা। প্রেমকে, তার শক্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রেম যখন জৈব সুখের হীন লিপ্সাকে তার লক্ষ্য করে, তখন সে অধিকাংশ সময়েই সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। প্রেম যখন দৈবী সম্পদ-রূপে নীচ লালসার উর্দ্ধে নিজেকে টেনে তুলে নেয়, তখন সে সাধারণ মানুষকে দেয় ঋষিত্ব, দুর্ব্বল জাতিকে দেয় অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার। তাকেই জানবে প্রকৃত প্রেম। সেই প্রেমের পিয়াসী হও।

সতর্কতা সব সময়েই ভাল

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—মহাজ্ঞানী শক্তিধর পুরুষেরা যে প্রলোভনকে নিজের কাছ থেকে দশ যোজন দূরে রাখতে ব্যগ্র, অজ্ঞান মানব তাকে বুকের কাছে টেনে আন্‌তে চায় আর মনে মনে হিসাব করে, নিজের ধৈর্য্যশক্তির, সংযমশক্তির, আত্মদমন-সামর্থ্যের পরীক্ষা কচ্ছি। এরূপ নিশ্চিন্ত নির্ব্বোধদের পা অধিকাংশ সময়েই পচা শামুকে কাটা যায়। শক্তিমান্ তুমি যতই হও, সাধ ক'রে কদাচ প্রলোভনের সম্মুখে যেও না বা আদর ক'রে প্রলোভনের বস্তু, প্রলোভনের পাত্র, প্রলোভনের বিষয় নিজের কাছে টেনে এনো না। নারীমুখ দেখব না, এ জিদও যেমন অশোভন, নারীদের মধ্যে গিয়ে কেবলই মাখামাখি কর্ব্ব, অকারণ ঘনিষ্ঠতা জমাব, এ অভ্যাসও তেমন মারাত্মক। প্রত্যেক নারীর ভিতরে বিশ্বমাতাকে দর্শন কর কিন্তু নিজের আর তার মধ্যে অতি-নৈকট্য ঘট্‌তে দেবে না। সতর্কতা সব সময়েই ভাল।

কুবলিনী-কথা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন, —শোন তাহলে একটা গল্প। কুবলিনী গণিকা। সারা যৌবন সে বিলাসীদের মনোরঞ্জন করেছে। কিন্তু সাধু-সন্তদের সঙ্গ সে কখনো পায় নি। একদিন মনে মনে ভাবলে আচ্ছা, বেশ ত' কিছুদিন সাধু-সঙ্গ ক'রেই দেখি না, সঙ্গগুণে ভোগের পথ ছেড়েই যদি দিতে পারি, মন্দ কি, সেই নূতন জীবনটার একটি আস্বাদন নিয়ে দেখ্‌ব। যদি তা ঘ'টে না

ওঠে, অন্ততঃ নামজাদা সাধুসজ্জনেরা কেমন ক'রে কোন্ কৌশলে সঙ্গোপনে ভোগবিলাস করেন, তারও ত' নমুনা দেখ্‌তে পারব। কত রকমের লোক আমার কাছে আসে, সকলের সঙ্গ কি একই রকম লাগে ? শহরের ধনী আর গ্রামের চাষা, শিক্ষিত বিদ্বান্ আর অশিক্ষিত মজুর, এরা সবাই কি এক রকম অভিজ্ঞতা রেখে যায় ? এবার সাধু-সন্ত-মহাপুরুষদের দেখ্‌তে হবে। যেমন কথা, তেমন কাজ। কুবলিনী দামী দামী পোষাক পরিচ্ছদ ছেড়ে দিল, গায়ের মুখের পাউডার-পমেড মুছে ফেল্‌ল, ঠোঁটের লিপষ্টিকের দাগ দূর কর্ল্ল, চোখের কাজল তুলে ফেল্‌ল ; সাদাসিধা পোষাক প'রে কপালে সুন্দর একটী সিন্দূরের ফোঁটা দিয়ে সামান্য কিছু জিনিষপত্র দিয়ে একটা পুঁটলী বেঁধে রওনা হ'ল নিরুদ্দেশের যাত্রায়। পথে একজন অপরিচিত লোক জিজ্ঞাসা কর্ল্ল,—কোথা যাও। জবাব দিল হরিদ্বার। একা কেন ? আমার স্বামী সাধু হ'য়ে বেরিয়ে গেছেন, তাই তাঁর খোঁজে। এ দুরবস্থা তোমার কতদিনের ? আজ বারো বছর। সন্তানাদি ? কিছু হয় নি। হবে কি ক'রে, উনি কি বিয়ে করার পরে আর কাছে আসতে দিয়েছেন ? দুর্ভাগিনী আমি, চিরদুঃখেই দিন গেল। পথিকের দয়া হ'ল। সঙ্গে ক'রে নিয়ে এক সাধুর আশ্রমে তুলে দিল। সাধুর নাম চৈতন্য মহারাজ। সর্ব্বদা সচেতন। একটী নিমিষের জন্যও মন আসল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় না। চৈতন্য মহারাজ কুবলিনীর সব ইতিহাস শুনে বল্লেন,—মাগো, এ আশ্রমে তোমার স্থান হবে না। আমার চেয়ে অনেক বড় সাধু আছেন সাম্‌নের চটিতে ! সেখানে যাও। হাঁ, তবে ফলমূল খাও, ঐ

দূরের ঘরটীতে বিশ্রাম কর, তারপরে যত সত্বর পার চল। হরিদ্বার দু-দশ ক্রোশের রাস্তা নয়। পথে পথে অকারণ দেরী ক'রো না। কুবলিনী বল্লে, না প্রভু, এত তাড়াতাড়ি যেতে পার্ব্ব না। আমি এখানে এক হপ্তা থাক্‌ব, সাধুসঙ্গ কর্ব্ব। চৈতন্য মহারাজ বল্লেন—তবে যাও ঐ আধ মাইল দূরের গৃহস্থ-বাড়ী। সেখানে গিয়ে তাদের ঘরের মেয়েদের সঙ্গে রাত্রিযাপন কর। আমার আশ্রমে আসতে চাও ত' দিনের বেলা এস। উপদেশ দেবার আমার কিছু নেই, সময়ও নেই, ইচ্ছাও নেই। ঠাকুর-দালানের বারান্দায় বসে যত ইচ্ছা নামজপ কর, কেউ বাধা দেবে না। তবে সন্ধ্যা হবার আগেই চ'লে যেতে হবে। এদিকে দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, কুবলিনী আর যায় না। চৈতন্য মহারাজ বল্লেন, —তুমি না তোমার স্বামীর সন্ধানে বেরিয়েছ ? কুবলিনী দেখল, একমাস ধরে অনেক কৌশল ক'রেও চৈতন্য মহারাজের মন কণামাত্র আকর্ষণ করা গেল না, তবে এখানে আর পণ্ডশ্রম ক'রে লাভ কি ? কুবলিনী এগিয়ে চল্‌ল। অনেক দূরে যেতে যেতে একটা মন্দিরের মত দেখা গেল। সেখানে খুব শঙ্খঘণ্টা বাজ্‌ছে। অনেক স্ত্রী, অনেক পুরুষেরা, কেউ উলুধ্বনি দিচ্ছে। মস্ত এক উৎসব। কুবলিনী ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। মন্দিরের ভিতরে গিয়ে পূজায় রত সাধু রামহরির পাশখানটায় বসে পড়্‌ল। নানা দেশের লোক জড় হয়েছে, কে কাকে চেনে? অনেকে মনে মনে ভাব্‌ল কুবলিনী বুঝি সাধু রামহরির কোনও আত্মীয়া। কেউ কেউ কুবলিনীকে প্রণামও কত্তে লাগ্‌ল। কেউ

কেউ প্রণামীও দু-চার টাকা ফেলে দিল। আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি কত্তে লাগল। একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা কত্তে লাগ্‌ল, ইনি কে ? অপরিচিত নূতন লোকদের মধ্যে একটী ফাজিল ছোক্‌রা বলে উঠ্‌ল, জানিস্ না? ইনি হচ্ছেন ঠাকুর মশায়ের সহধর্ম্মিণী। বারো বছর ধরে ছেড়ে এসে ইনি দিব্যি গুরুগিরি কচ্ছেন, বউটা যে ঘরে প'ড়ে কেঁদে মরল, তার দিকে নজর নেই। যেমন বলা, সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক মা মা বলে চীৎকার ক'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল আর প্রণামের ভিড় প'ড়ে গেল। মা এতদিনে এলি মা, সন্তানদের কথা মনে পড়্‌ল মা, —ব'লে কত ভক্ত কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিল। সাধু রামহরির ধ্যানভঙ্গ হ'ল। চারদিক তাকিয়ে দেখছেন আর ভাবছেন কি হ'ল ? লোকগুলি এত বিহ্বল কেন ? সবাই কুবলিনীকে নিয়ে মা মা কচ্ছে। তাঁর মনে হ'ল, ঠিকই ত'। তবে ত' জগন্মাতাই স্বরূপ কায়া ধারণ ক'রে এসে পড়েছেন। মা মা বলে চীৎকার ক'রে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম কত্তে গেলেন। কুবলিনী বল্লে, —কচ্ছ কি, কচ্ছ কি, তুমি যে আমার স্বামী, আমি যে তোমার স্ত্রী, আমাকে তুমি কি ক'রে প্রণাম কর? ছিঃ! লোকে বল্‌তে লাগ্‌ল, দেখেছ! রামহরি ঠাকুর একেবারে রামকৃষ্ণ পরমহংস। আগেই আমরা জানি, ইনি সামান্য লোক নন। রামহরি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, —তাই ত'। চিনতে ত' পাচ্ছি না। তবে স্ত্রী যদি হয়, হোক্ গে। মঠে তাকে থাক্‌তে দিব না। সে ঐ বাইরের বাড়িতে গিয়ে বাস করুক। এখানেও মাস পেরিয়ে যায়। কোনও কৌশলেই কুবলিনী আর সাধু রামহরিকে

বাগে আনতে পাচ্ছে না। এদিকে মায়ের নামে পাগল ছেলের দল কুবলিনীর জন্য আলাদা ক'রে এক বিরাট আশ্রম তৈরী করেছে। কিন্তু কুবলিনী যা চায়, তা না পেলে এসব দিয়ে কি হবে ? ভগ্নমনোরথ হ'য়ে একদিন কুবলিনী নিশাযোগে অন্তর্ধান কর্ল্ল। আবার নূতন দেশ, আবার নূতন সাধু। সাধুটীর বয়স হ'য়েছে। মাথায় জটা বিড়া যেন ছোটখাট একটী পাহাড়। নাম ধুন্ধুরাম বাবাজী। কুবলিনীকে দেখেই তার মনে হ'ল, বেশ সুন্দরী, শরীরের গড়নটাও ভাল। আহা, কণ্ঠস্বর কি মিষ্টি। স্বভাবটীও ত' চমৎকার! নিশ্চয় উচ্চ কুলে জন্মেছে। কপালের সিন্দূর এয়োতির চিহ্ন কিন্তু এসেছে একাকিনী। আমি দীর্ঘকালের তপস্বী। কি হবে এর দ্বারা আমার ক্ষতি ? আহা, একলা মানুষটী, একটা আশ্রয় চায়, থাকুক না এখানে। আমারও বাসন-কোশন মাজার জন্য, ঘর ঝাঁট দেওয়ার জন্য একটী লোকের দরকার। হাঁ, আমার ঘরের পাশের ঘরেই থাকুক, যেন সময়ে অসময়ে ভালমন্দ দেখাশুনা কত্তে পারি। বিপন্নের প্রতি যে দয়া না করে, সে ত' নিষ্ঠুর পাষাণ। আর, এত দিনের তপস্যার পরেও যদি এর দ্বারা আমার কোনো অনিষ্ট হয়, তবে ত' আমি একটা দারুণ ভণ্ড আর কাপুরুষের চরম। কুবলিনী আশ্রয় পেল। নূতন মাটিতে বসবার স্থান পেয়ে আস্তে আস্তে তার শিকড় মাটির তলায় চতুর্দ্দিকে ধুন্ধুরাম মহারাজের অলক্ষিতেই ছড়িয়ে পড়্ল। তারপরে আস্তে আস্তে আকাশ ছেয়ে শাখা-প্রশাখার বিস্তার হ'ল। একদিন দেখা গেল সাধু ধুন্ধুরাম পর্ব্বতের উদ্গত অংশে দাঁড়িয়ে অলকানন্দায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগের

আয়োজন কচ্ছেন। পথচারী একজন সাধু জিজ্ঞেস কর্ল্লেন,—আরে মহারাজ, ব্যাপার কি ? ধুন্ধুরাম বল্লেন,—অতি সহজ ব্যাপার, অতি সরল ব্যাপার। নিজেকে অত্যধিক শক্তিশালী জেনে আমি অসাবধান হয়েছিলাম। আমার সমস্ত জীবনের তপস্যা এতে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। এমন আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব ! পথচারী সাধু বল্লেন,—প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে নয়। আবার ফিরে গিয়ে নূতন ক'রে জীবনের সাধনা শুরু করুন। একবার ভুল করেছেন, আর যেন না করেন।

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েকজনকে কয়েকখানা পত্র লিখিলেন।

মানুষ হও

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী জনৈক বিহারী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"Be a man and a man of supreme genuineness. It is not your bank account that will tell me what you are. It is your sincere service for man and God that will tell me what you are worth. Testify by your unimpeachable character alone that you are really a child of mine. The real test of my life-long labours lies in the man that they may produce."

[বঙ্গানুবাদ :—মানুষ হও, পূরা খাঁটী মানুষ হও। ব্যাঙ্কে তোমার কত টাকা আছে, তাহা দিয়া তোমার পরিচয় হইবে না। মানুষ এবং ভগবানের জন্য তোমার অকপট সেবার ভিতর

দিয়াই তোমার যোগ্যতার পরিমাপ হইবে। একমাত্র তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের দ্বারা প্রমাণিত কর যে, তুমি আমার সন্তান। আমার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের প্রকৃত পরিচয় হইবে তাহাদের দ্বারা, যাহারা ইহার ফলে গঠিত হইবে।]

তুচ্ছ জিনিষ তুচ্ছ নয়

রহিমপুর আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শত শত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আসিয়া তোমাদের কাজে যোগ দিল না, এই দুঃখ মনে পোষণ করিও না। ছাগল দিয়া গরুর কাজ, গাধা দিয়া ঘোড়ার কাজ, নিরক্ষরকে দিয়া স্বল্পাক্ষরের কাজ, স্বল্পাক্ষরকে দিয়া বিদ্বানের কাজ তোমাদিগকে করাইতে হইবে। এক দিকে ইহাই যেমন প্রয়োজন, অপর দিকে ইহা তোমাদের কৃতিত্বের বর্দ্ধক হইবে। নির্ব্বোধকে দিয়া অল্পবুদ্ধির কাজ, আর স্বল্পবোধকে দিয়া মহাবোধের কাজ করাইতে হইবে। যার যতটুকু শক্তি এবং যোগ্যতা, তাকে দিয়া তাহার অধিক কাজ করাইবার কৌশল তোমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে। প্রতিভাবান্ সহকর্ম্মী পাইতেছ না বলিয়া আফশোষ কেন? সঙ্ঘের কাজে আনুগত্যের চেয়ে কি প্রতিভার মূল্য বেশী? প্রতিভাবানেরা সকল সময়েই প্রতিষ্ঠানের আয় নহে, ইহারা অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠানের অপব্যয়। ক্ষুদ্র ছল, তুচ্ছ ছুতা শক্ত খুঁটিতে ধরিয়া জোড়া প্রতিষ্ঠানকে তিন টুকরা করিয়া ভাঙ্গিবার শক্তি প্রতিভাবানের মধ্যেই বেশী থাকে। ব্যক্তিত্ববোধ ও অহমিকাকে

অনেক স্থলে প্রতিভাবানেরা ভদ্র ভাষার ও মিষ্ট ব্যবহারের আবরণে লুকাইয়া রাখে। সুতরাং যে আসিতেছে, তাহাকেই আদর করিয়া বুকে তুলিয়া লও। গুরুগোবিন্দ পায়রা দিয়া বাজের সাথে লড়াই করাইয়াছিলেন, তোমরা তুচ্ছ নগণ্য সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা অসামান্য কাজ করাইবে। তুচ্ছ জিনিষও তুচ্ছ নয়, যদি তার সদ্ব্যবহার করিতে জান।"

মাতৃ-পিতৃসেবা

ময়মনসিংহ-শেরপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"শাস্ত্রে আছে, পিতার সেবায় ইহলোক, এবং মাতার সেবায় পরলোক জিত হয়। অর্থাৎ পিতৃসেবার ভিতর দিয়া ইহকালের সুখ, শান্তি ও সৎকীর্ত্তি এবং মাতার সেবার ভিতর দিয়া পরলোকের শান্তি, আনন্দ ও পরিতৃপ্তি অর্জ্জিত হয়। এ-কথাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিও না। অন্য যে আদর্শকেই ভাল বলিয়া বোধ কর, তাহার সেবা মাতৃ-পিতৃ-সেবার অবিরোধে করিতে চেষ্টা পাইও। পিতার আশীর্ব্বাদে শরীর শ্রমক্ষম এবং মাতার আশীর্ব্বাদে মন শ্রমক্ষম হইয়া থাকে। ইহাদের অকপট আশিস সংগ্রহের চেষ্টায় কৃপণতা সঙ্গত নহে। সে চেষ্টায় তুমি কৃপণ হইও না। আশ্রমে আসিয়া ত্যাগীর জীবন যাপন করিতে চাহ, ভাল কথা। এখানে আসিয়াও অনুগত হইয়া জীবন গঠন করিতে হইবে, —নিজে বেশী বুঝিলেও অপর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে আচার্য্য মানিয়া তাঁহার উপদেশ পালনের মধ্য দিয়া জীবন গঠনের অক্লান্ত শ্রম করিতে হইবে। কিন্তু যে

ব্যক্তি নিজ গৃহে পিতামাতার অবাধ্য হইয়াছে, সে এইখানে আসিয়া কি করিয়া নম্র, বিনীত ও আজ্ঞাবহ হইবে? ইহা বিশেষ বিবেচনার কথা। একস্থানে যে দুর্ব্বিনীত অভ্যাসসমূহের অনুশীলন করিয়াছে, অন্যত্র আসিয়া সে সেই অভ্যাস পরিবর্ত্তিত করিবে কি করিয়া? চেষ্টা করিতে গেলেও বারংবার পূর্ব্বসংস্কার তাহাকে দিয়া অবাঞ্ছিত আচরণ করাইয়া লইবে। এইজন্যই আমার উপদেশ বর্ত্তমানে তোমার জন্য এই যে,—'পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব,'—পিতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা দ্বারা প্রসন্ন কর, মাতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তির দ্বারা আপন কর। পিতামাতাকে সেবা করিতে শিখিলে, সেই শিক্ষা নিখিল জগতের সেবায় ক্রমশঃ কাজে আসিবে।"

মৃত ব্যক্তির মঙ্গলার্থ জপযজ্ঞ

আসাম গোয়ালপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার প্রিয়জন-বিয়োগে আমি আমার অকপট সমবেদনা এবং সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু তুমি শোকার্ত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ জানিয়া বেদনানুভব করিতেছি। সম্যক্ ঈশ্বর-নির্ভর না আসা পর্য্যন্ত কেহ শোক-জয় করিতে পারে না। এজন্য আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, দ্রুত তোমার ঈশ্বর-নির্ভর সম্যগ্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তুমি বিগতশোক হও। কিন্তু ইতিমধ্যে শোকার্ত্ততাহেতু অবিরাম হা-হুতাশ করিয়া জীবনের অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহন না করিয়া, পরলোকপ্রস্থিত

প্রিয়জনের আত্মিক কুশলের লক্ষ্যে তুমি মঙ্গলময় ভগবানের নাম-জপে নিরত হও। আত্মীয়ের কাছে আত্মীয় নিশ্চিতই ইহপর-জীবনে সাহায্য প্রত্যাশা করিয়া থাকে। তোমার স্বর্গত প্রিয়জন সমগ্র জীবনে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য পবিত্র জপযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রথম এক লক্ষ নামজপ তাঁহার মিথ্যাচরণজনিত পাপ হইতে মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। দ্বিতীয় এক লক্ষ জপ তাঁহার সর্ব্ববিধ পরপীড়ন-জনিত পাপ হইতে মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। তৃতীয় এক লক্ষ জপ তাঁহার সর্ব্ববিধ স্বার্থপরায়ণতার সংস্কার-মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। চতুর্থ এক লক্ষ জপ তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে 'যোগিনাং শ্রীমতাং গেহে' জন্মগ্রহণের সুচারুতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। পঞ্চম এক লক্ষ জপ তাঁহার পরবর্ত্তী দেহে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সমর্পিত চিত্তে জীবকল্যাণকল্পে নিরত থাকার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। ষষ্ঠ এক লক্ষ জপ তোমার ও তাঁহার পার্থিব সম্বন্ধের ভিতরে যত মানস সংস্কার অজ্ঞাতসারে কল্যাণ-বিরোধী হইয়া জাত হইতেছিল বা হইয়াছিল, অহাদের অবসান-কামনায় অনুষ্ঠান কর। সর্ব্বশেষ একলক্ষ জপ তোমার, তাঁহার এবং নিখিল ভুবনের প্রত্যেক প্রাণীর আত্মকল্যাণের ভিতর দিয়া আত্মকল্যাণের আহরণ-কল্পে প্রেরণা জাগরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। এই সাতলক্ষ নামজপ তোমাকে ও তাঁহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিবে, তোমাকে অশোক ও বিগতভয় করিবে। যাহা বলিলাম, তাহাকেই প্রকৃত শ্রাদ্ধ বলিয়া জ্ঞান কর।"

শিশুরক্ষা ও শিশুর ভবিষ্যৎ

তমলুক (মেদিনীপুর) হইতে একটী মহিলা-সমিতির কর্ম্মীরা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে এক পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্নেহের মায়েরা, তোমরা যে একটী শিশু-প্রতিপালনের প্রতিষ্ঠান গড়িতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা জানিয়া প্রীত হইয়াছি। শৈশব এবং বাল্য এই দুইটী বয়স যে মানুষের জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সতর্ক যত্নের বয়স, একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। শিশুকে লইয়া শুরু করিলেই কালক্রমে সমগ্র জাতিটাকে গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। দেশে যে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও শক্তিশালী নারীর প্রয়োজন, এ কথায় মতভেদ নাই কিন্তু শৈশবে যদি প্রত্যেকে না উপযুক্ত যত্ন পায়, তাহা হইলে ভগ্নদেহ ভগ্নমন যুবকযুবতীদের কাছ হইতে অত্যধিক কিছু প্রত্যাশা করা চলে না। এক মহাযুদ্ধ সেদিন গেল, সম্মুখে আর এক মহাযুদ্ধ আসিতেছে। সেই যুদ্ধ যদি ভারতের প্রত্যক্ষ মঙ্গলের জন্য হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ শক্তিমান পুরুষকে সীমান্তে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমশীলা রমণীকে কৃষিক্ষেত্রে বা কারখানায় প্রয়োজন হইতে পারে। সেই যুদ্ধও কোনও প্রকারে চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহার পরে তদপেক্ষা বৃহত্তর যে মহাযুদ্ধ জগতের সমক্ষে আসিতেছে, অর্দ্ধ শতাব্দী পরবর্ত্তী সেই সময়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বলির-মানুষের প্রয়োজন হইবে কোটির হিসাবে। প্রত্যেক দেশের সামরিক প্রয়োজনের দিক্ তাকাইয়াও শিশুকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কিন্তু

দেশ, জাতি ও জগতের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের দিকে তাকাইলেও ক্ষুদ্র শিশু অতি বৃহৎ সামগ্রী বলিয়া মনে হইবে। কোন প্রকারেই ইহাদের সম্পর্কে দৃষ্টিহীন হইতে পারি না। এই কারণেই তোমাদের সৎসঙ্কল্পের কথা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তবে একটী কথা এই যে, একাজে হাত দিবার আগে এ কার্য্য সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে এবং সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া লইতে চেষ্টা করিও। কারণ, জন্মের পরে প্রথম দুইটী বছর ব্যাপিয়া মানব-শিশুর মস্তিষ্কের আবরণের সন্নিকটস্থ কুঞ্চন (Convolutions) সমূহের যে ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকে, বুদ্ধি, শ্রমশক্তি, উদ্ভাবনী-প্রতিভা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিশিষ্টতার সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। পশু-শিশুর সহিত মানব-শিশুর একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, যাহা কিছু আবশ্যকীয় মানসিক শক্তি এবং শরীরের প্রায় সম্পূর্ণ গঠন লইয়াই পশুশিশু মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হয়। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে এবং নিজের বুদ্ধিতে নিজে চলিতে তাহাকে দীর্ঘকাল মায়ের যত্নের প্রতীক্ষা করিতে হয় না। পরন্তু, পৈতৃক শক্তি অতি অস্ফুটভাবে নিয়া মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বুদ্ধি ও হাঁটাচলার স্বাধীন-শক্তি অর্জ্জন করিতে তাহাকে দীর্ঘকালের সযত্ন দৃষ্টির অধীন থাকিতে হয়। মানব-শিশুর মস্তিষ্ক ও গঠন দীর্ঘ দিনে পূর্ণতা পায় বলিয়াই তাহার এই অসহায় অবস্থাটা দীর্ঘতর স্থায়ী। এই কারণেই জীবনের প্রথম কয়েকটী বৎসর শিক্ষিত ব্যক্তির নিপুণ হস্তের সুবিবেচিত যত্নের আবশ্যকতা। যাহা গ্রহণের, গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু

সেই পৈতৃক সম্পদ পাইয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির পূর্ণবিকাশ বিশেষভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, যদি ভূমিষ্ঠ হইবার পরে প্রথম কয় বৎসর, বিশেষভাবে প্রথম দুই বৎসর, সে ভাল ভাবে না প্রতিপালিত হয়। এই জন্যই বলিতেছি যে, প্রচুর তথ্য এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহের চেষ্টা আগে করিও। কার্য্য আরম্ভ করিবার পরে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবে, এইরূপ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে কতকগুলি শিশু নিরর্থক তোমাদের হাতে মরিতেও পারে। জলে না নামিয়া সাঁতার শেখা যায় না ইহা সত্য, কিন্তু জলে নামিবার আগেও করণীয় কাজ আছে। তাহা করিয়া লওয়া আবশ্যক এবং সাঁতার জানা লোক সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। শিশু-রক্ষা ও শিশুপালনের প্রতিষ্ঠান গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইতস্ততঃ জনমত ক্রমশঃ সজাগ হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সময়ে সুনিপুণ হস্তে জনমতের দাবী পূরনের প্রয়োজন। একটী অনিপুণ হস্তের অপক্রিয়া ভবিষ্যতের জন্য পাঁচটী সুনিপুণ হস্তের সেবা হইতে সমাজকে বঞ্চিত করিয়া দিতে পারে।

"অপর একটী আবশ্যকীয় বিষয়েও আমি এই প্রসঙ্গে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। শিশুগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ত' বড় হইবে এবং তাহাদের শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইবে। কিন্তু শিশুগুলির শিক্ষা হইবে কি প্রকার এবং ধর্ম্মবোধ কোন্ নির্দ্দিষ্ট সাধন-তন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইবে, তৎসম্পর্কে গোড়াতেই একটী সুস্পষ্ট ধারণা নিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত-

নির্ণয়ের ভার ভবিষ্যতের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলে পরিণামে অসামাজিক ও সমাজদ্বেষী, অধার্ম্মিক ও ধর্ম্মদ্বেষী জনসমষ্টির উৎপত্তি ঘটা আশ্চর্য্য নহে। শৈশব এবং কৈশোরের সংস্কারগুলি মিলিয়াই যৌবনের আবেগকে সৃষ্টি করে এবং যৌবনের প্রয়াস যাইয়া প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যেভাবেই গড়া শুরু কর, শিশুর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সুদীর্ঘ জীবনের শান্তিময় অবসান পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্যক্রম নির্ণয় করিতে হইবে।"

প্রণব, পরমহংস ও অজপা

অদ্যকার ডাইরির সাথে শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত একখনা কাগজের টুকরা পাওয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবামণি যখন মৌনী থাকেন, তখন এভাবে সংক্ষেপে জটিল বিষয় লিখিয়া রাখেন। এই কাগজের টুকরাটী আজিকার লেখা কিনা, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু আজিকারই তারিখের কাগজ-পত্রের সঙ্গে থাকায় আমরা এখানে তাহার অনুলিপি দিতেছি। সম্ভবতঃ সাধন-রহস্য সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পর পর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি ইহা লিখিয়াছেন। যথা,—

"আমার মনে হয়, তোমার কথিত মন্ত্রটী আধুনিক। প্রণব যে প্রাচীনতম মন্ত্র, এই বিষয়ে সাধকদের মধ্যে কুত্রাপি মতভেদ দেখি না। ওঙ্কারের প্রামাণ্য সকলেই স্বীকার করিতেছেন। শুনিয়াছি, বেদে তোমার কথিত মন্ত্রটীর উল্লেখ আছে, কিন্তু মন্ত্র রূপে নহে, শব্দরূপে। বৈদিক শাস্ত্রে তোমার কথিত শব্দটীর

কতবার ব্যবহার আছে জানি না। কিন্তু ওঙ্কারের ব্যবহার অসংখ্যবার আছে, মন্ত্ররূপেও আছে, মন্ত্রের অংশরূপেও আছে। তোমরা যে সকল শব্দকে এক একটী মন্ত্র বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহার অনেকগুলিই প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্র নয়, বরঞ্চ সাধনের এক একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বা গুপ্ত সঙ্কেত। সেই সকল ইঙ্গিতের লক্ষ্য এই যে, উহা অনুসরণে নাদাত্মক পরব্রহ্ম মহাপ্রণবের রসাস্বাদন সম্ভব হইবে। হাঁ, শ্বাস-গ্রহণকালে তিনি তোমাতে আসিয়া তোমার যৌবন সম্পাদন করিতেছেন, স্মরণ রাখিও। প্রশ্বাস ছাড়িবার কালে মনে রাখিও, তুমি তাঁতে ডুবিয়া যাইতেছ, তোমার নিজত্ব নাই, তুমি মৃত। এই সঙ্কেত ভুলিয়া অর্থহীন বিতণ্ডায় ডুবিয়া লাভ কি ? অনেকে মনে করেন, নির্দ্দিষ্ট একটা মন্ত্র যিনি জপ করেন, তিনিই পরমহংস। এই কথাটার অর্থ দুর্ব্বোধ্য। হংস = আত্মা। পরমহংস = পরমাত্মা। যিনি নিজেকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জানেন, তিনিই জ্ঞানী পরমহংস। যিনি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠায় অনন্যশরণ হইয়া পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি ভক্ত পরমহংস। যিনি সর্ব্বোদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া একমাত্র পরমাত্মার প্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী পরমহংস। হংসের গুণ নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ। পরমহংসের গুণ সকল অসার বস্তু হইতে পরম সারবস্তু গ্রহণ। অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্ব-ঘটনায়, সর্ব্বকালে পরমাত্মা-দর্শন। নির্দ্দিষ্ট একটী মন্ত্র-জপা বা না-জপার সাথে পরমহংসত্ব লাভের কোনও সম্পর্ক নাই। যে মন্ত্রই সাধন কর, যদি কর বা মালা না জপিয়া অবিচ্ছেদ সাধন করিতে পার, তবে 'অজপা' সাধন

হইল। শ্বাস-প্রশ্বাস যোগে যে মন্ত্রই সাধিত হউক, তাতেই অজপা সাধন হয়। হৃৎ-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে নাম জপিলে অজপা হয়, পথ চলিতে চলিতে পায়ের তালে তালে জপিলেও অজপাই হয়। কিন্তু তুমি পথ সর্ব্বদা চলনা, হৃৎ-স্পন্দনের শব্দ সর্ব্বদা লক্ষ্য করা যায় না। তাই, যত প্রকারের অজপা সাধক সমাজে সাধারণতঃ চল আছে, তন্মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসই শ্রেষ্ঠ। এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়াই 'অজপা' বলিতে শ্বাস-প্রশ্বাসকেই বুঝাইতেছে। এটা যোগরূঢ় অর্থ। শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ স্থূল অজপা, শ্বাস-প্রশ্বাসের তোয়াক্কা না রাখিয়া অবিচ্ছেদ অবিরাম নদী-তরঙ্গবৎ নামাভ্যাস সূক্ষ্ম অজপা। সুদূর হইতে সমতালে তূর্য্যধ্বনিবৎ সূক্ষ্ম অজপার অনুভূতি। সূক্ষ্ম অজপা দেহবুদ্ধির বিনাশক। স্থূল অজপায় মনশ্রমধ্যসেবী, সূক্ষ্ম অজপায় সহস্রারসেবী। হাঁ, মালাজপের পরিণামেও সূক্ষ্ম অজপা ব্যক্তিবিশেষে সুসাধ্য। শ্বাস-যোগে নামজপে বায়ুর গতি বিচ্ছেদে সূক্ষ্ম অজপা সহজ।"

কলিকাতা
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অপরাহ্নে কতিপয় উপদেশ-প্রার্থী আসিয়াছেন।

নাম ছাড়িও না

একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৈনিক যেমন জাতীয় পতাকা দৃঢ়হস্তে ধারণ ক'রে যুদ্ধ করে, প্রাণ গেলেও পতাকা ছাড়ে না, তেমনি সংসারের সহস্র বিঘ্নের মাঝেও ভগবানের নাম ছেড়ো না।

অর্থ ও পরমার্থ

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অর্থ অর্জ্জন কর, কিন্তু অর্থ যেন পরমার্থকে না ভুলায়। বরং পরমার্থ সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থ অর্জ্জন কর। নিজেকে অর্থার্জ্জন-চেষ্টার অধীন ক'রো না, পরমার্থ সাধন-চেষ্টারই অধীন কর, পরমার্থ হোক্ লক্ষ্য, অর্থ হোক্ উপলক্ষ্য।

নববিবাহিতের আশা, আস্থা ও সাহস

একটী যুবকের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। যুবকটী উপদেশের জন্য আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিতান্ত শহুরে মেয়েরা ছাড়া আর সবাই মোটামুটি sober (ধীর, সংযমী), একথাটা মনে রেখো। শহরের মেয়েদেরও sober না হবার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু নিত্য নূতন চাঞ্চল্যকর ঘটনা সব শহরে বন্দরে ঘটছে। তা' দেখে তা' শুনে ভাল মেয়েরাও একটু চঞ্চল, অস্বাভাবিক হ'য়ে থাকে। কিন্তু যে কোন অবস্থায়, নব-বিবাহিত যুবকের পক্ষে নিজ স্ত্রী-সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা রাখা সঙ্গত। তাতে স্ত্রীকে ভাল থাকবার সুযোগ দেওয়া হয়। স্ত্রীর জীবনে কোনো গুপ্ত কথা আছে কিনা, জান্‌বার চেষ্টা করার মত পাপ আর কিছু নেই। যাকে বিবাহ কচ্ছ, তাকে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত জ্ঞান করা উচিত। অনেক মেয়েরাই পিতৃগৃহে সৎশিক্ষা বিশেষ কিছু লাভ ক'রে আসে না। সেই সব মেয়েরাও যদি দেখে যে, স্বামীর স্নেহ-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস তার প্রতি অপরিসীম, তাহ'লে সহজেই

স্ত্রীর রুচি ও মনোগতি এমন হয় যে, স্বামী ইচ্ছা করলেই তাকে নিজের মনের মত ক'রে গ'ড়ে নিতে পারে। Begin with hope, faith and courage and not with suspicion, misdemeanour and irreverence. (আশা, আস্থা ও সাহস সহকারে কাজ করবে, অবিশ্বাস, অভদ্রতা ও অশ্রদ্ধা নিয়ে নয়।)

কলিকাতা

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অভ্যাস ছাড়িও না

ঢাকা-ভাগ্যকুল-নিবাসিনী জনৈকা মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্র লিখিলেন,—

"নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিরন্তর ভগবানের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিতে থাক। শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর কখনও বিন্দুমাত্রও বলপ্রয়োগ করিও না। বায়ুর স্বাভাবিক আগমে এবং স্বাভাবিক নির্গমে নাম-স্মরণ করিতে থাক। বায়ু আপনা আপনি স্তব্ধ থাকিলে সেই স্তব্ধাবস্থায়ও একবার করিয়া নাম স্মরণ কর। স্তব্ধাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে সেই সময়ে গুচ্ছে গুচ্ছে নাম জপিতে থাক। স্তব্ধাবস্থা অতীব দীর্ঘ হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ-রূপে নিরপেক্ষ হইয়া অবিশ্রাম গুচ্ছে গুচ্ছে নামাস্বাদন করিতে থাক। সংসারের দুঃখের নীচে তলাইয়া যাইও না, সংসারের সহস্র বিপ্লবকে অগ্রাহ্য করিয়া মঙ্গলময় নামের সেবার মধ্য দিয়া পরমা শান্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা কর। শান্তি যে চাহে,

নিশ্চিতই সে শান্তি পায় এবং শান্তি যে চাহে, নিশ্চিতই তাহাকে সাধন করিতে হইবে। নাম-সাধনের আনন্দ অভ্যাসের ফলেই উপজাত হয়, —অভ্যাস ছাড়িও না।"

ভগবানের কাছে উলঙ্গ হও

বিলনিয়া (পার্ব্বত্য-ত্রিপুরা)-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনটাকে একেবারে উলঙ্গ করিয়া ভগবানের পানে ধর। দোষ, ত্রুটী বা অপরাধের ছাপ অন্তরে যদি কিছু থাকে, সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে যক্ষ্মাবীজাণু যেমন করিয়া ধ্বংস পায়, এগুলিও তেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

অল্প চেষ্টারও সুফল আছে

বিলনিয়া-নিবাসী অপর এক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নাস্তিকেরা যাহাই বলুক, ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার চেষ্টার সুফল কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। অল্প করিলে অল্পেরই সুফল তোমার প্রাপ্য। একেবারে বঞ্চিত তুমি কখনও হইবে না। অন্তরের সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দুর্ব্বলতা পদতলে বিদলিত করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হও। জগতে একজন সাধকও অকপট প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থকাম হন নাই,—তুমি হইবে কেন ? মিথ্যার উপাসনায় সমগ্র দিন যাইতেছে, সত্যস্বরূপের উপাসনায় একটা ঘণ্টা সময়ের অভাব কেন বাবা হইবে ?

যৌবনেই আশ্রয়-বিবর নির্ম্মাণ কর

দুবলাচাঁদ (নোয়াখালী)-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবকে এক সময়ে মহাত্মা বিদুর বলিয়াছিলেন যে, তৃণরাশি সমাচ্ছাদিত স্থানেও বিবর খনন করিয়া বাস করিলে অগ্নি কখনও স্পর্শ মাত্র করিতে পারে না। তিনি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁর ধীর প্রজ্ঞাপ্রভাবে বুঝিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে জতুগৃহদাহকালে সমাতৃক পঞ্চভ্রাতা অক্ষত শরীরে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আমিও তোমাকে বলিতেছি যে, সংসার শুষ্ক-তৃণরাশি-সমাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তর-স্বরূপ এবং সংসারের আকর্ষণের বস্তু ও ব্যক্তিগুলি জতুগৃহের অতিদাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত ছাদন-স্বরূপ। কিন্তু সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায় ? যেখানেই যাও, আসক্তিরূপ শত্রু, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রে নহে পরন্তু কুমন্ত্রণারূপ শত্রুদিগকে চালিত করিয়া, তোমাকে ধ্বংসের মুখে নিপাতিত করিবে। সুতরাং এই প্রথম যৌবনেই ভূগর্ভে বিবর খনন করিয়া আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া লও। সময় থাকিতে যে আশ্রয়-বিবর প্রস্তুত করে, অসময়ে তাহাকে হাহাকার করিতে হয় না। ভগবানের মঙ্গলময় নাম হইতেছে এই আশ্রয়দাত্রী মৃত্তিকা, তোমার একাগ্র অধ্যবসায় হইতেছে তোমার সবল বাহু, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হইতেছে বিবর নির্ম্মাণের খনিত্র, আর নামের রসাস্বাদন-জনিত নিশ্চিন্ত পূর্ণ নির্ভর হইতেছে এই সর্ব্ব-বিঘ্নে পরিরক্ষক বিবর। যাহা করিবার এই নব-যৌবনের প্রথম উন্মেষেই শুরু কর। শুভাশিস জানিও।"

সরলতা দ্বারা কপটতা জয়

রহিমপুর-নিবাসী এক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে ব্যক্তি কপট ব্যবহার করে, তাহার সহিত কপটতা, যে ব্যক্তি সরল ব্যবহার করে, তাহার সহিত সরলতা, লোক-ধর্ম্ম জানিও। শতকরা নব্বই জন লোকে জগতে লোক-ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে। ইহার পরিবর্ত্তন সুকঠিন। কিন্তু যে ব্যক্তি কপট, তাহার সহিতও সরলতা আদর্শ বলিয়া জানিও। আদর্শকেই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিও, আদর্শ রক্ষার জন্যই যত্ন লইও কিন্তু বিপরীত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া যদি গৃহীত আদর্শের বিপরীত কার্য্য করিয়া ফেলিতে হয়, তবে তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া যুক্তিবিস্তারের চেষ্টা করিও না। নিজের ভুলকে ভুল বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিও এবং সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করিতে হয়, তজ্জন্য যত্নপরায়ণ হইও। কপটতাকে যদি সরলতা দ্বারা জয় করা যায়, তাহা হইলে জয়ের গৌরব বর্দ্ধিত হয়। এজন্য এই পথেই কপটতা-জয়ের চেষ্টা সমধিক সমর্থনীয় জানিবে। এমন কপট ব্যক্তি আছে, যাহারা সরল ব্যক্তিকে নখে ছিঁড়িয়া মাংস সেবন করে। ইহা সত্য। কিন্তু সরল হইবে বলিয়াই তুমি আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি দিবে না, তাহা নহে। আত্মরক্ষার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করিয়াও সরল হওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ আত্মরক্ষণ-চেষ্টা সরলতার বর্দ্ধক এবং এইরূপ সরলতা আত্মরক্ষণ-চেষ্টার বর্দ্ধক। অশক্ত পক্ষে লোকধর্ম্ম অনুসরণ-যোগ্য। কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব, অলোকসামান্য থাকিবার জন্য অধ্যবসায়ী হইবে।"

কিরূপ আহার্য্য গ্রহণীয়

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে গিয়া বসিয়াছেন। জনৈক যুবক ভক্ত জিজ্ঞাসু হইয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন ঃ—আহারাদি কি রকম করব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি, —হিতাহার, মিতাহার, মেধ্যাহার। যে আহারীয় গ্রহণে শরীরের হিত হয়, অহিত হয় না। যে আহারের পরিমাণ প্রয়োজনমাফিক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। যে আহারীয় গ্রহণে মেধা বর্দ্ধিত হয়, সদ্‌বিষয়ের স্মৃতি জাগরূক রাখ্‌তে সহায়তা হয়। এক এক দেশে এক এক রকমের আহারীয়কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ু এবং শরীর-রক্ষার উপাদান বিভিন্নরূপ। মহম্মদ মাংসকে শ্রেষ্ঠ আহার মনে কত্তেন, আর্য্য-ঋষিরা ঘৃতকে শ্রেষ্ঠ আহার মনে কত্তেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কিছুদিন মাংস খেয়ে আর কিছুদিন ঘৃত খেয়ে তার পরে তোমাকে নিশ্চয় স্বীকার কত্তে হবে যে দধি, দুগ্ধ আর মাখন মাংসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, ঘৃতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। শরীর যা সহজে গ্রহণ কত্তে পারে, যে খাদ্য খেয়ে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয় অল্প, যে খাদ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য বাড়ে না বা অতিমাত্রায় কোষ্ঠতারল্য ঘটে না, যে খাদ্য যকৃতের ক্রিয়া-পরিচালনে সাহায্য করে, যা অল্পায়াসে জীর্ণ হয় এবং এত সব গুণের সঙ্গে যে খাদ্যের সুলভতা গুণ রয়েছে, তাই হিতাহার। এক মুঠা ভিজান ছোলা, তিন খানা লুচির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদি হজম কত্তে পার; কারণ,

আটার প্রোটিন ছোলাতেও আছে, পরন্তু অতিরিক্ত তাজা ভাইটামিন আছে, বিশেষতঃ সুলভতা-গুণও এতে রয়েছে। সুতরাং হিতাহার নির্ব্বাচন কত্তে গিয়ে খুব গোঁড়া হবার প্রয়োজন নেই। সাধারণতঃ হিন্দু-বিধবার খেশারী ডালটী ব্যতীত আর সবই হিতাকার। একটু মুখ নাড়া-নাড়ি ক'রে বেছে নিও যে, কোনটী তোমার পক্ষে হিতাহার হবে।

মৎস ও মাংস কাহাদের পক্ষে হিতাহার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাংস, ডিম, মাছ, প্রভৃতি কারো পক্ষে বিষতুল্য অহিতাহার, কারো পক্ষে আবার হিতাহার। মাংসাশী ইংরাজ প্রথম প্রথম মাংস ছেড়ে দারুণ কাবু হ'য়ে পড়বে। অবশ্য ওরা ডিমকে নিরামিষ বলেই গণ্য করে থাকে। যাদের বিয়াল্লিশ পুরুষ ধরে নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুরের মাছ ধ'রে খাচ্ছে, তাদের পক্ষে মৎস্যাহার পরিত্যাগ ক'রে শরীরকে তার সমকক্ষ পুষ্টিকর উপাদান প্রদান করা অভ্যাসের দিক্ দিয়েও কঠিন, আর্থিক দিক্ দিয়েও কঠিন। আর বহুপুরুষ ধ'রে মাছকে খাদ্যের একটা প্রধান উপকরণরূপে গ্রহণ ক'রে আসার দরুণ স্বল্প পরিমাণে গ্রহণ কর্লে মৎস্যাহার এদের পক্ষে অহিতাহার হয় না। বরং নিরামিষ খেতে খেতে এদের অনেককে অজীর্ণ বা শূল রোগে ভুগতে দেখা যায়। যারা সাধন ভজন ক'রে জীবন কাটাবে, তাদের শুধু আহার সম্পর্কে কঠোর নিয়ম ক'রে বহু খাদ্য বর্জ্জন করা সম্ভব। কারণ, আধ্যাত্মিক শ্রমে শরীরের বহু অনাবশ্যক ক্ষয় ক'মে যায় এবং পূরণের প্রয়োজনও

কমে যায়। কিন্তু দেশরক্ষী সৈনিকেরা শতকরা একশত জনই যদি নিরামিষ খেতে আরম্ভ করে, তাহ'লে সেই বৈষ্ণবী সেনারা যুদ্ধ-জয় কত্তে পার্ব্বেন কিনা, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ মত দেবেন। শিখ জাতি আর মুসলমান জাতির আহারের মধ্যে মাংস যে প্রধান এক উপকরণ, তার মস্ত কারণ এই যে, এঁদের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতারা ধর্ম্মকে এমন ভাবে প্রচার কত্তে এবং সম্প্রদায়কে এমন ভাবে গঠন কত্তে পেরেছিলেন যে, শিখ মাত্রেরই বা মুসলমান মাত্রেরই যুদ্ধক্ষেত্রটা ধর্ম্মার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জ্জনের পন্থা হয়েছিল। "মৃতো বা প্রাপ্স্যসে স্বর্গম্ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—মরণে পাবে স্বর্গ, বাঁচলে হবে পৃথ্বীপতি,—এই উপদেশ যাঁদের জন্য, অর্জ্জুনের জাতভাই সেই হিন্দু-ক্ষত্রিয়দের জন্য শাস্ত্রকার নিরামিষ আহারের নির্দ্দেশ দেন নি। সুতরাং বুঝতে হবে যে, মাংসাহারই এদের পক্ষে হিতাহার। তোমার যদি এমন সঙ্কল্প থাকে যে, কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়েও একটা দেশকে রক্ষা কত্তে হবে অথবা কয়েক সহস্র লোকের প্রাণের বিনিময়েও একটা পার্ব্বত্য অঞ্চলে সভ্যতা, সদাচার অতি দ্রুত প্রচার ক'রে অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিকে নিজের কোলে টেনে আনতে হবে, ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে ও সামাজিকতায় সমকক্ষ অধিকার প্রদান ক'রে সভ্যতা-বিস্তার কত্তে হবে, তাহ'লে এক্ষেত্রে পরমায়ুর দীর্ঘতা সম্পাদক নিরামিষ আহারের চেয়ে কর্ম্মতৎপরতার সম্পাদক আমিষ আহারকে প্রাধান্য দিতে হ'তে পারে। এসব ক্ষেত্রে আমিষাহারই হিতাহার।

খাদ্য হইতে লোভ দূর কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু খাদ্যরূপে আমিষ বা নিরামিষ যাই গ্রহণ কর, লোভকে বাদ দিয়ে আহার-কার্য্যটী সারতে হবে। এটী যোগীর পক্ষেও প্রতিপাল্য, যোদ্ধার পক্ষেও প্রতিপাল্য। লোভপূর্ব্বক কর্ল্লে, এ আহার্য্য আর হিতাহার থাকে না। যে খাদ্যে যখন লোভ দেখ্‌বে, সেখাদ্য সম্পর্কে তখন সঙ্কোচ-বিধি অবলম্বন কর্ব্বে। অর্থাৎ সে খাদ্যের পরিমাণ এবং বার কমিয়ে দেবে, তার পরিবর্ত্তে শরীরের পক্ষে সমহিতকর অন্য খাদ্য ক'দিন গ্রহণ কর্ব্বে। লোভ অনুভূত হচ্ছে ব'লে কোনো খাদ্যকে একেবারে বর্জ্জন করা সব সময়ে প্রয়োজন নয়।

কুম্ভকের উপায়

উপদেশার্থী প্রশ্ন করিলেন,—কুম্ভক কি করিয়া করিব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জোর ক'রে বায়ুকে স্তম্ভিত ক'রে কুম্ভক করার বিধান অন্য পন্থায় আছে। তোমাদের তা প্রয়োজনীয় নয়। স্বাভাবিক শ্বাসে আর স্বাভাবিক প্রশ্বাসে নাম ক'রে যাও। যখন কুম্ভক হবার আপনি হবে। এজন্য পৃথক্ চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার উদ্দেশ্য হবে কুম্ভক বা প্রাণায়াম নয়, তোমার উদ্দেশ্য হবে অবিরাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম স্মরণ ক'রে যাওয়া এবং এভাবে নামের অমৃতরস আস্বাদন করা। তার ফলে কুম্ভকাদি যা হবার আপনি হবে, তার ফলে শ্বাসবায়ুর ধীর হবার আবশ্যকতা থাকে ত' সে আপনি ধীরতা পাবে।

সেজন্য পৃথক্ প্রয়াস বৃথা শ্রম। গাড়ীতে যখন যাত্রী থাকে খুব বেশী, তখন ট্রামখানা এস্‌প্লানেডে গিয়ে একটু বেশী সময় থামে, অনেক বেশী যাত্রী নিয়ে যখন সে আবার শ্যামবাজারে ফিরে, যাত্রী খালাস কর্ব্বার জন্য তাকে আবার এখানেও একটু বেশী সময় থাম্‌তে হয়। যাত্রী যখন খুব কম থাকে, তখন এস্‌প্লানেডে যাত্রী নামাতে বেশী সময় লাগে না, সুতরাং সেখান থেকে ট্রামখানা তাড়াতাড়ি ছাড়্‌তে পারে। শ্যামবাজার পৌঁছেও যদি দেখা যায় যে, যাত্রী বেশী নেই, তাহ'লে ট্রামখানা তাড়াতাড়ি শ্যামবাজারের ডিপো ছেড়ে যেতে পারে। তোমার প্রাণবায়ু হচ্ছে যেন ট্রাম-গাড়ী। তোমার প্রশ্বাস আর শ্বাস হচ্ছে যেন এস্‌প্লানেডে যাওয়া, আর শ্যামবাজার ফিরে আসা। এস্‌প্লানেডে অবস্থিতিটা হচ্ছে, বাহ্য কুম্ভক। শ্যামবাজারে অবস্থিটা হচ্ছে, আভ্যন্তর কুম্ভক। ভগবানের নাম মনে হচ্ছে যেন ট্রামের যাত্রী। যাত্রী যখন খুব বেশী হয়, ট্রাম তখন বেপরোয়া চলে না। গতি তখন হয় তার কতক ধীর। শ্বাসের সঙ্গে নাম করার কালে তোমার যদি অভিনিবেশ হয় খুব গভীর, তখন ট্রামের ড্রাইভার তোমাকে জিজ্ঞেস না ক'রেই ট্রামের গতি মন্থর ক'রে দেন। তুমি তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের চালক নও। ভগবান্ নিজে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে চালনা কচ্ছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির ভিতরে ভগবানের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ক'রে এই ব্যাপারে নিজেকে একেবারে অসহায় দর্শক মাত্র জ্ঞান ক'রে শ্বাসের ট্রামে একবার ক'রে ভগবানের পরমসুন্দর নামকে চাপাও,

আর প্রাণ ভ'রে মন ভ'রে তার মধুর মূরতি দেখ, প্রশ্বাসের ট্রামে একবার ক'রে ভগবানের নিবিড় শান্তিপ্রদ নামকে চাপাও, আর সমগ্র হৃদয় দিয়ে তার মকরন্দ পান কর। প্রেমের গভীরতা তোমার যত বেশী হবে, ট্রামের গতি তত মন্থর হবে, ভাবের নিবিড়তা যত বেশী হবে, ট্রাম তত দীর্ঘ সময় থেমে থাক্‌বে। অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় প্রাণায়াম হবে, কুম্ভকও হবে।

ভগবানের গুপ্ত নাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাস, প্রশ্বাস ও কুম্ভক, এর ঊর্দ্ধে অনেক কথা আছে। শ্বাসের চিন্তা নেই, প্রশ্বাসের ভাবনা নেই, কুম্ভকের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব দর্শন নেই, পরন্তু অবিরাম সহস্রারে পবিত্র ওঙ্কার অনুক্ষণ মৃদু-মধুর নিনাদে নিজেতেই নিজে ঝঙ্কৃত, অনুঝঙ্কৃত, প্রতিঝঙ্কৃত হচ্ছে, এটী তারও পরবর্ত্তী অবস্থা। সাধন ক'রে তবেই বুঝ্‌বে, তবেই জান্‌বে। সাধন ছাড়া একে জানা যায় না। মুসলমানদের বল্‌তে শুনা যায়, ভগবানের একটী গুপ্ত নাম আছে। ব্রাহ্মণদের বল্‌তে শুনা যায়, প্রণবধ্বনি প্রকাশ করা যায় না। সেই গুপ্তনাম, সেই গুপ্তধ্বনি দেখ্‌বে আপনি প্রকাশ পাবে। জগতের যত ধ্বনি শোন, তার মাঝখানে ইষ্টনামকে শ্রবণ কত্তে চেষ্টা কর। এ সাধন শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরপেক্ষ। বালকের কণ্ঠরবে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরণে, পাখীর কাকলিতে, রাখালের বাঁশীর সুরে, ছোট বড় সকল শব্দে একমাত্র নাম শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হও। যতক্ষণ পার, শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ চালাও, যখন পার না, তখন এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরপেক্ষ হ'য়ে ভিতরের আর বাইরের

প্রত্যেক শব্দে ইষ্টধ্বনি শ্রবণে প্রয়াসী হও। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ভ্রূমধ্যের—এ সাধন সহস্রারের।

স্ত্রীলোক-সম্পর্কে কুচিন্তার প্রতিকার

একজন উপদেশার্থী বলিলেন,—আমার মন অনেক সময়ে স্ত্রীলোকঘটিত কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোর প্রতি আমার ভালবাসা আছে ব'লে তোর মনে হয় ?

উপদেশার্থী।—আজ্ঞে হাঁ। আমার মনে হয়, এ ভালবাসা প্রগাঢ়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ ভালবাসা পবিত্র ব'লে তোর মনে হয়?

উপদেশার্থী।—নিশ্চয়ই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আমাকে পবিত্র ব'লে তোর ধারণা হয় ?

উপদেশার্থী। —নিশ্চয়ই। আপনাকে আমার সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ব'লে জ্ঞান হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাহ'লে কোনও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মনে কুভাব এলেই সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌তে থাক্‌বি যে, সেই স্ত্রীদেহটির ভিতরে আমি আছি। এতেই তোর কুচিন্তা প্রশমিত হবে। অবশ্য, ব্যক্তিগত ভাবে তোর আন্তরিক শ্রদ্ধার গতি বুঝেই এই উপদেশ দিলাম। তুই যদি বল্‌তিস যে, খ্রীষ্টকে তুই নিষ্পাপ ব'লে জ্ঞান করিস্, তবে তোকে এভাবে খ্রীষ্ট-মূর্ত্তিই চিন্তা কত্তে বল্‌তাম।

রমণীমূর্ত্তিতে প্রণব-চিন্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এমন যদি হয় যে, আমার প্রতি তোর নিষ্পাপতা-শ্রদ্ধা অটুট নয়, তখনও তোর পথের অভাব নেই। তুই প্রত্যেক রমণী-মূর্ত্তিতে পবিত্র প্রণব দর্শন কত্তে থাক্। যে রমণী তোর মনকে উচাটন কচ্ছে, প্রথমতঃ চেষ্টা কর্ব্বি, মনকে তার চিন্তা থেকে প্রত্যাহার করার। অর্থাৎ, যত বারই মন সেই রমণীর বিষয়ে ভাবে, তত বারই তুই মনকে সেই রমণীর বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে টেনে টেনে আন্‌বি। দীর্ঘকাল চেষ্টা চল্‌তে থাক্‌লে এই প্রত্যাহার-যোগে সিদ্ধি করায়ত্ত হবে। কিন্তু অভ্যাসের অপরিপক্কতা নিবন্ধন যদি প্রত্যাহার পূর্ণ-ফলপ্রদ না হয়, তাহ'লে সেই রমণীমূর্ত্তির ভিতরে নিজ মাতৃমূর্ত্তি বা নিষ্পাপতা-শ্রদ্ধার আকর অন্য মূর্ত্তির উপস্থিতি চিন্তা কর্ব্বি। কিন্তু কোন কারণে তাতেও পূর্ণ মনোনিবেশ না ঘটলে তখন ঐ রমণীর প্রত্যেক অঙ্গে পবিত্র প্রণব-মন্ত্রের উপস্থিতি চিন্তা কত্তে থাক্‌বি। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, বক্ষ, পৃষ্ঠ, ওষ্ঠ, গণ্ড, করাঙ্গুলি, পদাঙ্গুলি, প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গে ইষ্টনাম জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হয়েছে ব'লে কল্পনা চালাতে থাক্‌বি। What is realisation but the most intense and extreme imagination ? [কল্পনার চূড়ান্ত ও গভীরতম অবস্থাই হচ্ছে উপলব্ধি।] কল্পনাকে গভীর থেকে গভীরতর কত্তে চেষ্টা পেতে থাক্‌বি, আর প্রত্যেকটি ওঙ্কার-মূর্ত্তির ভিতর থেকে অবিচ্ছেদ গতিতে ওঙ্কারধ্বনি নির্গত হচ্ছে ব'লে ভাবতে থাক্‌বি। শুন্‌তে থাক্‌বি, সেই রমণীর চক্ষু

থেকে অবিরাম ধ্বনি বেরুচ্ছে—ওম্, ওম্, ওম্, কর্ণ থেকে অবিরাম ধ্বনি বেরুচ্ছে,—ওম্, ওম্, ওম্—সেই শরীরের যত অঙ্গে তুই মনে মনে ওঙ্কার অঙ্কিত কর্ব্বি, প্রত্যেক স্থান থেকে গভীর আরাবে ধ্বনি নির্গত হচ্ছে,—ওম্, ওম্, ওম্। এই ভাবে ধ্যান জমাতে পার্লে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা এই পাঁচজনে এক সঙ্গে এসেও যদি তোকে সংযম-ভ্রষ্ট কত্তে চেষ্টা করে, তবে তারাও অসাফল্যের লজ্জা কুড়িয়ে নত মুখে ফিরে যাবে।

প্রবল ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার সম্পর্কে কর্ত্তব্য

একটী অবিবাহিত যুবক রিপুর তাড়নায় বিপথে চলিতেছে। যুবকটী আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে বসিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকটীকে কোন প্রত্যক্ষ উপদেশ প্রদান না করিয়া পরোক্ষভাবে ঋষি বিশ্বামিত্রের কুক্কুরের স্পৃষ্ট মাংস ভক্ষণের কাহিনী প্রথমে বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, রামায়ণ, মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ-গ্রন্থে অনেক কাহিনী আছে। তার কতক ইতিহাস, কতক কল্পিত কথা, কিন্তু একটাও গাঁজাখুরি নয়। সরল সোজা ভাষায় খাঁটি কথায় উপদেশ দিতে গেলে শুন্‌বে না, এই জন্য বহু গল্প-গাছার অবতারণা করা হয়েছে। বিনা উদ্দেশ্যে একটী কাহিনীও বর্ণিত হয় নি। কিন্তু তোমরা তার মানে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর কি বাছা ? বিশ্বামিত্র ক্ষুধিত, কিন্তু ক্ষুধিত ব'লেই তিনি শকুনির খাদ্য, শূকরের খাদ্য গ্রহণ কত্তে পারেন

না। তাই, তিনি যোগ্য খাদ্যের প্রতীক্ষায় দ্বাদশ বর্ষ কাটালেন। দ্বাদশ বর্ষ পরেও যোগ্য খাদ্য মিল্‌ল না, তাই তিনি অতীব অখাদ্য গ্রহণ কর্ল্লেন। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করার আগে তিনি তা, বিষ্ণুকে নিবেদন ক'রে নিলেন। নিবেদন-কালে খাদ্যের ধ্যান কর্ল্লেন না, বিষ্ণুরই ধ্যান কর্ল্লেন। এই কয়টী কথা থেকে তোমাদের কি কিছুই শিখ্‌বার নেই? বিবাহ কর নি, অতএব তোমার ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার খাদ্য সম্মুখে নেই। তুমি প্রতীক্ষা কর, এক বছর দুই বছর ক'রে দ্বাদশ বর্ষ কাল ধৈর্য্য ধারণ কর, তার পরেও যদি বৈধ খাদ্য না পাও, তখন তুমি বরং অখাদ্য গ্রহণ কর্ল্লে কেউ তোমাকে তত দোষ দিতে পার্ব্বে না। কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করেছ কি ? তা' কর নাই। যে বস্তু পেয়েছ, তাই গলাধঃকরণ কচ্ছ। কিন্তু এ বস্তু কত অপবিত্র, কত কদর্য্য, বহু-জন-সংসর্গে কত কলুষিত, একবারও তা' ভেবে দেখ নাই। আজ থেকে এর কদর্য্যতার চিন্তা শুরু কর। প্রথম দর্শন মাত্র যারা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে নির্লজ্জ হ'তে পারে, একবার ভেবে দেখ, তাদের হৃদয় কেমন জিনিষ দিয়ে তৈরী, তাদের রুচিজ্ঞান কেমন অমার্জ্জিত, তাদের অধঃপাতের গভীরতা কত। এসব বিচার ক'রে ক'রে মনকে প্রতিনিবৃত্ত কর। বিশ্বামিত্র কুক্কুর-মাংসও ভগবানকে নিবেদন না ক'রে খান নি, তুমি কদর্য্য বস্তু ভোগ করার সময়ে যদি তৃপ্তিই অনুভব করেছ, তবে তা ভগবানকে নিবেদন কর নি কেন? কেন বল নাই, "হে ভগবান, আমি কামের ক্ষুধায় অধীর হ'য়ে যে কুখাদ্য গ্রহণ কচ্ছি, তুমি তাকে নিজের তরফ থেকে গ্রহণ কর।" ভগবানকে নিবেদন কত্তে

মনে ছিল না ব'লেই আজও তুমি এ আসক্তি পরিহার কত্তে পাচ্ছ না। ভালমন্দ সব ভগবানকে অর্পণ করার অভ্যাস কর, দেখ্‌বে অপবিত্র বস্তু থেকে মন আপনি উঠে আস্‌বে। বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যে, কুক্কুরমাংসও বিনা নিবেদনে আস্বাদ কত্তে নেই।

বিবাহ ও কামপ্রবৃত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—দেখ, অনেকের ধারণা এই যে, মানুষ কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার জন্যই বিবাহ করে, সুতরাং বিবাহ যার দেরীতে হবে, সে কাম-প্রবৃত্তি অন্য ভাবে চরিতার্থ কত্তে পারে। ভাল মানুষ সাজবার জন্য তারা একথাও বলে,—"দেখ, আমরা যদি আমাদের কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য গৃহস্থের মেয়ে বা বৌ' এর দিকে দৃষ্টি দিই, তাহ'লে সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হবে। এই জন্য সমাজকে অটুট রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে আমরা সমাজ-বহির্ভূতা রমণীদের কাছে যাই। তোমরা বরং এজন্য ধন্যবাদ দিতে বাধ্য।" তারা যদি দয়া ক'রে সমাজভুক্তা কুমারী, সধবা ও বিধবাদের রেহাই দেন, তবে সেটা মন্দের ভাল বলতে হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই শেষে আর সামাজিক নারী আর অসামাজিক নারীর ভিতরে পার্থক্যটুকু দেখ্‌তে পান না। তখন তাদের যুক্তি হয়,—"দেখ, যারা প্রলোভনে টলে, আমরা মাত্র তেমন অপদার্থ মেয়েদের সম্পর্কে একটু চেষ্টা-চরিত্র করি, কিন্তু ভাল মেয়েদের আমরা কাছ ঘেঁসি না।" এভাবে অনেক অসদ্‌যুক্তি তাদের মুখ

দিয়ে বেরোয়। কিন্তু তাতে আসল কথার কিছুই বদল হয় না। তুমি যে কাম-প্রবৃত্তি পেয়েছ, সে ত' বিবাহ করবার জন্যই পেয়েছ। নিজেকে নর্দ্দমার কীটে পরিণত করার জন্য পাও নাই। তুমি যে কাম-প্রবৃত্তি পেয়েছ, তাকে সদ্ব্যবহারে এনে একটী সাধ্বী রমণীর গর্ভে তোমার বংশধর সৃষ্টির সহায়তা কর্ব্বে, কাম-প্রবৃত্তি তুমি সেইজন্যই পেয়েছ। ভগবান্ তোমাকে ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহারের জন্য, অপব্যবহারের জন্য নয়। ভগবান্ তোমাকে শুক্ররূপী শক্তি দান করেছেন, তাকে কাজে আন্‌বার জন্য, যেখানে সেখানে ফেলে দিয়ে তাকে নষ্ট করার জন্য নয়। উদরস্থ মল মানুষ যে-কোনও পায়খানায় ফেলে দিতে পারে, কারণ, ফেলে দেওয়ার ভিতরেই তার সদ্ব্যবহার। কিন্তু শুক্রকোষস্থ বীর্য্য যে-কোনও স্থানে অপব্যয় করলে তার সার্থকতা কিছু হয় না। তোমারই শুক্রবিন্দু গর্ভে ধারণ ক'রে তেজস্বী এক সন্তান প্রসব কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায় কোনও এক অজ্ঞাত গৃহে একটী কুমারী মেয়ে আজ যেই সময়ে প্রাণপণে বিবেকবলে চিত্তজয় কচ্চে এবং অভিভাবকদের প্রখর দৃষ্টির অধীনে পাপের ছোঁয়াচ থেকে আত্মরক্ষা ক'রে যাচ্ছে, বিবাহের পরে তুমি যখন প্রণষ্ট-সর্ব্বস্ব হ'য়ে শুক্রধারাকে নানা কদর্য্য ও সংক্রামক রোগের ভাণ্ডারে পরিণত ক'রে নিয়ে তারপরে সেই রমণীর সাথে মিলিত হবে, তখন তোমার এই উচ্ছৃঙ্খলতা কি অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, অঙ্গহীন, বুদ্ধিবিকল পুত্রকন্যার ভিতর দিয়ে সেই সাধ্বীকে আমৃত্যু শেলবিদ্ধ করবে না? বিচার কর, ভাবো এবং আত্মসংশোধন কর।

কলিকাতা
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

আশ্রম-বাসের অযোগ্য ব্যক্তি কে

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি মোচাগড়া আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীর নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

"অলস ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি কোনও আশ্রমে থাকিবার যোগ্য নহে। কাজের সময় আসিলেই একটা না একটা ছুতা-নাতা করিয়া অন্যদিকে সরিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি তোমাদিগকে দমন করিতে হইবে। এখন করিব না, তখন করিব, করিয়া সময়ের কাজকে অসময়ে নিয়া ফেলিবার ত্রুটী হইতেও তোমাদিগকে বিমুক্ত হইতে হইবে। মানুষের মন সর্ব্বদাই কর্ম্মপ্রার্থী, কাজ ছাড়া সে থাকিতে পারে না। এই জন্যই দেহকেও সর্ব্বদা কোনও না কোনও একটী কাজে লাগাইয়া রাখা প্রয়োজন। যে কাজ যে সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, সেই সময়ে দেহকে সেই কাজে নিয়োজিত করিয়া রাখিতে হইবে। যে সময়ে প্রয়োজন কোদাল মারার তুমি সেই সময়ে বসিয়া লঙ্কার আচার তৈরী করিবে, যে সময় প্রয়োজন ধ্যান জপাদির, তুমি সেই সময়ে বসিয়া তানপুরায় স্বরগ্রাম সাধিবে, ইহা কর্ম্মণ্য লোকের লক্ষণ নহে। আলস্য যেমন দোষের, অকর্ম্মে, অল্পলাভজনক কর্ম্মে বা অপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া কার্য্যকাল নষ্ট করাও তেমন দোষের জানিও। সংসারে থাকিলে শ্রম করিতে হয়, এই জন্য অনেকে আশ্রমবাসী হইতে আসে। আর, তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিতে পারে,

এমন আশ্রমও দু-দশটা আছে। কিন্তু অলস প্রতিপালনের জন্য যে আমি আশ্রমের পরিকল্পনা করি নাই, একথা তোমরা স্মরণ রাখিও। তোমরা মনে রাখিও যে, আমার মতে আলস্যের চেয়ে আর বড় পাপ কিছু নাই, বড় অপরাধ কিছু নাই, বড় দোষ কিছু নাই। অনলস ব্যক্তি বিপথে গেলেও কখনও বীর-বিক্রমে ফিরিয়া আসিতে পারে এবং যতটুকু অধোগতি লাভ করিয়াছে, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ অভ্যুদয় অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অলস ব্যক্তি সুপথে চলিয়াও অগ্রসর হইতে পারে না, পথের পাশে বসিয়া ঝিমায়। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, অনেক সংসারী লোক বহু আশ্রমবাসীকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে? বহু আশ্রমের তথাকথিত আশ্রমবাসীদের আলস্য-তন্দ্রিত মন্থরগমন দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়াই সংসারীরা আশ্রমবাসীদিগকে উপহসনীয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

"বহুভাষী ব্যক্তিও আশ্রমবাসের উপযুক্ত নহে। রহিমপুর উৎসবে ও মোচাগড়া উৎসবে বড় বড় হরফে আমি যে সব কথা লিখিয়া প্রদর্শনী করিয়াছিলাম, তাহার একটা হইতেছে,— 'কাজের শত্রু বেশী কথা।' যে বেশী কথা কহে, সে কাজ কম করে। অনেক সময়ে বেশী কথার দরুণ অনেক প্রয়োজনীয় কাজ নষ্ট হয়। কাজের সুবিধার জন্যই কথার সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। রসনা যত বিস্তারিত হইবে, হস্ত তত সঙ্কুচিত হইবে, ইহা চিরকালের সত্য। বাক্যবীরেরা জগতে কদাচিত্ই কর্ম্মবীর হইতে পারিয়াছেন। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, রহিমপুর আশ্রমে অধিকাংশ সময়ে আমি নিঃশব্দে

কাজ করিয়াছি এবং হস্তপদাদির প্রত্যেকটী সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজে নামজপ করিয়াছি এবং কর্ম্মীদিগকে দিয়া নামজপ করাইয়াছি? তাহার দুই চারিখানা ইট তোমরাও কাটিয়াছ। রহিমপুর এবং মোচাগড়ায় আমার সঙ্গে দুই চারিবার কোদাল তোমরাও মারিয়াছ। আমি কি নিঃশব্দ কর্ম্মকে সশব্দে কর্ম্ম অপেক্ষা সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি নাই? অবশ্য কাজ করিতে করিতে কোনো কোনো দিন কথাও বলিয়াছি। কিন্তু এমন কথাই বলিয়াছি, যাহা তোমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কুশল দিবে। কিন্তু তোমরা যাহারা তখন কথা কহ নাই, মাত্র তাহারাই সেই সকল উপদেশাবলী শ্রবণ করিতে সমর্থ হইয়াছ। নিজে কথা কহিতে গেলে অপরের কথা আর শুনিবার অবকাশ থাকে না। তুমি নিজে যতটুকু জানো, কথা ত' ততটুকু নিয়াই কহিবে। অজানা বিষয়ে ত' আর কহিতে পারিবে না! আর, আন্দাজী কতকগুলি কথা কহিয়া গেলে তাহা দ্বারা তোমার যে জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, এমন সম্ভাবনাও কিছু নাই। পরন্তু অপরের কথা শুনিবার জন্য একটু শান্ত হইলে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার অভিজ্ঞতা কতক কতক নিজের আয়ত্তে আসে। জগতে পড়িয়া পণ্ডিত কয়জন? শুনিয়াই অধিকাংশ লোক পণ্ডিত হইয়া থাকে। শিবাজী বা আকবর কতটুকু লেখাপড়া জানিতেন? কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানী লোকের মুখে সৎকথা শুনিবার সুযোগকে উপেক্ষা করেন নাই। এই জন্যই একজন শিবাবতাররূপে পূজিত ছত্রপতি এবং আর একজন একটা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা রূপে পূজিত সম্রাট্। রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন্ কলেজে পড়িয়াছিলেন? কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে

সর্ব্বদাই যে সকল জ্ঞানবান্ পুরুষ ও জ্ঞানবতী মহিলারা আসিতেন, তাঁহাদের শত শত মুখে তিনি ধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই পরবর্ত্তীকালে সমগ্র জগতে তিনি যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের মারফতে নিজ বাণী প্রচার করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধুত্ব বহুভাষিতাতে নহে, সাধুত্ব সাধু-আচরণে এবং সত্যোপলব্ধিতে। সুতরাং তোমরা বাক্-সংযমী হও। অবশ্য, বাক্সংযম বলিতে মৌনব্রত গ্রহণ বুঝিও না। মৌনব্রত গ্রহণের বহু সুফল আছে, কিন্তু এক বৎসর একাদিক্রমে মৌনী থাকিয়া তারপরে প্রথম বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দুনিয়ার সকলের মুণ্ডপাত শুরু করিতে কি কাহাকেও কাহাকেও দেখা যায় না ? সুতরাং বাক্-সংযম বলিলে প্রত্যেকটী শব্দকে ওজন করিয়া, বিচার করিয়া, ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া, নিষ্প্রয়োজনীয় স্থলে বর্জ্জন করিয়া মাত্র প্রয়োজনীয় স্থলে কর্ম্মের সৌকর্য্যার্থ বা সহকর্ম্মীদের সুবিধার্থ বা প্রতিবেশী জনগণের হিতার্থ বাক্য-ব্যবহার বুঝিও।

"বহুভোজী ব্যক্তিও কোনও আশ্রমে বাসের উপযুক্ত নহে। তিনটী বহুভোজী ব্যক্তি একত্রে মিলিলে একটা আশ্রম একেবারে শেষ করিয়া দিতে পারে। অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টান্ত অতি সহজেই অপরাপরের ভিতরে সংক্রামিত হইয়া ইহাকে সাধনাশ্রম না করিয়া ভোজনাশ্রমে পরিণত করিয়া দিবে। শরীরকে পীড়িত না করিয়া যত অল্পে তার স্বাস্থ্য, কর্ম্মশক্তি ও সৌষ্ঠব রক্ষা করা যায়, সেই দিকে তোমাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমি একথা বেশ বুঝি যে, বর্ত্তমানে তোমাদের পক্ষে এই উপদেশ সুপ্রযুক্ত

হইবে না, কারণ, ক'দিন পূর্ব্বেও আমার সহিত তোমরা উপবাসে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইয়াছ। হয়ত আরও বহুদিন তোমাদের এই ক্লেশ থাকিবে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের স্মরণ রাখার প্রয়োজন আছে যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আহার করিব, আহার করিবার জন্য বাঁচিব না। শরীর রক্ষার জন্য আমরা ঔষধ কি একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় সেবন করি না ? আহারীয় দ্রব্য সম্পর্কেও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ থাকা আবশ্যক। একদিন ঔষধ ভ্রমক্রমে খাওয়া না হইলে কেহ কি রোগীকে পরদিন ডবল মাত্রায় ঔষধ দেয় ? সুতরাং একদিন কোনও ক্রমে তোমাদিগকে উপবাসী থাকিতে হইলে তোমরাই বা অপরিমিত ভোজন করিবে কেন ? আমি আশ্রমবাসীদের পক্ষে নিমন্ত্রণ খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছি। কেন করিয়াছি ? যেহেতু ভোজের বাড়ীতে যাইয়া আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওয়া অত্যন্ত সহজ। জগতের অধিকাংশ সুকাজ ও অকাজ লোকে সংসর্গের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া করিয়া থাকে। বহু ব্যক্তি যেখানে ভূরিভোজনের উৎসাহে কাছা খুলিয়া কোঁচা ঢিল দিয়া রাখিয়াছে, সেখানে যাইয়া সংসর্গদোষে তুমিও ঠকিবে না, ইহা অনুমান করা কঠিন।

"যে ব্যক্তি বহু লোকের বিদ্বিষ্ট এবং যে বহু লোকের প্রতি বিদ্বেষবান্, এমন ব্যক্তি আশ্রমবাসের যোগ্য নহে। বহু-বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি অনায়াসে নিজের দরুণ প্রতিষ্ঠানের উপরে লোকের অকারণ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবে, বহু-বিদ্বেষী ব্যক্তি অনায়াসে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বহু শত্রু সৃষ্টি করিয়া নন্দনকাননসম মনোরম আশ্রমপদকে মেছুনীর হাটে পরিণত করিবে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিকে আশ্রমের

বাহিরে থাকিয়া সর্ব্বাগ্রে সকলের সহিত বিদ্বেষ মিটাইয়া, কলহ চুকাইয়া, সকলকে ক্ষমা করিয়া, সকলের ক্ষমা অর্জ্জন করিয়া তৎপরে আশ্রমবাসের অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। বহু অপদার্থ লোক ব্যক্তিগত কারণে নানা স্থানে বহু জনের সহিত বিদ্বেষ ও কলহ সৃষ্টি করে, পরে কোনও আশ্রমে যাইয়া কাছা ছাড়িয়া দিয়া বৈরাগী হয়, কিন্তু পূর্ব্ব-বিদ্বেষ ও পূর্ব্ব অপরাধ, হয় তাহাকে নাকাদড়ি দিয়া সংসারে ফিরাইয়া নেয় নতুবা আশ্রমটাকে একটা নরককুণ্ডে পরিণত করে। আশ্রমে আসিবার পূর্ব্বে তোমরা যে যেখানে লোকের সঙ্গে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছ, তাহারা অবিলম্বে ক্ষমা করিয়া এবং ক্ষমা চাহিয়া সকল দ্বেষের মূলোৎপাটন কর।

"অসরল ব্যক্তি আশ্রম বাসের যোগ্য নহে। মনে ভাবি এক প্রকার মুখে বলিব অন্য প্রকার, হয়ত বা কাজে করিব তৃতীয় প্রকার—ইহা অতি বিপজ্জনক দোষ। বাহিরে দেখাইব বাধ্যতা, ভিতরে করিব ষড়যন্ত্র, বাহিরে কহিব মিষ্টি কথা, ভিতরে ভিতরে কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইব; বাহিরে করিব প্রশংসা, ভিতরে চলিবে শত্রুতা, বাহিরে করিব সুদীর্ঘ প্রণাম, ভিতরে করিব ক্ষতির চেষ্টা—এরূপ লোক কোনও আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে থাকা উচিত নহে। এক হাজার বন্য জন্তুতে একটা পল্লীর যে অনিষ্ট করিতে পারে না, একটা অসরল লোক তাহার অধিক করিতে পারে। সংসারী লোক কপটতা দ্বারা কপটতাকে জয় করিতে লোক-নীতি দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই চেষ্টায় বৈষয়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা অনেক সময়ে সম্ভবপর হইলেও

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি ত' সকল সময়েই অনিবার্য্য। আশ্রমে আসিয়াও যদি এই ভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষয় ও নৈতিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তবে আশ্রমে আসিয়া লাভ কি? অতএব সকল আশ্রমবাসীদের কল্যাণার্থে অপর অসরল আশ্রমীকে বিতাড়িত করা উত্তম পন্থা। অবশ্য, অসরলকে সরল হইবার সুযোগ প্রদান করাও কর্ত্তব্য।

"নৃশংস ব্যক্তি আশ্রমবাসের অযোগ্য। নিষ্ঠুরতা এমন এক পাপ, যাহা অতি সহজে একজনের দেখাদেখি অপরের ভিতরে সংক্রামিত হয়। আশ্রমবাসীর প্রধান গুণ হইবে, সহানুভূতি। একের দুঃখে অপরের সমবেদনা থাকিলে নিষ্ঠুরতার জন্ম অসম্ভব। নিজ গৃহে যখন ছিলে, তখন তুমি সকলের আদুরে গোপাল ছিলে, তুমি যাহাকে যে ভাবে নিপীড়ন করিয়াছ, বাহবা দিয়া গৃহবাসীরা সকলে তাহার সমর্থন করিয়াছে,—এই যুক্তিতে তুমি আশ্রমবাসী হইবার পরেও অপরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিবে, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। এই যুক্তি আঁকড়াইয়া থাকিতে হইলে দ্রুত গৃহে ফিরিয়া যাও। সেখানে অনেক নৃশংস আচরণকে লোকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, সেখানে অনেক হিংস্র ব্যবহারকে লোকে প্রাত্যহিক আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ বলিয়া জানে। নৃশংসতারই যদি অনুশীলন করিতে হয়, আশ্রম তোমার বাসস্থান নহে। অন্য প্রকারে শত ভাল লোক হইলেও নৃশংস ব্যক্তি সাধু-জীবন-যাপনকারীদের পক্ষে সঙ্গের অযোগ্য। এরূপ ব্যক্তিকে দূরে সরাইয়া দেওয়া সঙ্গত।

"দেশকালানভিজ্ঞ ব্যক্তিও আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। তবে

এই হিসাবে অযোগ্য ব্যক্তিকে ক্রমশঃ গড়িয়া তোলা সহজ। যে আশ্রম লোকালয় হইতে শত মাইল দূরে স্থাপিত হইবে, নিদ্রা হইতে উঠিয়াই যে আশ্রম-বাসীদের পল্লীর লোকের সহিত দেখা-শুনা হইবে না, এমন আশ্রমের অন্তেবাসীদের দেশকালাভিজ্ঞতার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু থাকিবে লোকালয়ের নিকটে, ভাবের আদান-প্রদান চলিবে অল্লাধিক লোকালয়-বাসীদের সহিত, এমতাবস্থায় দেশকালে অনভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। এই অনভিজ্ঞতাতে আশ্রমবাসীর ব্যক্তিগত নৈতিক কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা প্রায় স্থলেই নাই, এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু নগ্নকায় ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যদি কোনও কুমারী-বিদ্যালয়ের নিকটস্থ স্থানে নিজেদের আশ্রম রচনা করেন, তবে তাহা দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইতে পারে কি না, বুঝিয়া দেখিও। এরূপ ক্ষেত্রে নিতান্ত অসম্ভব না হইলে নগ্নকায় মহাপুরুষদেরও বস্ত্র পরিধান সঙ্গত হইবে। একটা দৃষ্টান্ত মাত্র দিলাম। ইহা নিঃসন্দেহ যে, তোমাদের কোনও আশ্রমে নগ্নকায়ে অবস্থান করাকে ধর্ম্মার্থে আবশ্যক বলিয়া কখনও গণনা করা হইবে না।

"আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তিরাও আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। তবে প্রাণপণে সরল জীবন-যাপনের চেষ্টার মধ্য দিয়া যে-কোনও ব্যক্তির আড়ম্বরপ্রিয়তার হ্রাস সাধন সম্ভবপর। সরল জীবনই যে শান্তির জীবন, অশনে, বসনে, বচনে এই তিনটী ব্যাপারে আড়ম্বর-বর্জ্জনই যে নিরাপদে আত্মগঠনের সুযোগ সৃষ্টি করে, একথা তোমরা কখনও ভুলিও না।

"পরনিন্দক ব্যক্তিরা আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। পরনিন্দাকে দুধারী তলোয়ারের সহিত তুলনা দেওয়া চলে। এক দিকের ধারে পরের অনিষ্ট হয়, অপর দিকের ধারে নিজের অনিষ্ট হয়। শুধু পরনিন্দা করাই দোষের, তাহা নহে। পরনিন্দা শোনাও দোষের। তোমরা যদি পরনিন্দা শ্রবণে সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমাদের সহকর্ম্মীরা কয়দিন পরনিন্দা করিতে পারিবে ? শ্রোতা না থাকিলে কি কেহ কথা বলে ? বাজারে যদি ক্রেতা না থাকে, তাহা হইলে কি পচা শুট্‌কি মাছের আমদানী হয় ?"

"যশোলোভী এবং কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সু ব্যক্তি আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। যশোলাভ মিথ্যায় আসক্ত করে, কর্ত্তৃত্ব-লোভ অন্তরে নিষ্ঠুরতা জন্মায়। আত্মযশোলোভ অপরের ঈর্ষ্যা সৃষ্টি করে, কর্ত্তৃত্ব-লোভ সাধন-নিষ্ঠা হ্রাস করে এবং উভয়ই চিত্তকে বহির্ম্মুখ করে। যশোলোভ আত্মদোষে অন্ধতা জন্মায়, কর্ত্তৃত্বলিপ্সা কর্ত্তব্যজ্ঞান হ্রাস করে। কালপ্রতীক্ষা, সহিষ্ণু-আত্মগঠন, নিবিষ্টচিত্তে কর্ত্তব্য পালন দ্বারা বিনা লোভেও যে যশ ও কর্ত্তৃত্ব করায়ত্ত হয়, তাহা ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না। নির্ব্বোধ লোকেরা না বুঝিয়া জগতের শান্তিভঙ্গ অতি অল্পই করিয়াছে। কিন্তু যশঃপ্রার্থী কর্ত্তৃত্বলিপ্সু অবিবেচক ব্যক্তিরাই বারংবার জগতে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করিয়াছে।

"ক্ষমাহীন কলহপ্রিয় ব্যক্তিরা আশ্রম-বাসের যোগ্য নহে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি কলহ করিতে পারে না, দৈবাৎ কলহে লিপ্ত হইলেও দীর্ঘকাল কলহ চালাইতে পারে না, অচিরেই শুভবুদ্ধির

উদয় হয় এবং থামিয়া যায়। কাটাকাটি মারামারি করিবার জন্য ত' সংসারই পড়িয়া আছে। কলহ-কোলাহল ভাল লাগে ত' সেখানে ফিরিয়া যাও। কুকুরে আত্মকলহ করে, উহা তাহার স্বভাবধর্ম্ম। আশ্রমবাসীরা আত্মকলহ করিবে, ইহা কোন্ ধর্ম্ম ? না বুঝিয়া যদি কেহ কলহে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, ত' অবিলম্বে ক্ষমা কর, ক্ষমা চাহ। কাহার দোষ বেশী, কাহার দোষ কম, এই বিচারের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষার কি প্রয়োজন ? অপরেরই দোষ যদি বেশী বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তার ফলে তোমার কি কিছু অতিরিক্ত পুণ্য সঞ্চিত হইবে ? কলহকালে ক্ষমা চাহিবার আগে প্রতিপক্ষকে যে ক্ষমা করে, সে অতীব মহৎ। দুই কলহ-পরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে অল্পাপরাধ জানিয়াও কলহ নিবারণের মানসে অগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ত্রুটী স্বীকার করিয়া দীনতা অবলম্বন করে, সেও অতীব মহৎ। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে যদি উন্নতি লাভ করিতে হয়, তবে ক্ষমা-প্রার্থনায় আত্ম-সম্মান নষ্ট হয়, এইরূপ অমূলক ধারণা পোষণ সঙ্গত নহে। তবে, পরনারী-ধর্ষণ-রত দুর্ব্বৃত্তকে ধরিয়া পুলিশের হাতে দিয়াছ, এজন্য তোমাকে দুর্ব্বৃত্তের নিকটে ক্ষমা চাহিতে হইবে, আমি এমন কথা বলিতেছি না।

"ক্ষমাহীন ব্যক্তি যে আশ্রমবাসের যোগ্য নহে, একথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন আছে। এমন রুক্ষ চরিত্রের লোক আছে, মাথা কপাল কুটিয়াও যাহাদের হৃদয় গলান যায় না, শত অনুরোধ, শত উপরোধ তুচ্ছ করিয়া তাহারা নিজেদের ক্রোধে অবিচল থাকে। রাগ করিয়া যখন অন্নত্যাগ করিয়াছি, তখন কোনও

প্রবোধ বচন বা কোনও সান্ত্বনা-ভাষণই আর কাজ করিবে না, আমি আমার জিদই রাখিব। এইরূপ মেজাজের লোকগুলিকে সংসারাশ্রমে পাঠাইলেও সংসারের বিপদ, অতএব হিংস্র-জন্তু-সমাকুল অরণ্যেই পাঠান উচিত। অপরের বিনয়ে যাহার ক্রোধ-শান্তি হয় না, তাহার স্থান আশ্রম হইতে পারে না।

"সর্ব্বশেষে দুর্ব্বিনীত ও অবাধ্য লোকদের কথা বলিব। অপর সকল দোষ সংশোধিত হইতে পারে, যদি কেহ বাধ্য হয়। বাধ্যতারূপ একটি গুণ যার আছে, জগতের সকল সদ্গুণ সাধিয়া আসিয়া তাহাকে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত করে। জীবন-গঠনের কালে যে বিনা তর্কে আদেশ পালন করে, জীবন সুগঠিত হইবার পরে জগৎ তাহার আদেশ পালন করে। শুধু বাহিরের বাধ্যতা নয়, বাধ্যতা প্রয়োজন দেহ ও মন উভয়ের। বাহিরে আদেশানুবর্ত্তী রহিয়া ভিতরে বিরোধী মনোভাব পোষণ করিলে তাহা কোনও কাজে আসিবে না। খাঁটি, অকপট, অকৃত্রিম বাধ্যতা চাই। বিনয় বাধ্যতার নিত্য সহচর। বাধ্যতা আসিলে বিনয় আপনা-আপনি আসে। আমি তোমাদিগকে বাধ্য হইবার জন্য উপদেশ সব চেয়ে অল্প দিয়াছি, ইহা সত্য। কিন্তু তোমাদের পক্ষে বাধ্যতার চেয়ে যে বড় গুণ কিছু আছে, তাহাও আমি মনে করি না।"

নিখিল ভুবনকে সঙ্গে লইয়া সাধন

অপরাহ্ণে তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি হাওড়া, শালকিয়াতে, রামলাল মুখার্জ্জী লেনে নারীশিল্প সমিতি দেখিতে গিয়াছেন।

মহিলারা সৎকথা শুনিতে আসিয়াছেন।

এই পল্লীরই একটী মহিলা বলিলেন যে, বিগত রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তিনি বাবামণিকে দেখেন নাই। কিন্তু অদ্য প্রত্যক্ষ দর্শনের পরে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির সহিত সম্পূর্ণ মিল দেখিয়া তিনি বিস্ময় বোধ করিতেছেন। স্বপ্নে মহিলাটী শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এখনও সেই প্রার্থনা জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বছর খানিক ধ'রে অনেকের মুখে শুনছি যে, তাঁরা স্বপ্নে আমাকে দেখেছেন। এর মানে আমি কি বুঝি জানো ? আমার বীণার তার যে সুরে বাঁধা, তোমাদের বীণার তার সেই সুরে বাঁধা। আমি যে ঐক্যতান বাজাতে চাই, তোমাদিগকে সেই ঐক্যতানে যোগ দিতে হবে। আমি মূল রাগিণী বাজিয়ে যাব, তোমরা তাতে রংপড়ন তুলবে। আমার যোগ একক সাধনের নয়, আমার যোগ নিখিল ভুবনকে সঙ্গে নিয়ে। নিখিল ভুবন জুড়ে এক সঙ্গে একমন্ত্রের ধ্বনি উঠবে, তাতে নিখিল বিশ্ব এক সাথে বিশ্বপতির চরণ দর্শন পাবে।

তৎপরে মহিলাটীর দীক্ষা হইল।

নারীর সতীত্ব ও ভগবদ্বিশ্বাস

শিল্প-সমিতির কর্ম্মিণীরা দুই চারিটী কথা শুনিতে চাহিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

নারীকে যেখানে পূজা করা হয়, দেবতারা সেখানে আনন্দিত হন,—শাস্ত্রে একথা আছে। বাস্তবিক কোন্ জাতি কতখানি

উন্নত, তার বিচার এই মানদণ্ডেই হবে। যে জাতি নারীকে যত উচ্চ আসন দিয়েছে, সত্যি সত্যি সেই জাতি তত বড়। কিন্তু পুরুষেরা নারীকে উচ্চ আসন দেবে, এতেই নারীর কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গেল না। নারীকে দেবতার মত পূজা পাওয়ার যোগ্যা হতে হবে। নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে, নিষ্পাপ নির্লালস সঙ্গ দিয়ে, নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক শিক্ষা দিয়ে পুরুষ জাতিকে গ'ড়ে তোলবার দায়িত্ব নারীকে নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে হবে। নিজেদিগকে পুরুষ-জাতির কৃপার পাত্রী ব'লে জ্ঞান না ক'রে, পুরুষ-জাতির চিত্তমল বিদূরণে, পাপ বিশোধনে, কুসংস্কার পরিহরণে উৎসাহদাত্রী, শিক্ষাদাত্রী, জননী-সমা অভয়-বিধাত্রীরূপে তাকে আত্মপ্রকাশ কত্তে হবে। কিন্তু তার এই অধ্যবসায়ের গোড়া তার এই প্রয়াসের পুঁজী হবে তার ঈশ্বরনিষ্ঠা। পুরুষ যখন নাস্তিক ও পাপাচ্ছন্ন হয়, তখন সে বড়জোর নিজে নরকে ডোবে। নারী যখন নাস্তিক ও পাপীয়সী হয়, তখন সে নিজেও ডোবে, ত্রিভুবনও ডুবায়। এজন্য তোমাদের জীবনকে সতীত্বে, সচ্চরিত্রতায়, ভগবদ্বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলতে হবে। অন্য সকল বিবেচনা এক দিকে আর নিষ্কলঙ্ক সতীত্বের মর্য্যাদা এক দিকে। অন্য সকল গবেষণা এক দিকে, আর অক্ষয় ঈশ্বর-বিশ্বাস এক দিকে। তোমাদের শক্তির মূল এইখানে, তোমাদিগকে আমরা মহাশক্তি ব'লে পূজা ক'রে থাকি। কি কুমারী, কি সধবা, কি তপস্বিনী, তোমাদের ত্রিবিধ মূর্ত্তিতেই আমরা তোমাদের অর্চ্চনা করি। কেন করি ? যেহেতু তোমরা যদি সতীত্বে আর সাধনায় একান্তভাবে নিষ্ঠাপরায়ণা হও, তাহ'লে এক জন নারী

শত জন পুরুষের সমান কাজ সমাজের হিতকল্পে কর্ত্তে পার্ব্বে। নারীর সতীত্ব জাতির অমূল্য সম্পদ, নারীর ভগবদ্বিশ্বাস জাতির মঙ্গল-ভাণ্ডার।

সঞ্চয়ের সময়ে সঞ্চয় কর

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাবামণি ৩৬ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জৌনপুর জেলা-নিবাসী একটী হিন্দুস্থানী যুবককে লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বেড়াইতে বাহির হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যৌবনের উল্লাসে মন চঞ্চল হবে, এটা মনের স্বভাব। কিন্তু তুই ত' বাবা মানুষ। মনকে শান্ত করার জন্য যতখানি চেষ্টা সম্ভব, তা' তোকে করতেই হবে। একবার কৃতকার্য্য না হবি ত' দশবার চেষ্টা কর্ব্বি। দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা কর্ল্লে, সকল চেষ্টাই সফল হবে। এখন বয়স সঞ্চয়ের, অপচয়ের নয়। এখন বয়স পরিবর্দ্ধনের, ক্ষয় করার নয়। এখন যত পারিস্ শুধু সঞ্চয় কর, খরচের সময় এলে খরচ কর্ব্বি, তার জন্য এখন কেন তাড়াহুড়া ?

পবিত্র কুমারের সহিত পবিত্র কুমারীর মিলনই কাম্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন যদি বিপথে যেতে চায়, তবে তাকে বুঝিয়ে বল্‌বি যে, এর পরে তোকে বিয়ে করতে হবে এবং বিয়ের আগ পর্য্যন্ত তোকে পবিত্র থাক্‌তে হবে। বিবাহের আগ পর্য্যন্ত যারা পবিত্র থাক্‌তে চেষ্টা করে না, তারা তাদের

ভাবী স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকতার মত দুরন্ত অপরাধ আর কি আছে ? তুই কি তোর ভাবী স্ত্রীর সম্পর্কে এমন কামনা করিস্ যে, সে তোর সাথে বিয়ে হবার আগেই কোনো ইন্দ্রিয়সুখকর প্রমোদে লিপ্ত হোক ? নিশ্চয় করিস্ না। তুই চাস, সে তার কৌমার্য্যটুকুকে নিষ্পাপ শরীরে বহন করুক। তেমনি সে-ও মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতে অধিকারী যে, তার ভাবী স্বামী তার কৌমার্য্যটুকুকে নিষ্পাপ শরীরে বহন করুক। দুইটী পবিত্র দেহ, দুইটী পবিত্র প্রাণ বিবাহ-যোগে একত্র মিলিত হোক, এ কামনা কে না কর্ব্বে? তাই, তুই তোর কোনো আচরণের দ্বারা এই কামনা পূরণের পক্ষে ব্যাঘাতজনক কিছু কত্তে পারিস্ না।

বিবাহের শারীরিক উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহ যখন হবে, তখনও নিজেকে স্ত্রীর উপভোক্তা মনে করা স্বামীর পক্ষে অনিষ্টকর। স্বামীকেও নিজ ইন্দ্রিয়সুখদাতা ব'লে জ্ঞান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে ক্ষতিকর। বিবাহের দ্বারা তুমি তোমার ধর্ম্ম-জীবনকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা কর্ব্বে, এইটী বিবাহের শারীরিক উদ্দেশ্য। স্বামীর সচ্চরিত্রতার প্রহরিণী হবে স্ত্রী, স্ত্রীর সতীত্বের পরিরক্ষক হবে স্বামী,—এই হবে তোমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোভাব। তোমার চক্ষু না পরস্ত্রীতে পড়ে, তোমার হৃদয় না পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়, তারই জন্য তোমার স্ত্রীগ্রহণ। তোমার স্ত্রীর চক্ষু না পরপুরুষে আকৃষ্ট হয়, তার হৃদয় না পরপুরুষে আসক্ত হয়, তারই জন্য

তার স্বামীগ্রহণ।

বিবাহের কৌলিক উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বিবাহের কৌলিক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হ'তে পার না। কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই বিবাহ করেছ, একথা তখন ভুলে যেতে হবে। বরং জানতে হবে, বিবাহ আবশ্যক ব'লেই কাম-প্রবৃত্তি ভগবান্ দিয়েছেন। এই প্রবৃত্তিকে জ্ঞানবলে বশীভূত ক'রে সন্তান উৎপাদনে প্রয়োগ কত্তে হবে। সেই সময় তোমার সামর্থ্যযুক্ত শুক্রের প্রয়োজন হবে। বীজকে যথোপযুক্ত ভাবে ভূমিতে বপন করার জন্যই যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তোমার ভোগেন্দ্রিয় সেই যন্ত্র। এই বীজ এবং যন্ত্রকে যথাকালে তুমি ব্যবহার করবে, অকালে ব্যবহার ক'রে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন কর্ব্বে না, এই জন্যই কাম-প্রবৃত্তি এবং এই জন্যই বিবাহ। কাম-প্রবৃত্তির অধীন না হ'য়ে তাকে নিজের অধীন ক'রে বিবাহের কৌলিক কর্ত্তব্য পালন কত্তে হবে। বিবাহের সেই কৌলিক কর্ত্তব্য হচ্ছে সন্তান-উৎপাদন। যেখানে স্বামী স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসী নয়, যেখানে স্ত্রী স্বামীর প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসিনী নয়, সেখানে এ কৌলিক কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে উদ্‌যাপন করা হয় না।

বিবাহের সামাজিক কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহের সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান-প্রতিপালন এবং তার শিক্ষা-দীক্ষা বিধান। পশুদের কোনো

সমাজ নেই, সবাই নিজেকে নিয়েই মত্ত, তাই তাদের সন্তান-প্রতিপালনের দায় নেই, সন্তানকে সমাজের পক্ষে হিতকর ক'রে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব নেই। মানুষের সমাজে আছ, এজন্য সামাজিক কর্ত্তব্য রয়েছে। সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য-হিসাবেই তোমার সন্তান প্রয়োজন এবং সেই সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষাও প্রয়োজন। এই কর্ত্তব্যটী পালন কত্তে গিয়ে তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ কত্তে হবে, তা তোমার ও তার আত্মোৎকর্ষ-লাভের সহায়তা কর্ব্বে। প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য, সমাজকে শক্তিশালী রক্ষক প্রদান করা। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যাতে ভবিষ্যতে অপারগ না হয়, তারই জন্য এখন থেকেই তোমাকে শিক্ষার্জ্জন ও বীর্য্যধারণ কত্তে হবে।

বিবাহের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বিবাহের ধার্ম্মিক কর্ত্তব্য তার চেয়েও মহৎ। স্বামী আর স্ত্রীর যে ভালবাসা, সেটা একটা নমুনা মাত্র। নমুনা ব'লেই এটা নিতান্ত খাটো জিনিষ এবং শরীরকে অবলম্বন ক'রে এ নমুনার প্রকাশ ব'লে এতে পঙ্কিলতাও অধিকাংশ সময়ে থাকে। কিন্তু এটা হচ্ছে এমন জিনিষের নমুনা, যে জিনিষটীতে ক্ষুদ্রত্বও নেই, অপরিচ্ছিন্নতাও নেই। বিবাহিত দম্পতীর যে ভালবাসা, সেটা হচ্ছে জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রেমময় ভালবাসার একটা ক্ষুদ্র নমুনা। স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসার ভিতরে যেটুকু সুখাস্বাদ, তাতে প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু জীবের সঙ্গে ভগবানের ভালবাসার যে সুখাস্বাদ, তাতে কোন প্রতিক্রিয়া

নেই, তা' ক্ষণমধুর, ক্ষণবিষ নয়, তা' নিতুই মিষ্টি, নিতুই মধুর, তা' ক্ষণকাল-স্থায়ী বা এক জীবনের নয়, তা' চিরস্থায়ী এবং কোটি কল্প-কালের। জগতের সমস্ত নরনারীর দাম্পত্য ভালবাসাকে একত্র কর্‌লে তার পরিমাণ যা' হবে, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে ভালবাসা, তার পরিমাণ, ব্যাপকতা ও গভীরতা তার কোটি কোটি গুণ হ'তেও বেশী হবে। কিন্তু সেই অনন্ত অফুরন্ত ভালবাসাকে নমুনা-স্বরূপে স্বামিস্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে স্বল্পভাবে ফুটান হয়েছে। সুতরাং ভেবে দেখ, বিবাহিত হ'য়ে ভবিষ্যতে কি দারুণ দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ কত্তে হবে। সংসারের মধ্যে থেকে স্ত্রীর সাথে ভালবাসার আদান প্রদান ক'রে সেই ভালবাসার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরীয় ভালবাসাকে আস্বাদন কত্তে হবে। একটী ক্ষুদ্র আয়নাতে যেমন পাঁচতলা দালানেরও প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তোমার বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়ে সেই প্রেমস্বরূপের প্রেমলীলার একটা আব্‌ছায়া প্রতিবিম্ব দেখ্‌বে এবং তারই আলোকে পথ চ'লে ভগবানকে এই মানব-দেহেই দর্শন কর্ব্বে। এই হচ্ছে বিবাহিত জীবনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সব স্মরণ ক'রে এখন সঞ্চয়ের সময়ে প্রাণপণে বীর্য্য-সংরক্ষণ কর।

কলিকাতা
১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শাস্ত্রের বহুত্ব সাধকের পক্ষে বিপজ্জনক

একটী বিচারবান্ যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট উপদেশপ্রার্থী

হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—

দেখ বাবা, কোন্‌টী ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম, তার মীমাংসা যদি শাস্ত্রের উপরে নির্ভর ক'রে কত্তে যাও, তা হ'লে মীমাংসা শেষ হবার পূর্ব্বে তোমার পরমায়ু শেষ হবে। কারণ, তোমার শাস্ত্র-গ্রন্থ একখানাও নয়, দুইখানাও নয়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে চতুর্ব্বেদ থেকে শুরু ক'রে সূত্র, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, আগম প্রত্যেকটির বহু বহু টীকা, ভাষ্য প্রভৃতি, মুখ-প্রচলিত শিববাক্য, গোস্বামী প্রভৃতিদের রচিত লীলামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, কড়্‌চা, ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব-আখড়ায় মুখ প্রচলিত পয়ার, ভিন্ন ভিন্ন ভৈরবী-চক্রের কেন্দ্রে সঙ্গোপনে রক্ষিত ও মুখপ্রচলিত অনুষ্টুপ্, সহসা-আবির্ভূত কোনও নূতন মহাপুরুষের রচিত সংস্কৃত বা অর্দ্ধসংস্কৃত গূঢ়ার্থব্যঞ্জক বাক্যাবলি এবং সর্ব্বশেষে খনার বচন, ডাক-পুরুষের বচন, সবই যে তোমাদের ঋষিবাক্য, সবই যে তোমাদের অভ্রান্ত সত্য। এতগুলি গ্রন্থ বা বাক্য আয়ত্ত কত্তে তিন জন্ম কেন, দশ জন্মেও একজনের কুলাবে কিনা সন্দেহ। আবার, এক শাস্ত্রের বাক্যের সঙ্গে অন্য শাস্ত্রের বাক্যের বিরোধ হ'লে সেই বিরোধ যে আপাতবিরোধ মাত্র, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়, একথা মুখে সকলে স্বীকার কর্লেও তিনটী কারণে কার্য্যতঃ তা' প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। প্রথম কারণ, শাস্ত্রবিশ্বাসী হ'য়েও আমরা অনেকেই অনুদার। দ্বিতীয় কারণ, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের প্রত্যেকটী বাক্যের আপাতবিরোধের পশ্চাতে যে সামঞ্জস্য সত্যই

আছে, তৎসম্পর্কে সুতীব্র বিশ্বাসের অভাব। তৃতীয় কারণ, এই সামঞ্জস্যকে উপলব্ধি করার জন্য যেরূপ সাধন-শক্তি ও ধীশক্তি থাকা প্রয়োজন, তা' সকলের মধ্যে থাকে না সুতরাং সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে শাস্ত্রদৃষ্টিতে জীবন-চালন এক হট্টগোলসঙ্কুল সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। এই হিসাবে খ্রীষ্টান আর মুসলমানেরা একটু শান্তিতে আছে। আদিম হিব্রু বাইবেল, আর গ্রীক সংস্করণ এবং কয়েকখানা টীকাটিপ্পনী আয়ত্ত কর্লেই খ্রীষ্টানদের মোটামুটি মীমাংসা হ'য়ে গেল। মূল কোরাণ, ফেকা, তফ্ছির, কয়েকখানা হাদিস, আর ঐ গ্রন্থ কয়খানার ব্যাখ্যা স্বরূপে রচিত অপর দু'চারখানা গ্রন্থ অভিনিবেশ দিয়ে অধ্যয়ন কর্‌লেই তুমি পূরা আলেম বা ধর্ম্মবিদ্। কিন্তু এর দশ-গুণ শক্তি ও সময় ব্যয় ক'রে অধ্যয়ন কর্‌লেও তুমি হিন্দু শাস্ত্রের অপার জলধিতে ঠাঁই পাবে না। তোমার প্রত্যেকটা অর্থহীন আচার-বিচারকে সমর্থন কর্ব্বার জন্য একটা ক'রে শাস্ত্র আছে। এই গহন অরণ্যে একবার প্রবেশ কর্‌লে বেরুবার কোন উপায় নেই। তুমি এই বিষয়ে এতই অসহায়।

প্রণবই তোমার শাস্ত্র হউক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যই বলি কি, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ছেড়ে দাও। একটী মাত্র শাস্ত্রকে ধর। সেই শাস্ত্রটী হচ্ছে প্রণব-মন্ত্র। তোমার শাস্ত্রই বল্‌ছেন, ধর্ম্মের মূল হচ্ছেন বেদ, বেদের মূল হচ্ছেন গায়ত্রী, আর গায়ত্রীর মূল হচ্ছেন প্রণব। তন্ত্র, পুরাণ, আগম, স্মৃতি, সূত্র, সংহিতা বা লোকমত এদের কোনটাই একথার প্রতিবাদ করেন না। সুতরাং সমস্ত

আপাত-বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য প্রাণপাত না ক'রে, এই প্রণব-মন্ত্রকেই একমাত্র উপজীব্য ব'লে গ্রহণ কর। এই মন্ত্রেরই আপ্রাণ সাধন কর এবং সাধনের ফলে একদিকে সত্যের রস আস্বাদন কর, আর সাধনের দ্বারা প্রোদ্বোধিত common sense (সাধারণ কাণ্ড জ্ঞান) কে হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, পাপ-পূণ্য-নির্দ্ধারণে প্রয়োগ কর। অবিরাম ওঙ্কারের সাধন কর আর সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হ'য়ে, অন্তরের শুদ্ধ বিবেকের আদেশ বুঝে স্বার্থাভিসন্ধিবর্জ্জিত পবিত্র জীবন যাপন কর।

কলিকাতা
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

কাহার সহিত কুটুম্বিতা নাই

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি দ্বারভাঙ্গাতে জনৈক ভক্তের নিকটে এক পত্র লিখিলেন,—

"পরমাত্মা ও আত্মোৎসর্গের পক্ষে যাহাকে পাওয়া যাইবে না বলিয়া বুঝিব, তাহার সহিত আমার এক কণা কুটুম্বিতাও নাই।"

বালকের মত হও

খুলনা-নিবাসী অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বালকের চঞ্চলতা আছে, কিন্তু কোনও বস্তুতে আসক্তি অথবা বিদ্বেষ নাই। এখন সে যাহাতে তৃপ্ত, পরক্ষণে সে

তাহা ছাড়িয়া দিতে পারে। এখন যাহার প্রতি সে রুষ্ট, পরক্ষণে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। বালকের এই অনাসক্ত নির্বিদ্বেষ চিত্তটী তোমার হউক। চঞ্চলতায় কত ক্ষতি করিবে?"

সৎ হইবার উপায়

মালদহ জেলা-নিবাসী জনৈক যুবক সম্প্রতি এম-এ, বি-এল পাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —সৎ হ'তে চাই, কিন্তু সৎ হবার চেষ্টা আসে না কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —সত্যি সত্যি সৎ হ'তে চাও না। মনে কর যে সৎ হ'তে পার্লে ভাল হ'ত, এই পর্য্যন্ত। সৎ হ'তেই যে হবে, তার জন্য আগ্রহকে বাড়াও, ব্যগ্র হও, আপনি চেষ্টা আসবে। আকুল আগ্রহ ছাড়া কি কখনো চেষ্টা আসে?

প্রশ্ন। —আগ্রহকে বাড়াইবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —সৎ হবার প্রয়োজনীয়তা চিন্তা।

প্রশ্ন। —এ চিন্তা আসবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —যাঁরা সৎ, তাঁদের জীবনের সৌন্দর্য্যগুলিকে আলোচনা কর, তাঁদের চিত্তের নিভৃত শান্তি, অন্তরের অফুরন্ত আনন্দ, প্রাণের পরিপূর্ণতা ধ্যান কর।

ইন্দ্রিয়-সুখ-লুব্ধতার কারণ

প্রশ্ন। —ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে বারবার মন যায় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —এক কারণ এই যে, বহুকাল ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে প্রমত্ত হ'য়ে এসেছ। অপর কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়সুখ-

বিমুখ ভগবৎ-প্রেমরস-পিপাসুর সুখের যে কি আস্বাদ, তা জান না।

ভগবৎ-প্রেম-সুখ লাভের উপায়

প্রশ্ন। —ভগবৎ-প্রেম-সুখ কি ক'রে পাব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে। প্রেম-সুখের লোভে যদি ভগবানকে ভালবাসতে যাও, ভালবাসাও প্রকৃত হবে না, প্রেম-সুখও পূর্ণভাবে পাবে না। কিন্তু ঐহিক বা আধ্যাত্মিক কোনো প্রকারের প্রাপ্যকেই লক্ষ্য না ক'রে যদি তাঁর প্রীতিকে লক্ষ্য ক'রে সম্যক্ আত্মসমর্পণ কর, তা'হ'লে প্রেম-সুখ স্বতঃ-আস্বাদিত হবে।

ভগবানের নিকট নত হও

প্রশ্ন।—আপনি কি আমাকে এই সুখ আস্বাদন করিয়ে দিতে পারেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পারি, কিন্তু তার জন্য আধারও অত্যুৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমি পারি শুধু উত্তম আধারে, ভগবান্ পারেন উত্তম অনুত্তম সকল আধারে। সুতরাং আমার নিকট নত না হ'য়ে ভগবানের নিকট নত হও।

ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হও

প্রশ্ন। —আপনাকে মনে মনে স্মরণ কর্লে আপনি তা টের পান? আপনি কি সে ডাকে সাড়া দেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—টেরও পাই, সাড়াও দেই। আমি টের পাই

ব্যাকুল অন্তরে স্মরণ কর্ব্বে। ভগবান্ টের পান ব্যাকুল অব্যাকুল যেভাবে ইচ্ছা স্মরণ করলে। সুতরাং আমার প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে প্রাণপণে ভগবানের প্রতিই আকৃষ্ট হও।

সাধন তোমাকেই করিতে হইবে

প্রশ্নকারী বলিলেন, —আপনিই আমাকে কৃপা ক'রে গ'ড়ে নিন্। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —সদ্যোজাত শিশুকে মা কোলে ক'রে স্তনারস পান করান। শিশু স্তন চিনে না, এজন্য নিজের হাতে স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে প্রবেশ করিয়ে দেন। কিন্তু শিশু নিজের শক্তিতে চুষে নিজের আহারীয় নিজে সংগ্রহ করে। তুমিও শিশু, তাই আমি দীক্ষাযোগে তোমার মুখে আমার স্তনের বোঁটা দিয়েছি, কিন্তু চুষতে হবে তোমাকে,—সাধন দিলাম আমি, সাধন কত্তে হবে তোমাকে।

নামই ভগবানের রূপ

প্রশ্ন। —ভগবানের রূপ কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —ভগবানের নামই ভগবানের রূপ। অন্য রূপের পানে আকৃষ্ট হ'য়ো না।

প্রশ্ন। —অন্য রূপের পানে যদি মন আকৃষ্ট হয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —পূর্ব্ব-সংস্কারহেতু হ'তেও পারে। কিন্তু সেই রূপকে প্রাধান্য দিও না। প্রত্যাহার ক'রে সেই রূপ থেকে মনকে টেনে আনতে পার, ভাল কথা, না পার, সেই রূপের মাঝেই নামের স্থিতি ধ্যান কর। ক্রমে সেই রূপ চ'লে যাবে, নামই নিত্যসত্তারূপে বিরাজ করবে।

ভিন্ন সাম্প্রদায়িকদের আমন্ত্রণ সম্পর্কে কর্ত্তব্য

প্রশ্ন। —ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডবাদী সাম্প্রদায়িকেরা তাহাদের দেবপূজাদিতে আমন্ত্রণ কর্ব্বে আমাদের কি কর্ত্তব্য হবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —তাঁহাদের সাগ্রহ আমন্ত্রণকে অনাদর ক'রো না, কিন্তু তাঁদের অনুষ্ঠানের ভিতরে ম'জে যেয়ো না।

প্রশ্ন। —ম'জে যাওয়া কথাটার মানে কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —অন্তরে যেরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে নিজের ইষ্ট-নিষ্ঠা ক'মে যায়, তেমন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানেই হ'ল ম'জে যাওয়া। তেমন চিন্তার প্রশ্রয় দিও না। মানুষত্রে কি মানুষ জানা অজানা সহস্র বস্তু দেখে না? কিন্তু তাই ব'লে কি যা' দেখে, তার কাছেই কেউ আত্মসমর্পণ ক'রে আসে ? সাধকের আত্মসমর্পণ একটী জায়গায়, শত শত স্থানে নয়।

নামব্রহ্মের পূজা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামব্রহ্মের পূজাই তোমাদের একমাত্র পূজা। নামব্রহ্মের ধ্যানই তোমাদের একমাত্র ধ্যান। নামব্রহ্মের সেবাই তোমাদের একমাত্র সেবা। শত দিকে মন চালিয়ে, শত স্থানে মাথা বলি দিয়ে জীবনের পরম সার্থকতা লাভ হয় না।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—আমার ভিতরে কাম আর প্রেমের অবিরাম লড়াই চলেছে। ভগবৎ-প্রেম-লাভের চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না।

পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লড়াই চলুক, ঘাবড়াও মৎ। যুদ্ধ থাক্‌লেই হার-জিত থাকে। কিন্তু দৃঢ়তার সাথে যদি চল, ভীত হ'য়ে রণে ভঙ্গ না দাও, পরিণামে সত্যেরই জয় হবে। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ম'রেও রাজা যুধিষ্ঠিরই জয়ী হ'লেন। সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অন্তরের সকল সুপ্ত সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হোক। তার পরের অবস্থাই পূর্ণ জয়।

ব্রহ্মচর্য্যের তিন অত্যুন্নত অবস্থা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের লক্ষণ বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পূর্ণ ব্রহ্মচারী তিনি, যিনি দিনের পর দিন চেষ্টা ক'রেও মনের ভিতরে কামভাব জাগরিত কত্তে পারেন না। সাধনের অত্যুন্নত অবস্থার এইটী হচ্ছে আশ্চর্য্য দান। এর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার ব্রহ্মচারী তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে চেষ্টা করে অন্তরে কামভাব জাগরিত কত্তে পারেন। পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যদি সংসারাশ্রম গ্রহণ ক'রে সন্তান উৎপাদন প্রয়োজন বোধ করেন, তবে কামভাব বর্জ্জিত ভাবে তাকে অগ্রসর হ'তে হয়, এবং কামভাবের অভাবহেতু ইন্দ্রিয়াদির যে অপূর্ণ অবস্থা, তাকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা পূর্ণাবস্থা দিতে হয়। এইরূপ ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ জগতে কয়েক কোটিতে দু' একটী আছেন। এর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার ব্রহ্মচারী যিনি, তিনি সন্তানোৎপত্তির প্রয়োজনে বিশেষ চেষ্টা ক'রে কামভাবকে আনয়ন কত্তে পারেন এবং

তখন ইন্দ্রিয়নিচয় কামের উত্তেজনায় আবশ্যকীয় পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ জগতে দু'চার লক্ষে দু'একজন আছেন। তারও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার ব্রহ্মচারী তিনি, যিনি কামলেশ-বর্জ্জিত নন, কিন্তু যে-কোনও সময়ে কামকে পদানত কত্তে সমর্থ। এরূপ গৃহস্থ-ব্রহ্মচারী জগতে কয়েক সহস্রে দু'একজন আছেন। পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থার ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করেন নাই, তাঁরাই যথাক্রমে পরমহংস, স্বামী এবং ব্রহ্মচারী ব'লে অভিহিত হন। ব্রহ্মচর্য্যের এই তিনটী অবস্থা অতীব উন্নত অবস্থা।

ব্রহ্মচর্য্যের তিন মধ্যবর্ত্তী অবস্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তারও পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি অবস্থা আছে। এই তিনটী অত্যুন্নত অবস্তার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হচ্ছে, কাম আছে, কিন্তু বহু যুদ্ধের পরে তাকে দমনও করা হচ্ছে। এরূপ ব্রহ্মচারীও পূজনীয়। তার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হচ্ছে, কাম আছে, যুদ্ধও চলেছে, কিন্তু ঠিক্ পরাজয়ের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে জয় লাভ হচ্ছে। এরূপ ব্রহ্মচারীও পূজনীয়। এর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হচ্ছে, কামের লড়াই চলেছে, বারংবার পরাজয়ও হচ্ছে, কিন্তু decisive victory (স্থায়ী জয়) লাভের উদ্দেশ্যে সহস্র পরাজয়ের মধ্য দিয়েও সংগ্রামের বিরতি দেওয়া হচ্ছে না। এরূপ ব্যক্তিও ব্রহ্মচারীর মর্য্যাদা-লাভে অধিকারী এবং সম্মাননীয়।

অব্রহ্মচর্য্যের তিন অবস্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাগুলি নিকৃষ্ট স্তরের। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মচর্য্যাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা হ'ল, যুদ্ধ আছে, পরাজয়ও হচ্ছে, কিন্তু এর পরে যুদ্ধ-চালনার আর চেষ্টা নাই, একবার কামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যখন হেরে গেছি, তখন আর চেষ্টা ক'রে কি হবে? পরাজিত, পরাধীন থেকে কাম-কুক্কুরের জীবন-যাপনই শ্রেয়ঃ। এরও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হ'ল, half-heartedly (অর্দ্ধমনে) লড়াই করা, হেরে যাওয়া এবং হার মেনে নেওয়া। তারও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হ'ল যুদ্ধ দিলামই না, একেবারে বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার।

জন্মমাত্রই তুমি যোদ্ধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ব্রহ্মচর্য্যের একেবারে উচ্চতম অবস্থা থেকে অব্রহ্মচর্য্যের নিম্নতর অবস্থা পর্য্যন্ত সবই বর্ণনা কর্লাম। একটু চিন্তা কর্লেই বুঝতে পারবে যে, যুদ্ধের মনোবৃত্তিই তোমাকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দিকে পরিচালিত কর্বে। You are a warrior by birth, —জন্ম-মাত্রই তুমি যোদ্ধা। ফলাফল যাই হোক্, সংগ্রাম পরিত্যাগ ক'রো না।

ভগবানের নাম ও ভালবাসা

বেলেঘাটা হইতে একটী বালক আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার পিঠ চাপ্ড়াইয়া বলিলেন,—ভগবানের নাম তোমার মনে আছে বাবা ?

বালক বলিলেন,—হাঁ, আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—Then you are lovable (তাহ'লে তুমি ভালবাসার পাত্র) ; ভগবানের নামই আমার অন্তরে ভালবাসার সৃষ্টি করে। নামই প্রেম, নামই সত্য।

ইষ্টস্মৃতি

কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের জনৈক বিশিষ্ট অধিবাসীর পুত্র শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট দীক্ষিত। গুরুজনেরা কেহ এই দীক্ষার কথা জানেন না। যুবকটী গোপনে সাধন করেন। অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণির কাছে বসিয়া অনেকক্ষণ উপদেশ শুনিবার পরে তিনি বলিলেন,—আমার মনে ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই, নইলে আপনাকে দর্শন মাত্র আমার ইষ্টনাম স্মরণ হওয়া উচিত হ'ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দর্শন কি বল্ছ বাবা, আমাকে স্মরণ কর্লেও তোমার ইষ্টনাম স্মরণে আসা উচিত হ'ত। ইষ্টনামে নিষ্ঠা এলে ইষ্ট-নাম-সম্বন্ধীয় ও ইষ্টনাম-সম্পর্কিত সকল বিষয়ের স্মৃতিতে পুনঃ পুনঃ ইষ্টস্মৃতি জাগরিত হয়।

নিজের মুক্তি ও পরের মুক্তি

যুবক বলিলেন,—অনেকে নিজের মুক্তি চান, আর অনেকে আপনার মত পরের মুক্তি চান।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অর্থাৎ কেউ টোম্যাটোর অম্বল খান, কেউ চাল্তার অম্বল খান। ফলং-উদরপূরণম্। উভয়েই জীবকল্যাণই করেন,—কেউ জেনে, কেউ না জেনে। নিজের

মুক্তি থেকেও পরের মুক্তি আসে, পরের মুক্তি থেকেও নিজের মুক্তি আসে।

এক জনাতে যুক্ত হও

জনৈক বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারী এবং তাঁহার স্ত্রী কোনও এক জ্যোতির্বিদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছেন যে, অমুক দেবতার পূজা দিতে হইবে, নতুবা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা। তাঁহারা মনের দ্বন্দ্ব ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীবাবামণিকে নিজ গৃহে নিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদের সমগ্র বিবরণ শুনিয়া বলিতে লাগিলেন,—মনে যখন সংশয় এসেছে, তখন যে দেবতার পূজার আয়োজন করেছ, তার পূজা ক'রে ফেলো। সংগৃহীত আয়োজন জলে ফেলে দিয়েও কোন লাভ নেই। কিন্তু বাবা, জীবন ভ'রে কত মনীবের চাক্‌রী করবে, কত জন দেবতার পূজা যোগাবে? একটা পাঁঠা কয়টা মন্দিরে বলি হবে? বসন্তের ভয়ে শীতলা পূজা, কলেরার ভয়ে শ্মশানকালীর পূজা, দুর্নিমিত্তের ভয়ে শনিঠাকুরের পূজা, এই রকম ক'রে ক'রে জীবন ভ'রে কত জনের পূজা কর্ব্বে? পূজা ত' কোন দেবতার হচ্ছে না, হচ্ছে তোমার ভয়ের। তোমার ভীতিকে তুমি পূজা কচ্ছ। প্রীতির পূজা কৈ? সহস্র দেবতার পূজা ছেড়ে এক-জনাতে যুক্ত হও। যেই একজনাকে পূজা কর্লে সঙ্গে সঙ্গে সকলের পূজা হয়, সেই এক জনাকে আশ্রয় কর। শনি, সূর্য্য, মঙ্গল তাঁরই চরণ-সেবক, ষষ্ঠী, মনসা শীতলা তাঁরই চরণ-সেবিকা। ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশীকে ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করা ভুল। ভিন্ন ভিন্ন চাপরাশীর

ভক্তদের মাঝে ঝগড়া যেন না হয়, এজন্য আমরা ব'লে থাকি, সব দেবতাই একজনের বিভিন্ন প্রকাশ। সামঞ্জস্যের চেষ্টা ছাড়া কলহ মিটান যায় না। কিন্তু বাবা, আসল কথা এই যে, সহস্র চাপরাশীকে পূজা ক'রেও সেই লাভ হ'তে পারে না একমাত্র তাদের মনীবকে খুশী রাখ্‌তে পারলে যা' হতে পারে। গ্রহ-নক্ষত্রের পূজো ছাড়, তাদের প্রভুর পূজো কর। তাতেই শক্তি আস্‌বে, তাতেই শান্তি আস্‌বে।

কলিকাতা
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

ভগবানের কাজে কাল-প্রতীক্ষা অনুচিত

মুঙ্গের-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—"মনুষ্য-জীবন অতি দুর্ল্লভ জীবন। সহস্র বিঘ্নের মধ্য দিয়াও এই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকের শত আকর্ষণের মধ্য দিয়াই একাগ্র মনে ভগবানের নামের পথ বহিয়া চলিতে হইবে এবং সংসারের অনন্ত কোটি সুখ-দুঃখ-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই তাঁর অফুরন্ত প্রেমরসকে আস্বাদন করিতে হইবে। সময় আসে নাই ভাবিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না বা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় অলস-শয়নে পড়িয়া থাকাও শুভপ্রদ হইবে না।

"অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি,—সময় আসুক, একটু অবসর হউক, কাজের ঝঞ্ঝাট কিছু কমিয়া যাউক, তারপর নিশ্চিন্তে বসিয়া ভগবানের নাম করিব। একথা তাহারা অবশ্য সরল

চিত্তেই বলে, মনে কোনও কুটিল কপটতা রাখিয়া তাহারা একথা বলে না। কিন্তু ইহার পশ্চাতে একটা মস্ত বড় বুঝিবার ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহা তাহাদের চ'খে ধরা পড়ে নাই। একটী গান আছে,—'যত দিন যায়, তত কাজ বাড়ে, অবসর কৈ ত' মিলিল না!' বাস্তবিকই ব্যাপারটা অবিকল তাই। কাজের চাপ কমিবে মনে করিয়া যতই কালাপেক্ষা করা যাইবে, ততই দেখা যাইবে যে, দিনের পর দিন কার্য্যের ভার, দায়িত্বের চাপ, গুরু হইতে গুরুতর রূপে ক্রমেই বিবর্দ্ধমান হইয়া চলিতেছে, একটী কাজের সমাপ্তির সাথে সাথে দশটী নূতন প্রবন্ধ আসিয়া মাথা উঁচু করিতেছে, একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে আরও দশটী উদ্বেগজনক শ্রমবহুল কর্ত্তব্য গমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। সুতরাং সময় হউক, তারপরে বসিয়া ভগবানকে ডাকিব,—অবসর আসুক, তারপরে ভগবৎ-প্রেম রসানুশীলনের চেষ্টা পাইব,—এসব বুদ্ধি যে নিতান্তই সরলপ্রাণ ব্যক্তির, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"তুমি ভবিষ্যতের ভরসায় ভগবৎ-সাধনাকে এখন দূরে দূরে সরাইয়া রাখিও না বাবা। আজ হইতেই তুমি তাঁর প্রেমরসকে, তাঁর অপরিমেয় করুণাকে, তাঁর দয়া, মায়া, মমতাকে, তাঁর অপার অসীম স্নেহকে তাঁর নামের সাধনার মধ্য দিয়া আস্বাদন করিতে প্রয়াসী হও বাবা। মন ভাল করিয়া বসিবার দিন আসিলে তারপরে যদি তুমি সাধন-রত হইতে চাহ, তবে জানিও, ইহজন্মে আর তোমার সাধন করা হইয়া উঠিবে না। কারণ, দীর্ঘকাল সাধনার পর ব্যতীত আগেই কাহারও মন স্থির হয় না। প্রবল

প্রয়াসের দ্বারা যখন মন স্থির হয়, তখনই মানব পরমানন্দময়ের পরম-কৃপায় মধুময় অমৃতরসের অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন লাভে সমর্থ হয়।

"আর একটী দিনও বাবা তুমি বৃথায় কাটাইও না। অন্ততঃ দশ মিনিট করিয়া সময় তোমার নিশ্চয়ই হইবে এবং মন বসুক আর না বসুক, এই দশটী মিনিট সময়ই তুমি প্রত্যহ বসিয়া আনন্দময়ের আনন্দপ্রদ নাম জপিতে চেষ্টা কর. চতুর্দ্দিকের বিশৃঙ্খলতা ত' থাকিবেই, কিন্তু তোমাকে তোমার সাধনোদ্যম পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। সময় নষ্ট করিও না বাবা। যে দিনটী যায়, সে আর ফিরিয়া আসে না। একটী দিনকেও ব্যর্থ যাইতে দিও না।"

ভগবানের জন্য ব্যাকুল হও

উক্ত ভক্তের পত্নীকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"ভগবানের জন্য তোমার প্রাণে ব্যাকুলতা জাগুক। নিজে ভগবানকে পাইবার জন্য আকুল হও, সন্তান-সন্ততিগুলিকে আকুল করিয়া তোল, তোমার স্বামীর অন্তরেও এই আকুলতাকে সঞ্চারিত করিয়া দাও। সংসার-জীবনের প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি পরতে শ্রীভগবানের জন্য অপরিসীম অনুরাগ সমাবেশিত কর,—সংসারের সকল সুখভোগের মধ্য দিয়া, সংসারের অপত্য-স্নেহ, স্বামিপ্রেম, অতিথি-সেবার মধ্য দিয়া, সংসারের প্রত্যেকটী কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়া সুকৌশলে, শ্রীভগবানে আত্মসমর্পন করিবার পরমসুখপ্রদ পন্থাকেই মা অনুসরণ কর।"

ভগবানকে পাইবার পথ কঠিন নহে

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন,—

"ভগবানকে পাইবার পথ কি অতি কঠিন? মোটেই নহে। বরঞ্চ আমি বলিব, জগতে মানুষ যত কঠিন কঠিন কার্য্য-সমূহ অনায়াসে সম্পাদন করিতেছে, ততই সহজ পথকে কঠিন ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। তোমরা জান না বলিয়াই মনে কর যে, ভগবৎ-সাধন বুঝি কি একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ-বিশেষ। ভগবানকে ডাকাই যে আমাদের নিত্য জীবিকা, উহাই যে আমাদের জীবন-ধারণের স্বাভাবিক উপাদান! জান না বলিয়াই কঠিন মনে করিতেছ। যেদিন জানিবে, সেদিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে। প্রতিক্ষণে শ্বাসবায়ু টানিয়াও মানুষ বায়ু চিনে না।"

ইচ্ছার শক্তিকে জাগরিত কর

দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল স্কুলের জনৈক ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবৎ-সাধন ছাড়িও না। ইহা তোমার অপবিত্র ইচ্ছাকে পবিত্র করিবে, পবিত্র ইচ্ছাকে অলঙ্ঘ্য করিবে, সুপ্ত কুসংস্কারকে নির্ম্মূল করিবে, সুপ্ত সুসংস্কারকে বিকশিত করিবে, তোমাকে দুঃখে সহিষ্ণু, বিপদে অভীঃ, সংগ্রামে স্থির এবং সর্ব্বকার্য্যে জয়িষ্ণু করিবে। শুদ্ধ ইচ্ছার পবিত্র শক্তিকে তপস্যার বলে জাগরিত কর,—তোমাদের দিয়া আমি জগতের অনেক কাজ করাইতে চাহি।"

তোমাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য রহিয়াছে

লাহেরিয়া-সরাই-নিবাসী অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহারা অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য-প্রয়াস-পরায়ণ, যাহারা জীবনের উন্নতি-বিধানে তৎপর, তাহাদের উপকারার্থে প্রয়োজন হইলে আমি আমার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া রক্ত দিতে পারি। আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবন ভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া এক বরলাভ করিয়াছি। সেই বর এই যে, এই জীবনের প্রত্যেকটী স্পন্দন ছোটকে বড় করিবার কাজে, নীচকে উচ্চ করিবার কাজে, দুর্ব্বলকে সবল করিবার কাজে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ভগবানের নিজকরধৃত যন্ত্রের ন্যায় প্রয়োজিত হইবে। সেই অবধি, যাহার উপরে দৃষ্টি পড়িলে চিত্তে কণামাত্র আবেগ অনুভব করি, তাহারই প্রতি আমার করণীয় রহিয়াছে বলিয়া আমি বুঝি।"

ভগবানের পায়ে চির-আশ্রয়

মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা)-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের ত' বাবা কর্ম্মবহুল জীবন এবং সেই কর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম। দিনের অধিকাংশ সময়ই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরপীড়নে ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই তোমাদিগকে ভগবানের অমৃতময় নামের সেবা অব্যাহত ভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে, একথা যেন ভুলিও না। ভারতের ও

ভারতের বাহিরে হিন্দু অহিন্দু বহু সাধক বহু তাপস গৃহে থাকিয়া প্রচলিত প্রথায় জীবিকা সংগ্রহের সাথে সাথে সুগভীর ঈশ্বর-ভজন করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাঁহাদিগকে আদর্শ বলিয়া জানিও এবং মানিও, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে রুচিশীল এবং চেষ্টাবন্ত হইও। ক্ষণিকের অন্ন সংগ্রহ-কালে ভুলিয়া যাইও না যে, ভগবানের পায়ে তোমাদের চিরআশ্রয়।"

শান্ত হও, পবিত্র হও

লাহেরিয়া-সরাই-নিবাসী অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লক্ষ্য যার যত উচ্চে, সে তত বড় হয়। মন যার যত পবিত্র, সে তত মহৎ হয়। চিত্ত যার যত শান্ত, তার সাফল্য তত অধিক। সদা শান্ত ভাব এবং সদা-পবিত্রতা তোমার চরিত্রের বিশেষত্ব হউক।"

বিবাহাগ্নির পবিত্রতা

অপরাহ্নে একটী বিবাহিত যুবক উপদেশের জন্য আসিয়াছেন। কুমারী অবস্থায় যাহার প্রেম অন্য ব্যক্তিতে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং সেই অপর ব্যক্তিকে স্বামিরূপে পাইবার জন্য যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি এমন একটী কিশোরীকে বিবাহ করিয়াছেন।

সমগ্র বিষয় খুব মনোযোগের সহিত শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা বিষয় বিশ্বাস ক'রো যে, বিবাহের

যজ্ঞাগ্নি স্পর্শের দ্বারা প্রত্যেক রমণী পূর্ব্বপাপ থেকে প্রমুক্ত হয়। এই বিষয়ে একটা গভীর বিশ্বাস না থাকলে, বিবাহ-অনুষ্ঠান একটা নিতান্ত লোক-দেখান ছেলে-খেলা ছাড়া আর কিছুই হয় না। বিবাহের আগে যদি কারো কোনো দৈহিক বা মানসিক পাপ ঘ'টে থাকে, তবে বিবাহের পরে সেই কথা ভুলে যাওয়া উচিত। বিবাহ এক যজ্ঞ, দীক্ষা এক যজ্ঞ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক যজ্ঞ। যজ্ঞ কেন, তিনটাই মহাযজ্ঞ। বিবাহের দ্বারা কৌমার্য্যের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত পাপ থেকে মুক্তি হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্বারা সর্ব্ববিধ ব্যাধিজ পাপ থেকে নিষ্কৃতি হয়। দীক্ষা দ্বারা সর্ব্বপাপ প্রমুক্তি ঘটে।

বিবাহের পরক্ষণ হইতেই স্ত্রীর প্রতি উচ্চভাব পোষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাকে বিবাহ করা উচিত, কাকে বিবাহ করা অনুচিত, এবিষয়ে যত বিচার-বিবেচনা সব বিবাহের আগেই শেষ হ'য়ে যাওয়া কর্ত্তব্য। বউটি সুন্দরী কি সচ্চরিত্রা, এ বিচার বিবাহের পরে হওয়া উচিত নয়। বিবাহের পরক্ষণেই জানতে হবে যে, স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই যেন নূতন জন্ম হ'ল। এই মুহূর্ত্ত থেকে সমগ্র ভাবী কাল জুড়ে দুজনকে পরস্পরের প্রীতিপ্রদ ও ধর্ম্মপ্রদ কাজ ক'রে যেতে হবে। অতীতে যদি ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকে, তবে একজনের ভুল অপরের অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন এবং নিরর্থক। বিশেষতঃ স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর অতীত ভ্রান্তি খোঁজা অত্যন্ত মূর্খতা। স্ত্রীকে অনাঘ্রাত কুসুমের

মত জেনে, অনালিঙ্গিতা লতিকার মত জেনে, তার সঙ্গে স্নেহময়, প্রেমময়, মধুময় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিবাহের পরক্ষণ থেকে তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার এরূপ ধারণাই থাকা উচিত যেন তার মত সরলা, সাধ্বী ও পতিপরায়ণা রমণী জগতে নেই। তোমার ব্যবহারের মহত্ত্ব দিয়ে তাকে মহৎ হ'তে সাহায্য করা উচিত। স্ত্রীর কোনও গুপ্ত কথা জান্‌বার জন্য কখনো চেষ্টা ক'রো না।

স্ত্রীকে তাহার অবাঞ্ছিত অতীত ভুলিতে সাহায্য কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী যদি তোমার প্রেমে স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে তার অতীত জীবনের এমন কোনও কাহিনী বলে, যা তোমার চিত্তের উদ্বেগ-বর্দ্ধক, তাহ'লে তুমি তাতে উদ্বিগ্ন না হ'য়ে স্থির হবার চেষ্টা ক'রো। নিজেও মনে মনে ভে'বো, স্ত্রীকেও প্রবোধ দিও যে, পূর্ব্বজন্মে যে যা করেছে, পরজন্মে তার জন্য বিব্রত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এজন্মে তুমি বৈদ্যের ছেলে। আগের জন্মে শূদ্রের ছেলে-রূপে যে যে কাজ করেছ, তা' ভেবে তোমার মন খারাপ করা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বজন্মে কেউ শূকর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে, এজন্মে মানুষ হ'য়ে ভূমিষ্ঠ হবার পরে আর তার জন্য লজ্জিত বা দুঃখিত হওয়ার কোনো মানে হয় না। বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকেও পূর্ব্বজন্মের সামিল জ্ঞান ক'রে একেবারে ভুলে যাবে। নিজেও ভুলবে, স্ত্রীকেও ভোলাবে। অতীতের বিচার-বিবেচনায় যারা বেশী শক্তি

ক্ষয় করে, তাদের ভবিষ্যৎ গড়া অসম্ভব হয়। বর্ত্তমানে বিবাহ ভবিষ্যতের পূর্ণ জীবনের জন্য। এই কথাটাই দুজনে শতবার উপলব্ধিতে আন। স্ত্রীকে নবজীবনের উচ্চাদর্শ দেখাও এবং তাকে তার অবাঞ্ছিত অতীত ভুলতে সাহায্য কর।

অবাঞ্ছিত অতীত ভুলাইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোকেরা অবাঞ্ছিত অতীত অতি সহজে ভুলতে পারে, যদি স্বামীর কাছে অকপট স্নেহ পায়, সরল বিশ্বাস পায়, প্রাণভরা ক্ষমা পায়। স্ত্রীলোকেরা অবাঞ্ছিত অতীত অতি সহজে ভুলতে পারে, যদি তার জঠরে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান আসে স্বামীর স্নেহ-কোমল সদয় সহৃদয়তার ভিতর দিয়ে, স্বামীর ভবিষ্যতে আস্থাশীল লোক-কল্যাণী উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়ে। কোনো মেয়ে যখন বুঝতে পারে যে, ভবিষ্যৎ জগতের কোনও এক ত্রিলোকপূজ্য মহিমাবিশাল মহাপুরুষকে তার গর্ভে আহিত কর্ব্বার জন্যই স্বামীর আপ্রাণ যত্ন, সে তখন তার অতীতকে বিস্মৃত না হ'য়ে পারে না। সুতরাং বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হ'য়ে তুমি তোমার নববিবাহিত জীবনকে স্বাভাবিক ও সুস্থ মনে গ্রহণ কর।

কলিকাতা

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীটে জনৈক ভক্তের গৃহে আসিয়াছেন।

মানব-জীবনের কর্ত্তব্য

একটী জিজ্ঞাসু যুবক প্রশ্ন করিল,—আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কি বাবামণি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার সর্ব্বস্ব ভগবানকে দাও, তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার পরমায়ু, তোমার কর্ম্মশক্তি, মননশক্তি, বুদ্ধিশক্তি অথবা এক কথায় তোমার বল্‌তে বাইরে ভিতরে যেখানে যা-কিছু আছে, সব ভগবানের জন্য নিয়োগ কর। মানব জীবনের এইটিই একমাত্র কর্ত্তব্য। আহারীয় গ্রহণ কর, ভগবানেরই জন্য, শরীরচালন কর, ভগবানেরই জন্য, স্বাস্থ্যরক্ষা কর, ভগবানেরই জন্য। ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্য ব্যতীত একটী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও ত্যাগ ক'রো না। এইটিই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

স্ত্রীর ভিতরে পরিবর্ত্তন-সূচনার উপায়

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে ফিরিয়া আসিয়াছেন. মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও এক পল্লীনিবাসী জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিলেন,—বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে এতকাল একভাবে কাটিয়ে এসেছি। সেই ভাব বদ্‌লাবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৌষমাসের শেষে বড়দিনের বন্ধে দেশে যাচ্ছ ত' ? সুতরাং আড়াই মাস সময় এখন তোমার হাতে আছে। এই আড়াইটা মাস সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার কর। সপ্তাহে দু'খানা ক'রে চিঠি তোমার স্ত্রীকে লিখ্‌তে থাক। প্রত্যেক চিঠিতে দুটী জিনিষ থাক্‌বে—একটি হচ্ছে এক অভ্রান্ত জীবনের প্রতি

আহ্বান, অপরটী হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ যে নষ্ট হবে না, তার অভয়। প্রত্যহ গভীর অভিনিবেশে উপাসনা কর্ম্মে এবং উপাসনার শেষে ব'সে ভগবৎ প্রসাদে যে সব সৎকথা মনে জাগে, তা' সরল ভাষায় তোমার স্ত্রীর কাছে পরিবেশন কত্তে থাকবে। আমি সুনিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি, তুমি বড়দিনের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়ে তোমার স্ত্রীর ভিতরে প্রত্যাশার অতীত বহু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবে।

জীবনের প্রথম ভুল

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —জীবনের প্রথম ভুলটী সম্পর্কে সর্ব্বদা অতিশয় সচেতন থাক্‌বে। অর্থাৎ প্রথম ভুলটীই তুমি যেন কদাচিৎ অনুষ্ঠান কত্তে না প্রলুব্ধ হও। ছোট একটী ভুল, তেমন বিশেষ-কিছু নয়, ক'রে ফেল্লে আর কি হবে, এ নিয়ে অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়, —এসব কথায় মনকে কদাচ বুঝ দিতে যেও না। একটী ভুল দশটী ভুলের জনক হয়। একটী মিথ্যা দশটী মিথ্যার সৃষ্টি করে। একটী কপটতা দশটী কপট ব্যবহারের জন্ম দেয়. একটী পাপ দশটী পাপকে ঝাড়ে বংশে বাড়িয়ে তোলে।

তিলক বাবার কাহিনী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে শোন এক গল্প। তিলক বাবা নামে এক সাধু ছিলেন, মহাজ্ঞানী এবং পরমধার্ম্মিক। লোকে বিপদে আপদে পড়লে তাঁর কাছে আসে আর পাপের মুক্তি

প্রার্থনা করে। পাপ থেকে তাপ আসে। পাপ থেকে ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুঃখ আসে। দুর্গতি ও দুর্দ্দশার মূল পাপ। লোকে তিলক বাবার সঙ্গ করে আর নিজ নিজ পাপের মুক্তি চায়। তিনি কিছুক্ষণ ধ্যানগম্ভীর অবস্থায় থেকে তারপরে আদেশ-বাণী উচ্চারণ করেন, ''যা রে পাপ কেটে।'' লোকেরা অনুভব করে যেন জীবনের উপর থেকে এক পাষাণ-ভার নেবে গেল। বহু দিন বহু বৎসর এ ভাবে কেটে যায়, একদিন তিলক বাবার মনে হ'ল লোকেরা বারবার এত পাপ করে কেন? এক একবার এসে ঠাকুর-দেবতার পূজায় ঘটা ক'রে খরচ ক'রে পাপের মুক্তি যেচে নেয়, ক'দিন পরে আবার একটা পাপ কুড়িয়ে ঘুরে আসে। তাদের পাপ করার আর বিরাম নেই। ব্যাপারখানা কি? একজনকে জিজ্ঞাসা কর্লেন,—বাবা হে, তোমার জীবনের প্রথম পাপটী কি, আমাকে খুলে বলবে? সে বল্লে,—আজ্ঞে, প্রথম ত' আমি কোনো পাপেরই অনুষ্ঠান করি নি। সম্প্রতি যা-কিছু করেছি। তা' ত' নিজের ইচ্ছায় করিনি প্রভু, অন্য লোকেরা জোর ক'রে আমাকে দিয়ে এসব কাজ করিয়েছে। তিলক বাবা বুঝতে পারলেন যে, এই লোকটি সত্য কথা বলবে না। তখন তিনি আর একজনকে ঐ একই প্রশ্ন কর্লেন,—বলতে পার, জীবনের প্রথম পাপটী কি ক'রেছিলে, কেন করেছিলে? সে ব্যক্তি জবাব দিল,—আজ্ঞে প্রথম পাপ আর কি করব, এই ধরুন, আজকাল যা হয়, দু-একটা কচ্ছি কর্ত্তা। নইলে পাপ করতে কি কারো ভালো লাগে? অন্যদের দেখা-দেখি দু-চারটা করতে হয় আর কি! তবু, পাপের ত' একটা

সাজা আছে। সেই ভয়েই বারংবার আপনার চরণতলে এসে পড়ি। তিলক বাবা বুঝতে পার্লেন, এ লোকটীও সত্য কথা বলবে না; অথবা এমনও হ'তে পারে যে, গোড়ার কথা এর কিছুই মনে নেই।

একদিন হঠাৎ তিলক বাবার মনে হ'ল,—আচ্ছা, কোনও প্রকারে জেলখানাতে একবার ঢুকতে পারলে হয় না? এখানে এরা সব সমাজের মধ্যে বাস করে, তাই নিজের গোপন কথা প্রকাশ ক'রে বলতে চায় না। জেলখানায় কারো কোনো সমাজ নেই, আর কে কত মাস বা কত বছর জেল খাটবে, নির্দ্ধারিত হ'য়েই আছে। সুতরাং সেখানে মুখ ফুটে কথা বলতে কারো কোনো সঙ্কোচ নেই। চলা যাক একবার জেলখানায়। কিন্তু কি ক'রে যাবেন? একদল চোর-ডাকাত রীতিমত সাধু সেজে এক নকল আশ্রমে ব'সে ব'সে গাঁজা উড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে ব্যোম্ ভোলানাথ ব'লে চীৎকার কচ্ছে। তিলক বাবা তাদের কাছে গিয়ে বসলেন। তারা একজন আড়চোখে তাকিয়ে দেখে জিজ্ঞেস কর্লে,—তোম্ কৌন হ্যায়? তিলক বাবা চোরের মত চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে তার কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে বর্ল্লেন,—কিসিকো মৎ কহনা, হাম্ চৌর হ্যায়। চোরের দলে উল্লাস লেগে গেল। আরে, বৈঠিয়ে মহারাজ, বিরাজিয়ে মহারাজ, পীজিয়ে মহারাজ—পরম আপ্যায়ন শুরু হ'য়ে গেল। একদিন পুলিশের লোকেরা সবগুলি চোরকে গ্রেফতার করল। তিলক বাবাও ধরা পড়লেন এবং সকলের সঙ্গে তারও বিরুদ্ধে মামলা হ'ল। দোষ তিনি কিছু করেন নি কিন্তু জেল হ'ল।

জেলের ভিতর গিয়ে তিনি একটী একটী ক'রে পুরোনো কয়েদীদের অন্তরঙ্গ হ'তে লাগলেন। দেখ্‌লেন, যে লোকটা নারী-ধর্ষণের জন্য সাত বছর ধ'রে জেল খাট্‌ছে, তার জীবনের প্রথম অপরাধ একটী ছোট্ট মেয়ের গুপ্ত অঙ্গ দেখ্‌বার কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই নয়। দেখ্‌লেন, নরহত্যার জন্য যার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে, তার প্রথম অপরাধটী একটী পোষা খরগোশকে নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার ক'রে মারা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেখ্‌লেন, একজন গরু-জবাই আর পাঁঠাবলি দেখ্‌তে তরুণ বয়সেতে বড় আনন্দ পেত, তার সেই আনন্দই তাকে একজন পেশাদার হত্যারুতে পরিণত করেছে। দেখ্‌লেন, লক্ষ টাকার মাল চুরি ক'রে যে দীর্ঘ মেয়াদের জেল খাট্‌ছে, তার প্রথম অপরাধটী হচ্ছে একজন সমপাঠীর একটী পেন্‌সিল চুরি করা। তিনি বুঝলেন, এই প্রথম অপরাধটী যদি কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারত, তবে তার জীবনে পর পর অতীব গুরুতর শত শত অপরাধ প্রবেশই কর্ত্তে পাত্ত না।

কিন্তু বড় দেরীতে বুঝলেন। কিছু দিন জেল খাটার পরে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তখন দেখেন, তিনিও তার জীবনের প্রথম অপরাধের শাস্তি ভুগতে শুরু করেছেন। তিনি কৌতূহলের বশে চোরের সঙ্গ করেছিলেন, এই সঙ্গের অসদ্‌গুণ তাঁর চরিত্রের ভিত্তি দুর্ব্বল করেছে। আর তিনি পূর্ব্বের মত নিষ্কাম, নির্লোভ, নির্দ্বন্দ্ব মহাপুরুষ থাকতে পাচ্ছেন না। তাঁর মনে ছয় রিপুর ছয়টা বৈঠকখানা তৈরী হ'য়ে গিয়েছে। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে ছয়টা শক্ত পাথরের সিংহাসনে ব'সে ছয়টা রিপু দিব্যি গড়গড়ার

নলে নিশ্চিন্তে নির্ব্বিবাদে ধূমপান কচ্ছে। অন্য লোকের জীবনের প্রথম অপরাধটী যে কি, তা জান্‌বার আগ্রহে তিনি নিজের আসল পথ থেকে নিজের অজ্ঞাতসারে স'রে গিয়েছেন। এখন তাঁকে তাঁর আগের জায়গায় ফিরে আস্‌তে অনেক তপস্যা কর্ত্তে হবে। তিনি কাঁদতে বস্‌লেন। বল্‌তে লাগলেন—ফিরে আমি আবার তপস্যায় বস্‌ব, কিন্তু হে জগদীশ্বর, পরমায়ুতে বেড় পাব ত?

পাপের মহৎ আবরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাপ ক'রে পাপকে মহৎ আবরণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করা আর একটী পাপ। শুধু পাপ বল্‌ব কেন, মহাপাপ। তুমি রাগ করেছ, বল্লে, এটা আমার তেজ। তুমি লোভ করেছ, বল্লে, এটা আমার উন্নতির লিপ্সা। তুমি নারীর লজ্জাশীলতার হানি ঘটিয়েছ, বল্লে, এটা আমার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। তুমি ব্যভিচার করেছ, বল্লে, এটা আমার লীলা। এর মতন পাপ আর কিছু নেই। কাম-ক্রোধ-লোভাদির প্রত্যেকের একটী সদ্ব্যবহার আছে। কিন্তু তুমি যখন রিপুর বশীভূত হ'য়ে এদের চর্চ্চা কর, তখন ত' তুমি অতিশয় হীনপথে চলছ। তাকে আবার মহত্ত্ব ব'লে ব্যাখ্যা করা কেন? তুমি পাপ কচ্ছ অথচ লোকের চোখে মহৎ থাকবার জন্য পাপকে দিব্যলীলা ব'লে জাহির কচ্ছ, এ বড়ই কুৎসিত অনাচার। পাপ ক'রে পাপকে পাপ ব'লেই স্বীকার করা উচিত, পুণ্য বা ধর্ম্ম বা যোগ-তপস্যা বা ঐশ্বরিক লীলা প্রভৃতি ব'লে মায়াজাল সৃষ্টি করা উচিত নয়। গুরুতর অন্যায় ক'রে তোমার জেল হ'ল আর শিষ্যদের

তুমি ব'লে বেড়ালে, ওরে বড় বেশী লোকসম্মান হয়েছিল, কিছুতেই কমান যাচ্ছিল না, তাই একটু অসৎ-কাজ ক'রে যশটা কমিয়ে নিলাম। এই জাতীয় ভাণে মুগ্ধ হওয়াও কারো উচিত নয়। পশুর মত আচরণ ক'রে একজন দেবতার মতন পূজা পাবে তার ঐ পশুত্বের চিত্তচমৎকারী ব্যাখ্যার শক্তিতে, এ এক অতীব কদর্য্য ব্যাপার। যে সমাজে এরূপ ব্যাপার ঘটতে দেওয়া হয়, সে সমাজ খুব নিম্নস্তরে রয়েছে ব'লে জানবে।

মহাপাপীরও উদ্ধার আছে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে হ্যাঁ, জীবনে ভুল ক'রেছ ব'লেই নিজেকে চিরকালের মত খরচের খাতায় লিখে ফেল না। জগতের কত পাপী, কত অপরাধী, কত দুশ্চরিত্র অসৎ লোক হঠাৎ একদিন সঙ্কল্পের মহাশক্তি সংগ্রহ ক'রে চ'খের এক পলকে দীর্ঘকালের রিপুর দাসত্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে তপঃসাধনায় ব্রতী হয়েছে, সফল সিদ্ধকাম হয়েছে, মানুষের জীবনের প্রকৃত মূল্যকে জগতের কাছে সগৌরবে তু'লে ধরেছে। এ সব দৃষ্টান্ত বিরল কিন্তু অলভ্য নয়। এই সকল সদ্দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ কর। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে নিজেদের যাত্রাপথ সুগম কর।

সাধু-নামধারীদের কুকার্য্য

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—অনেক সাধু-সন্ত-নামধারী ব্যক্তিদের বহু কুকার্য্য কত্তে দেখা যায়। এমনকি সমাজ-বিরোধী দুর্নীতি-মূলক কাজেও লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এদের সম্পর্কে

আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্যায় সকল সময়েই অন্যায়, সাধু-নামধারীই কেউ তা' করুন, আর গৃহস্থ নামধারীই তা' করুন। অন্যায়কে, পাপকে, দুর্নীতিকে কোনও অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তবে, পরের চরিত্র পাহারা দিতে গিয়ে নিজে আবার দুর্নীতির পথে চ'লে না যাও, তা' দেখতে হবে। লোকের নামে যত কুকথা রটে, সবই সত্য হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। আবার, ভুলভ্রান্তি সকলেই করতে পারে। রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে মানুষ যখনি কেউ অহংকার কর্ল্লে যে, সে অপাপবিদ্ধ, হয়ত তখনই তার পতন সুরু হ'য়ে গিয়েছে। কারো পতন যদি সমাজের পক্ষে হিতকর হয়, তবে সমগ্র সমাজের কর্ত্তব্য তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হওয়া। কিন্তু পরের দোষ সংশোধন কত্তে গিয়ে নিজে আবার দোষী না হও, এই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আস্তিক ও নাস্তিক

অপর একজনে প্রশ্ন করিলেন,—নাস্তিক কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাস্তিক বলতে আগে বুঝাত তাকে, যে বেদ মানে না, পরলোক মানে না, ঈশ্বর মানে না। আজকাল নাস্তিক বলতে বুঝায় তাকে, যে আর কিছু মানুক, আর না মানুক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার কত্তে রাজি নয়।

আস্তিক্যই স্বাভাবিক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে, তুমি যদি নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, তা' হ'লেই তুমি আস্তিক। ঈশ্বর বলতে

তুমি নিজেকেই বোঝ আর অন্য এক অদৃশ্য শক্তিই বোঝ, নিজেকে মান্‌লেই তুমি সব মান্‌লে। এই কারণে আস্তিক্যই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

লোকেরা নাস্তিক হয় কেন

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—তবে লোকেরা নাস্তিক হয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক এক জনের নাস্তিক হবার কারণ এক এক রকম। পরমেশ্বরকে আমরা করুণাময় ব'লে বর্ণনা করি, অথচ জগতে কত দুঃখ, কত ক্লেশ,—এই সব দেখে একদল লোক নাস্তিক হ'য়ে পড়েন। ঈশ্বরাস্তিত্ব-বাদকে সম্বল ক'রে একদল লোক দুনিয়া জুড়ে দারুণ ভাবে ধর্ম্মের ব্যবসায় ক'রে যাচ্ছে এবং লোক ঠকাচ্ছে,—এ সব দেখে অনেকে নাস্তিক হন। যুক্তি, তর্ক, বিচার এবং আলোচনা দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সিদ্ধ কর্ত্তে না পেরে কেউ কেউ নাস্তিক হন। দুরন্ত পাপানুষ্ঠান ক'রে পাপী যখন নিজের কাছে মনে মনে লজ্জিত হয় বা পাপের ফলভোগ কর্ত্তে হবে ব'লে আতঙ্কিত হয়, তখন সে তার লজ্জা বা আতঙ্ককে চাপা দেবার জন্য হঠাৎ নিদারুণ নাস্তিক হ'য়ে পড়ে। সে বলে, "না, না, না; ঈশ্বর নেই, আমার একাজ স্বাভাবিক কাজ, যা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গেরা অবিরাম প্রকৃতিবশে ক'রে যাচ্ছে। তাদের এতে অপরাধ হচ্ছে না ত' আমার বেলাই অপরাধ হ'তে যাবে? না, না, আমি কোনো অপরাধ করি নি। আমাকে শাস্তি দেবারও কেউ নেই। তোমরা যাকে ঈশ্বর বল, সে ত' একটা নিতান্ত কিম্ভূত কিমাকার অবিশ্বাস্য ব্যাপার মাত্র।"—এ ভাবেও লোকে নাস্তিক হয়।

ঈশ্বর বিশ্বাসেই শান্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে যেই কারণেই নাস্তিক হ'য়ে থাকুক না কেন, তার নিজ মতে প্রতিষ্ঠিত থাকার অধিকার তার আছে। অতএব, কেউ নাস্তিক হয়েছে ব'লে তার সঙ্গে কলহ কর্ত্তে যেও না। তাকে তার নিজ মতে নিজ পথে থাক্‌তে দাও। যতক্ষণ তার দ্বারা সমাজের সন্নীতি সদাচার আহত না হচ্ছে, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে তোমার কিছুমাত্র করার অধিকার নেই। নাস্তিক যদি জনকল্যাণকারী হয়, তবে তার আধ্যাত্মিক মতবাদের সঙ্গে তোমার আমার মিল নেই ব'লেই সে আমাদের শত্রু নয়। তবে ঈশ্বর-বিশ্বাস এক পরমশান্তির আধার, এক অতুল স্নিগ্ধ আশ্রয়। এ আশ্রয় যে পায়, সে শান্তিও পায়, শক্তিও পায়। তাই, জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণে ঈশ্বর-বিশ্বাস আসুক, এটা আমরা যেন নিয়ত মনে-প্রাণে কামনা করি।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সত্যিকারের ঈশ্বর-বিশ্বাস এলে মানুষের এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে। সে আগেকার সাধারণ মানুষটী থাকে না। বিপদে তার ধৈর্য্য হয় অসীম। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়ও নিজেকে সে অনাথ আতুর ব'লে মনে করে না, দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশাকে যুদ্ধ দিয়ে জয় ক'রে নেবার তার

পৌরুষ জাগে, সর্ব্বজীবের প্রতি তার প্রেমভাব, মমত্ব ও সেবাবুদ্ধি জাগে, কর্ত্তব্যপালনে সে নির্ভীক হয়। আমরা অধিকাংশেই নামে মাত্র ঈশ্বরবিশ্বাসী, সত্যিকারের ঈশ্বরবিশ্বাসী নই। এই জন্যই আমাদের চরিত্রে এ সকল সুলক্ষণ ফুটে ওঠে না। অবিরাম প্রার্থনা কর, হে পরমেশ্বর, আমাকে বিশ্বাস দাও, হে পরমেশ্বর, আমার সেই বিশ্বাস যেন খাঁটি জিনিষ হয়, সেই বিশ্বাস যেন অনন্তকাল অক্ষয় অমর হ'য়ে আমার দেহে, মনে, আত্মায় বিরাজ করে।

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি বহু-সংখ্যক পত্র লিখিলেন।

সার্থকতার অর্থ

যশোহর কেশবপুর-নিবাসিনী জনৈকা মহিলাকে লিখিলেন,—

"ভয়-ডর পরিত্যাগ কর। যে উপদেশাবলি মাসের পর মাস তোমাকে দিয়া যাইতেছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন কর। এই জীবনে যদি তোমার অত্যুচ্চ উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফলতা নাও পায়, ভাবী জন্মে যে তাহা সফল হইবেই, এই প্রত্যয় নিয়া কাজ কর। দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ শুচি, শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখিবে। মনের প্রত্যেকটী তরঙ্গ স্নিগ্ধ, সুন্দর, সংযত রাখিবে। ইচ্ছার প্রতিটি ভঙ্গীকে নিয়ত ঈশ্বরানুগত রাখিবে।"

শক্তিমানের পরিচয়-পত্র

চট্টগ্রাম-নিবাসী একটি যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারকে ফাঁকি দিয়া, সংসারের কর্ত্তব্য-সমূহের জটিলতা দর্শনে কাপুরুষের ন্যায় পলায়নপর হইয়া ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় করিয়া জীবনে কোনও মূল্যবান্ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবে না। সংসারে মিথ্যা আছে, ছল আছে, চাতুরী আছে, কত গূঢ় গুপ্ত ষড়যন্ত্র আছে, তাহার মধ্যে নির্ভীক-চরণে দাঁড়াইতে হইবে, সকল বিঘ্ন পদতলে চাপিয়া রাখিয়া নিজের পথ নিজের বাহুবলে প্রশস্ত করিতে হইবে। অভিজ্ঞাই শক্তিমানের পরিচয়-পত্র। আমি আমার ধ্যানের জগতে কাপুরুষের মূর্ত্তিকে কোনও প্রবেশাধিকার দেই নাই। আমি আমার দর্শন-শাস্ত্রে ভয়-ভীতি-দুর্ব্বলতার সহিত কোনও আপোষ রাখি নাই।"

জীবনের লক্ষ্য

ময়মনসিংহ গফরগাঁও-নিবাসী অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা কিছু কঠিন কথা নহে। তুমি নামের সেবা কর। অনুক্ষণ তাঁহার নামে লাগিয়া থাক। নাম-সাধনের আশ্চর্য্য শক্তিকে সাধনা করিয়া প্রত্যক্ষ কর। নামে যার নিষ্ঠা আছে, সে ঠিক্ স্থানে আসিয়া যাইবেই। প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি প্রশ্বাসে নাম কর। নিজেকে অক্ষম, অধম, পঙ্গু ভাবিয়া সহজলভ্য পরম সম্পদ হইতে আত্মবঞ্চিত থাকিও না। আত্মবঞ্চনা-কারীরাই পরকে প্রবঞ্চিত করিতে প্রলুব্ধ হয়। জগৎ যে আজ ভণ্ড, প্রতারক, প্রবঞ্চককে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মানুষ নিজের সাধ্য সম্পদ এবং সৌভাগ্য

নিজের শ্রমে অর্জ্জন করিতে চাহে না। নাম কর, প্রেম আসিবে। নাম কর, বল আসিবে। নাম কর, বিশ্বাস আসিবে। নাম কর, লক্ষ্য চিনিবে।"

সকল পরকে আপন কর

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত প্রোম-নিবাসী জনৈক বাঙ্গালী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পৃথিবীর সমস্ত দেশ পর্য্যটন কর আর সকল পরকে আপন কর। জগতে পর কেহ থাকিবে না, এই ব্রত ধারণ কর। এইটী আপন, ঐটী পর, এই বোধকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। ভেদবুদ্ধিবিমর্দ্দনের মন্ত্র আমি তোমাদিগকে দিয়াছি। তোমরা সেই মন্ত্রের সাধন করিয়া নিজেদের মধ্যে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি সৃষ্টি কর। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তোমরা আপন করিবে, ইহাই তোমাদের পণ হউক। সকলকে আপন করিবার লক্ষ্যে জীবন-পরিচালন কর। প্রত্যেকটী চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম বিশ্বের শুভকামনায় উপজাত হউক। সকল পরকে আপন করিয়া, আপনাকে আপনতর করিয়া, দূরকে নিকট করিয়া, নিকটকে নিকটতর করিয়া নির্ভয়ে কর্ম্মপথে অগ্রসর হও। জীবন ছেলেখেলা নহে, মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন আত্মোৎসর্গের। আত্মসুখকামনাকে যে বলি দিতে পারিবে, সে জগতের শ্রেষ্ঠ সেবা করিবে। দুর্গম গিরি লঙ্ঘন কর, দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হও, দুঃসহ মরুভূমির বিভীষিকাকে জয় কর, জগতের যত অসাধ্য সব কিছু সাধন কর। লক্ষ্য মাত্র একটী, সকল পরকে আপন

করিতে হইবে। শান্তি-ভয়, মৃত্যুভয়, —সব ভয় তোমাদের জয় করিতে হইবে। বিশ্বকে আপন করিবার যাহারা সাধক, তাহাদিগকে আর কেহ জয় করিতে পারিবে না। দিগ্বিজয়ের উল্লাস লইয়া প্রতিটী কার্য্য কর। নানা দেশে নানা ভাষা, নানা আচার নানা বিচার, নানা রীতি, নানা নীতি কিন্তু সবকিছুর মাঝে একটী অত্যদ্ভুত একত্ব রহিয়াছে, তাহা এই যে, প্রত্যেকে আমাদের আপন। যাহাদের যতটুকু সহিবার, তাহা সহিয়া লইয়া তাহাকে আপন কর, যাহার যতটুকু সংশোধনীয়, তাহা সংশোধন করিয়া লইয়া তাহাকে আপন কর। বর্জ্জনের নীতি নীতিই নহে, উহা আপদ্ধর্ম্ম মাত্র। আপদ্ধর্ম্মকে কদাচ সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করিও না।"

কলিকাতা
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি বহু পত্রাদি লিখিলেন।

আদর্শ রমণী

কাঁথি (মেদিনীপুর)-নিবাসিনী একটী মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে ভাবে গড়িয়া তুলিলে সমগ্র জগৎ তোমাকে সুন্দরের প্রতিমা বলিয়া শ্রদ্ধাবনত-শিরে পূজা করিবে, আমি তেমনি ভাবে তোমাকে গঠিত দেখিতে চাই। কর্ত্তব্যের নিষ্ঠা, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, সঙ্কল্পের স্থিরতা, ভোগে নিঃস্পৃহতা, বিলাসে অনাসক্তি, জীবসেবায় আত্মোৎসর্গ এই সকল সুদুর্ল্লভ মণিরত্নেই আমি

তোমার জীবনকে সুসজ্জিত দেখিতে চাহি।"

কর্ম্ম-পরিত্যাগ প্রশংস্য নহে

দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাসপাতালের জনৈক চিকিৎসকের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও মনুষ্য-জীবনটীকে সত্য সার্থকতা দান করিতে হইবে। এই সার্থকতার পথ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। কর্ম্মপরিত্যাগে নহে, কর্ম্মের মধ্যে দিয়াই অবিরল পরমেশ্বরানুধ্যান।"

দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাসপাতালের অপর একজন ডাক্তারের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সহস্র মিথ্যা জীবনকে যখন ঘিরিয়া ফেলিতে চাহে, একান্ত চিত্তে ঈশ্বর-চিন্তা তখন সত্যের দুয়ার অর্গল-মুক্ত করে। জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে পরমাত্মার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি থাকিও এবং তাঁরই অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত বুঝিয়া জীবনযাত্রার ভঙ্গী-নির্ব্বাচন করিও। কর্ম্মবর্জ্জনে নহে, অফুরন্ত কর্ম্ম-কোলাহলের মাঝখানেও শান্তিময়ের ক্রোড়ানুসন্ধানেরই নাম যথার্থ সাধন।"

সাধনহীনতাই লক্ষ্যহীনতার কারণ

কালীঘাট-(কলিকাতা)-বাস্তব্য জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে কেন পারিতেছ না, জান বাবা? ইহার কারণ এই যে, নামে নিষ্ঠা হারাইয়াছ। সমগ্র

মনপ্রাণ দিয়া নিশ্বাসে প্রশ্বাসে নামের সেবা করিয়া যাও। নামই তোমার লক্ষ্যহীন মনের নিকটে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে দেদীপ্যমান জ্যোতিতে তুলিয়া ধরিবে। সাধনহীন জীবনই লক্ষ্যহীনতার সহস্র সন্তাপে বিদগ্ধ হয়। সাধন কর, ভগবৎ-কৃপায় যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছ, তাহার সদ্ব্যবহার কর। পাত্র পূর্ণ করিয়া অমৃতরাশি তোমার ওষ্ঠপ্রান্তে ধরা হইয়াছে, পান করিবার দায়িত্ব তোমার।"

স্ত্রীকে ভয় করা অকারণ

অপরাহ্নে মেদিনীপুর জেলা-নিবাসী জনৈক বিবাহিত যুবক উপদেশার্থী হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তোর স্ত্রীকে তোর ভয় করে?

যুবক।—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —আমার মনে হয় সে বেশ বাধ্য মেয়ে?

যুবক। —আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তা'হলে ত' তোমার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। বাধ্য মেয়েদের সহজে সৎপথাশ্রিত করা যায়। Make it a point never to order her to associate you in anything dishonourable (স্থির সঙ্কল্প ক'রে নাও যে, তাঁকে কখনও মর্য্যাদা নাশক কোনও কাজে তোমার সাথে সহযোগ করতে আদেশ দেবে না।) এই একটী বিষয়ে তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা চাই। অনুচিত বা অসঙ্গত, পাশবিক বা নীচ কোনো

কাজে তাকে কখনো সঙ্গিনী হবার জন্য ডাকবে না, এই একটী মাত্র নিয়ম পালন ক'রে চল। যখনি এর পরে তার সাথে তোমার দেখা হবে, tell her of a supreme aim of life (তাকে জীবনের অভ্যুন্নত এক লক্ষ্যের কথা বলবে।) তার হৃদয়ের পাষাণ-প্রাকার ভেঙ্গে ভিতর থেকে সাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রস্রবণকে উৎসারিত কর। And that will prepare her for the future (তারই ফলে সে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হ'য়ে যাবে।) স্ত্রীকে ভয় করা অকারণ। তোমার পত্র, তোমার বাক্য, তোমার ব্যবহার মাত্র দুটী বছরের জন্য যদি এরকম হয়, যাতে তোমার প্রতি তার শ্রদ্ধাও বাড়ে, প্রীতিও বাড়ে, তাহ'লে, দুবছর পরে দেখবে যে, মহাবিপদের সময়ে সে তোমাকে রক্ষা ক'রে যাচ্ছে।

স্ত্রীদের শক্তি অসীম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —স্ত্রীদের যে শক্তি কত, সে কথা স্বামীরা জানে না। জানলে আর তাদের কেউ 'অবলা' নাম দিত না। গায়ের জোরে স্ত্রীকে পদানত করার শক্তি পুরুষের বেশী, কিন্তু মনের জোরে কামকে পদানত করার শক্তি স্ত্রীলোকের বেশী। যে স্ত্রী কুমারী অবস্থায় মোটামুটি সৎশিক্ষা পেয়েছে এবং বিবাহের পরে অন্ততঃ দুটা বৎসর স্বামীর কাছ থেকে সৎচিন্তা, সংযম-পোষক ব্যবহার ও অকপট স্নেহ পেয়েছে, তার আত্মদমনের শক্তি দেখলে চমৎকৃত না হ'য়ে পারবে না।

ভাগ্যকুল (ঢাকা)
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অদ্য বেলা ১১টায় শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা হইতে ভাগ্যকুল শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে পৌছিয়াছেন। অপরাহ্নে স্থানীয় যুবকদের একটী সভায় যৌগীক আসন-মুদ্রাদি প্রদর্শনান্তর শ্রীশ্রীবাবামণি একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভবিষ্যতের পানে তাকাও এবং সুমহৎ, সুবিশাল, উজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের জীবনকে প্রস্তুত কর। শুধু ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন দেখলেই চলবে না, সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত কত্তে হবে। তার জন্য চাই, মৃত্যুঞ্জয় সাহস, অনুপম ধৈর্য্য, অতুলন নিষ্ঠা, অপরাজেয় পুরুষকার এবং আস্ফালন-বর্জ্জিত সাধনা। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা ক'রো না, বর্ত্তমানের একটী কর্ত্তব্যকেও অসম্পূর্ণ রেখো না, বর্ত্তমানের কোনো ব্রত যেন অনুদ্‌যাপিত না থাকে। কিন্তু তোমার সকল সিদ্ধি, তোমার সকল প্রাপ্তি, তোমার সকল পূর্ণতা, তোমার সকল চরিতার্থতা ভবিষ্যতের বিশাল জঠরেই যে ভ্রূণাবস্থায় রয়েছে, এই কথা বিশ্বাস কর। বর্ত্তমানকে যতখানি কাজে লাগাবে, ভবিষ্যৎ ততখানিই সত্য হ'য়ে ফুটে উঠবে। অতীতের সোপান-শ্রেণীতে পাদচারণা ক'রে যেমন ভাবে বর্ত্তমানের আবির্ভাব ঘটেছে, বর্ত্তমানের সোপান-শ্রেণীতে পাদচারণা ক'রেই তেমন ভাবে ভবিষ্যতের আবির্ভাব হবে। কিন্তু অতীত তোমার

করায়ত্ত নয়, বর্ত্তমান তোমার আয়ত্তেরই ভিতর। সুতরাং যদি আপ্রাণ সাধনে প্রবৃত্ত থাক, তাহ'লে ভবিষ্যৎও তোমার আয়ত্তেরই ভিতরে এসে যাবে।

ভাগ্যকুল (ঢাকা)
১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য প্রাতঃকালে বসিয়া কতকগুলি পত্র লিখিলেন।

যোগ-সাধন ও সংসারী ব্যক্তি

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরমাত্মার সাথে নিজেকে নিয়ত যুক্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টারই নাম যোগ-সাধন। এই যোগ-সাধন জীবকে দুঃখ-দ্বন্দ্বের অতীত করে, সর্ব্বংসহ করে। এই জন্যই সহস্র ধীমান্ ব্যক্তি নিজেদিগকে ভগবানের নামে বিকাইয়া দিয়াছেন। বলিতে পার, সংসারী মানব তাহা পারে না। আমি বলিব, নিশ্চয়ই পারে এবং ভাগ্যবান্ সংসারীরা তাহা করিয়াছেনও।"

উৎকৃষ্ট যন্ত্র হও

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মানুষ শ্রীভগবানের করধৃত যন্ত্র। উৎকৃষ্ট যন্ত্র দ্বারা তিনি উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করেন। যন্ত্র দৃঢ় হইলে যান্ত্রিক তাহা

দ্বারা কঠিন কার্য্য সম্পাদন করেন। যন্ত্র দুর্ব্বল হইলে তাহা দ্বারা সাধারণ কার্য্যের অতিরিক্ত চেষ্টা তিনি করেন না। মানুষ ভগবানের হাতের যন্ত্র হইলেও আত্মোন্নতি-বিধানের স্বাধীনতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা সুগঠিত হইলে ভগবান্ আমাদের দ্বারা অনেক বিরাট্ বিরাট্ কর্ত্তব্য পালন করাইয়া লইবেন। যে নিজেকে যত সুন্দর করিয়া গড়িতে পারে, পরমাত্মা তাহাকে দিয়া তত উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লন। বিধাতার মহান্ অভিপ্রায়কে নিজ জীবন-মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য আজ হইতেই যোগ্যতা সঞ্চয়ে দৃঢ়ব্রত হও।"

সংসারে থাকিয়া সংসার জয়

দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাসপাতালের জনৈক ডাক্তারকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন, —

"পরমাত্মার কৃপা তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে অমোঘ হইয়া উঠুক এবং ইহা অমোঘ করিবার কৌশল হইতেছে, একাগ্র সাধনার দ্বারা চিত্তকে স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করা। যার চিত্তবৃত্তি যত শুদ্ধ, ভগবৎ কৃপা তার জীবনে তত সুপরিস্ফুট।

"সাংসারিক জীবনেই সহস্র কর্ত্তব্য সম্পাদনের সাথে সাথেই চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা-সম্পাদনের সাধনা পরিচালিত করিতে হইবে। বনে যাইয়া তপস্যার যুগ আর নাই, যদিও বনে যাইবার প্রয়োজন অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেকের আছে। তাই, নিজ মনের মধ্যেই বিজন বন সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে, —ইহাই সংসারে থাকিয়া সংসার-জয়ের কৌশল, ইহাই প্রতিদিন প্রকৃতি-সংসর্গে থাকিয়াও

প্রকৃতিজয়ী হইবার সরল পথ।"

সংসারে সহিষ্ণু হইবার উপায়

জনৈকা মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রশ্ন করিলেন,—সাংসারিক ঝগড়া-কলহে সহিষ্ণু হবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —প্রথম উপায়, একথা চিন্তা করা যে, ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া দুঃখ-অশান্তি আসে না। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটি গাছের পাতাও নড়ে না। সুতরাং যদি অপমান, অসম্মান, অপবাদ বা নিন্দা আমার বিরুদ্ধে এসেও থাকে, তবে ভগবানের অভিপ্রায়েই এসেছে। সুতরাং মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, নিজ সন্তান-সন্ততির নৈতিক কুশল চিন্তা করা। কারণে বা অকারণে তুমি যদি অসহিষ্ণু হও, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারাও, তবে তোমার সেই অবাঞ্ছনীয় আচরণ তোমার শিশুরাও অনুসরণ কর্ব্বে। তাতে তাদের জীবন-গঠনের, চরিত্রের সম্পূর্ণতা-সাধনের বিশেষ ক্ষতি হবে। সুতরাং নিঃশব্দে উৎপীড়ন সহ্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা ক'রে ক'রে মনকে তৈরী কর। মন অগঠিত ব'লেই তোমরা কলহে এত রুচি অনুভব কর।

ক্ষমার শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরও চিন্তা ক'রো ক্রোধের শক্তি ক্ষণস্থায়ী, ক্ষমার শক্তি চিরস্থায়ী। একটা লোক রাগারাগি আর কতক্ষণ কর্ত্তে পারে? কিছুক্ষণ পরেই তার রাগ থামে। কিন্তু

ক্ষমা ক'রে এক শতাব্দী থাকা যায়, তাতে ক্লান্তি আসে না। ক্রোধের পরিণাম মনস্তাপ, ক্ষমার পরিণাম আত্মপ্রসাদ। ক্রোধের ফল বায়ুরোগ, ক্ষমার ফল বায়ুসাম্য। সুতরাং আপাততঃ যতই ক্লেশে প'ড়ে থাক, ক্ষমাই তোমার অবলম্বনীয়। একথা সারাদিন সারারাত ভাব্‌বে। ক্ষমার মহিমা চিন্তা কর না ব'লেই সহজেই চটে যাও।

ভক্তরাজ অশ্বিনীকুমার

অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি ভাগ্যকুল হইতে জগন্নাথপট্টি গ্রামে আসিয়াছেন। মোছা-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শীল আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির পাদ-বন্দনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে কি কথা, আপনি আমার পিতামহের শিষ্য, সুতরাং তাঁর পুত্র আপনি আমাকে প্রণাম কর্ত্তে পারেন না।

অশ্বিনীবাবু সেকথা মানিলেন না। তিনি বারংবার ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্মে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—আমার গুরুদেবের সুদীর্ঘ জীবনের সমগ্র তপস্যা আপনার ভিতরে রূপপ্রাপ্ত হয়েছে, তাঁর সমগ্র সাধনার ফল নিয়ে আপনি তাঁর পৌত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, আপনাকে প্রণাম করা আর তাঁকে প্রণাম করা এক কথা।

শ্রীশ্রীবাবামণি যথোচিত সম্মানসহকারে ডাক্তার বাবুকে উপবেশিত করাইয়া সমাগত সকলকে তাঁহার পরিচয় দিতে

লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি তখন বালক, ডাক্তার বাবু চাঁদপুরে পুরাণবাজারে চিকিৎসা-ব্যবসায় কত্তেন। আমার পিতামহ পুণ্যশ্লোক হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালে চাঁদপুরে ওকালতি করেন। উকিল হ'লেও তিনি সত্য ব্যতীত মিথ্যার পক্ষাশ্রয়ে কোনো কাজ কত্তেন না এবং শ্রমসাধ্য ব্যবসায়ের মধ্যেও, দৈনিক প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার ক'রে নাম জপ কত্তেন। এরূপ সাত্ত্বিক লোক সেখানকার লোকে কখনো দেখেনি। একদিন ডাক্তারবাবু স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি আমার পিতামহের নিকট মন্ত্র গ্রহণ কচ্ছেন। পরদিন গিয়ে পিতামহের নিকটে ডাক্তারবাবু অনুরূপ প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু পিতামহ বল্লেন, —দেখ হে, আমি একে গৃহী, তাতে আইন-ব্যবসায়ী, আমার পক্ষে দীক্ষা-দান অবৈধ হবে। তুমি অন্যত্র গুরুর অন্বেষণ কর। ডাক্তারবাবু নত মুখে চ'লে গেলেন। একবছর পরে জানা গেল যে, ডাক্তারবাবু অন্নাহার ছেড়ে দিয়েছেন এবং সমগ্র দিনে কুমড়ার একটীমাত্র বীজের শাসটুকু খেয়ে জলপানে জীবনধারণ কচ্ছেন। একথা শুনে পিতামহ আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন এবং ডাক্তারবাবুকে নিজে ডেকে এনে দীক্ষা দিলেন। এমন আশ্চর্য্য জীবন এই ডাক্তারবাবুর। ইনিই আমার পিতামহের একমাত্র শিষ্য। তোমরা এঁকে প্রণাম কর।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জগন্নাথপট্টি গ্রামে ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবৎ-সাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতা প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া হইল।

প্রবৃত্তি দমন

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —অনেকের ধারণা, কুপ্রবৃত্তি দমন করা অসম্ভব। এ ধারণার কারণ হচ্ছে এই যে, চতুর্দ্দিকে যত লোককে তারা দেখতে পায়, তাদের গুপ্ত জীবন অনুসন্ধান করলে প্রায় ক্ষেত্রেই জানা যায় যে, তারা কোনো অতিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেছে। কেউ ক্রোধের অধীন হ'য়ে জননীর অঙ্গে পদাঘাত করেছে, কেহ কামের অধীন হ'য়ে নিরাশ্রয়া অবলার ধর্ম্মনাশ করেছে, কেউ মোহের অধীন হ'য়ে সাধ্বী পত্নীকে অনাদর ক'রে কুলত্যাগিনীর চরণসেবা কচ্ছে, কেউ লোভ-পরবশ হ'য়ে দরিদ্রের কষ্টার্জ্জিত অন্ন লুটে খাচ্ছে, কেউ ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে পূজ্য দরিদ্রকে অপমান কচ্ছে, কেউ বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে অল্পবিদ্য গুরুজনকে নীচ-জনোচিত ইতর ব্যবহারে ব্যথিত কচ্ছে, ইত্যাদি। এই সব ঔদর্য্য দৃষ্টান্ত দেখে দেখে তোমার আমার ধারণা জন্মেছে যে, রিপুকে দমন করা যায় না, কাম-ক্রোধকে বশে আনা অসম্ভব, মদ-মোহকে শাসন করা অসাধ্য। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার কাম-ক্রোধেরও সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই। তিনি তোমার ক্ষতি কর্ব্বার জন্য এ সবের সৃষ্টি করেন নি। তোমাকে তিনি হাতিয়ার রূপে এক একটী রিপু দিয়েছেন, যেন এদের প্রকৃষ্ট ব্যবহার ক'রে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় কার্য্য উদ্ধার কত্তে পার। কিন্তু তা না ক'রে তুমি এই হাতিয়ার

ব্যবহার ক'রে আত্মহত্যা কর্ব্বে। এ কি তোমারই মূর্খতা নয় ? কূপ থেকে জল উত্তোলনের জন্য তোমাকে পিতা দিলেন দড়ি আর কলসী, কিন্তু তুমি পিপাসার বারি আহরণ কার্য্যে তাদের ব্যবহার না ক'রে দড়ি কলসী গলায় বেঁধে নদীতে চলেছ ডুবে মরার জন্য। এ কি তোমার মূর্খতা নয় ? কামেরও প্রয়োজন আছে, ক্রোধেরও প্রয়োজন আছে। সন্তান-উৎপাদনের জন্য কামের প্রয়োজন, কিন্তু সে কাম সুসংযত কাম। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ক্রোধের প্রয়োজন, কিন্তু সে ক্রোধ সুসংযত ক্রোধ। অলব্ধবস্তু লাভের জন্য লোভের প্রয়োজন, কিন্তু সে লোভ সুসংযত লোভ। অর্থাৎ রিপুচয়কে সম্পূর্ণরূপে বিচার-বুদ্ধির অধীন ক'রে, লোকহিত-বুদ্ধির অধীন ক'রে, ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীন ক'রে তাকে বৃহত্তম কল্যাণের অনুরোধে বশংবদ-ভৃত্যের ন্যায় পরিচালিত কর্ব্বার জন্যই এগুলি তুমি পেয়েছ। অপরেরা এদের অসদ্ব্যবহার করেছে ব'লেই তুমি ভেবে নেবে যে, তুমি এদের সদ্ব্যবহার কর্ত্তে সমর্থ হবে না ? জগতের অধিকাংশ সাধারণ লোকের সাথে নিজেকে তুলিত ক'রো না, জগতের স্বল্প-সংখ্যক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে নিজেকে তুলিত কর। কুপ্রবৃত্তি দমন অসম্ভব নয় এবং বিশ্বাস কর যে, ভবিষ্যতে যারা রিপুজয় করার গৌরব অর্জ্জন করবেন, তুমি নিশ্চিতই তাঁদের মধ্যে একজন হবে।

বক্তৃতান্তে বিশ্রাম-স্থানে আসিলে যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় আদি নানা বয়সের জিজ্ঞাসুরা নানা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

জীবিত থাকার অর্থ

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —নিজেকে জীবিত ব'লে অভিমান কচ্ছ, সেটা ত' বৃথা। কতক্ষণ তুমি ভগবৎ-স্মরণ কচ্ছ, সেইটী আগে বল। যতক্ষণ তিনি তোমার স্মৃতিতে, ততক্ষণই তুমি জীবিত। যে মুহূর্ত্তে নিজেকে ঈশ্বর-বিস্মৃত করলে, তৎক্ষণাৎ তুমি মরলে। শরীরটা একশ চল্লিশ বছর বাঁচলেই দীর্ঘায়ু লাভ হ'ল না। মনটা ঐ একশ চল্লিশ বছর ভগবানে লেগে থাক্‌লে তোমার অতগুলি দিন বাঁচা হ'ল। ঈশ্বর-বিস্মৃত হ'য়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই, কেবল শরীরের ভার-বহন মাত্র।

বাঁচার মত বাঁচ

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন, —যত অল্পই বাঁচ, বাঁচার মত বাঁচো, সার্থক ভাবে বাঁচো। জগতের অধিবাসীদের ভালবেসে, জগৎ-পতিকে ভালবেসে, তাঁর সঙ্গে আর তাঁর সৃজিত কোটি কোটি প্রাণীকে ভালবেসে, তাঁর সঙ্গে আর তাদের সঙ্গে অন্তরের আপনত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে, তবে বাঁচো। কেবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস টান্‌লেই আর ছাড়লেই বাঁচা হয় না, প্রতিটী নিঃশ্বাসে প্রতিটী প্রশ্বাসে তাঁকে স্মরণ করা চাই। হৃদয়ের স্পন্দন চলতে থাক্‌লেই বাঁচা হয় না, প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে তাঁকে স্মরণ করা চাই। হাত-পা নড়লেই বাঁচা হয় না, শরীরের প্রত্যেকটী আন্দোলনে তাঁর সঙ্গ, তাঁর স্মৃতি, তাঁর সেবা, তাঁর প্রিয় কার্য্য হওয়া চাই। এমন বাঁচাই বাঁচার মত বাঁচা। লক্ষ কোটি জনে দুই একজন এমন

জীবন লাভ কত্তে পারেন কিন্তু সেই দুর্লভ বাঁচার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তোমাকে রাখ্‌তে হবে। জিদ্ কর, বাঁচার মত বাঁচব, মরার মত বেঁচে কোন লাভ নেই।

ঈশ্বরই পরমাত্মীয়

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— -পরমেশ্বরকে কেবল ঈশ্বর ব'লেই জেনো না, তাঁকে তোমার পরমাত্মীয় ব'লে জানো। তাঁকে ভালবাসো, তাঁর চরণে অন্তরের অফুরন্ত প্রেম অর্পণ কর, জীবনের প্রতি রন্ধ্রে তাঁকে এনে প্রতিষ্ঠা কর, প্রতি আচরণকে তাঁরই পূজা ব'লে গ্রহণ কর। তিনি ছাড়া তুমি নও, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমার কোনো কাজ চলে না, তোমার চিন্তা চেষ্টাবাক্যস্ফুরণ সব তাঁকে আশ্রয় ক'রে হোক, তাঁর জন্য হোক, তাঁকে নিয়ে হোক্। এভাবে তুমি একেবারে ভগবন্ময় হ'য়ে যাও। জীবনের সার্থকতা এইখানে, জীবনের শান্তি এইখানে।

ঈশ্বর ও পরমেশ্বর

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, —ঈশ্বর আর পরমেশ্বর কি দুইটী ভিন্ন বস্তু ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা কেন হবে ? ঈশ্বর আর পরমেশ্বর দুটো আলাদা বস্তু নন। ঈশ্বরের একটা সিং আর পরমেশ্বরের তিন কুড়ি সিং, এ নয়। যিনি ঈশ্বর, তিনিই পরমেশ্বর, ঈশ্বরকে একটু জোর দিয়ে বলতে গেলে বলি পরমেশ্বর, আর কিছু নয়।

তবে ঘটে ঘটে এদেশে ঈশ্বরের আবির্ভাব বা অবস্থিতি কল্পনা করা হয়, এক এক জনের ঈশ্বর এক এক রকম হ'য়ে দাঁড়ান, —এও সত্য। সেই সব স্থলে সকল ঈশ্বরের একক ঈশ্বর, এই কথা বুঝাতেও পরমেশ্বর শব্দ ব্যবহৃত হয়। এটা আরব দেশ নয় যে, সব ঈশ্বর ভেঙ্গে চুরে এক ঈশ্বরকে বসিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ল। এজন্য এখানে পরমেশ্বর বল্‌তে একটু আলাদা অর্থে বুঝতে হয় বৈ কি ? তোমরা সেই একমাত্র ঈশ্বরকেই ভজনা কর, যিনি সকল ক্ষুদ্র ঈশ্বর, ছোট্ট ঈশ্বর, খণ্ড ঈশ্বরেরও পরমপ্রভু পরমেশ্বর। ক্ষুদ্রের মধ্যে মনকে আবদ্ধ ক'রে রেখো না, ভূমার দিকে তাকাও, অখণ্ডই তোমাদের লক্ষ্য হোক্।

বিশ্বমানব হও

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন, —জাতিভেদ দূর ক'রে দেবার জন্য আমাদের করণীয় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —আমাদের করণীয় হচ্ছে মন থেকে সঙ্কীর্ণতা দূর ক'রে দেওয়া। জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ জগৎ থেকে তুলে দেবার উপায় আছে কিনা, তা' নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, কি ক'রে তুমি সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বসম্প্রদায়কে নিজের ভাইবোনের জাতি ও ভাইবোনের সম্প্রদায় ব'লে জ্ঞান কত্তে পার, কি ক'রে নিজের অন্তরের সমস্ত ভালবাসা ও প্রেম তাদের অর্পণ কত্তে পার, তার জন্য ব্যস্ত হও। তোমার সেবায় সর্ব্বজাতির সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বাবস্থার কুশল হউক। তুমি নিজে ক্ষুদ্র মানবটী থেকে বিশ্বমানবে পরিণত হও। তুমি তোমার

ভিতর থেকে সঙ্কীর্ণতার বুদ্ধি ও প্রবণতাগুলি দূর ক'রে দাও। সবাইকে ভালবাসার মধ্যে যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তা' নেই।

সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন-স্থল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জীবনে গণ্ডীবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা। যেখানে উদার হ'তে গেলে তোমাকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে হবে, এমন স্থলে তুমি নিজ গণ্ডীর ভিতরে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে দোষ বলা চলে না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে সাম্প্রতিক ঝোঁক আমি যা লক্ষ্য কচ্ছি, তা' ত' আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাকর্ষণ নয়, তা' হচ্ছে অন্তরের বিদ্বেষকে বা প্রভুত্ব-স্পৃহাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য স্বজাতি-প্রীতির একটা মিথ্যা আলখাল্লা পরিধান করা। নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য অত্যধিক পরিমাণে যাঁরা চীৎকার কচ্ছেন এবং মানুষকে উত্তেজিত কচ্ছেন, তাঁদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য অকিঞ্চন প্রেম নাই, নিঃশেষে দান নাই, অফুরন্ত ত্যাগ নাই। অনেক স্থলেই ব্যক্তিগত সংগঠন-শক্তিকে প্রয়োগ ক'রে বাগ্মিতার ছটায় মানুষ ভুলিয়ে নিজের জন্য নেতৃত্ব সংগ্রহের চেষ্টা ব'লে মনে হয়। তোমরা এসব পথে যেও না।

সতর্ক থাকার আবশ্যকতা

একজন জিজ্ঞাসু জনৈক ধর্ম্মগুরুর নানা আচরণ বর্ণনা করিয়া প্রতিকারের উপায় জানিতে চাহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরনিন্দা ভাল নয়, পরচর্চ্চায় অধোগতি আসে। আমাদের কর্ত্তব্য নিয়ত আত্মপরীক্ষা ক'রে নিজেদিগকে পরিশুদ্ধ রাখা আর তোমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা। নীচ, হীন অতি জঘন্য প্রবৃত্তিকে অনেক সময়ে আমরা বিশ্বপ্রেমের গেরুয়া কাপড় পরিয়ে সাধু-সন্তের দিব্য মূর্ত্তি দান করি এবং লোকের চক্ষু যখন আমাদের ছলনায় ঝলসে যায়, ভাল-মন্দ কিছুই আর তারা দেখতে পায় না, তখন আমরা মানুষের ঘরের পিঁড়ার তলদেশ দিয়ে সিঁদকাটি দিয়ে সিঁদ খুড়ি। আমাদিগকেই গৃহের রক্ষক জ্ঞান ক'রে গৃহস্থ-ভদ্রলোকেরা ঘর-পাহারার ভার আমাদের উপরে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নাকে প্রচুর সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুতে থাকেন, কেউ কেউ বা হঠাৎ জেগে উঠলেও জেগে জেগে কেবলি ঘুমোন। এরই ফলে ধর্ম্ম-গুরুদের মধ্য থেকে অনেক লম্পট পাষণ্ড ঘরে ঘরে পাপের স্রোত প্রবাহিত করবার সুযোগ ক'রে নেয়। তোমার কর্ত্তব্য সকলের সম্পর্কেই সতর্ক থাকা। সংসারের ভিতরে ধর্ম্মের নাম ক'রেও পাপকে প্রবেশ কত্তে দেওয়া হবে না, এই জিদ্‌টা থাকা চাই।

সতর্কতা বনাম অবিশ্বাস

প্রশ্ন। —তাহ'লে আমরা কি সাধু-মহাপুরুষদের দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস কর্ব্ব ? তাঁদের সন্দেহ কর্ব্ব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবিশ্বাস কেন কর্ব্বে ? সম্মান-নীয়কে সম্মান কর্ব্বে, পাদ্য অর্ঘ্য দেবে। কিন্তু সতর্কতাকে

অবিশ্বাস বা সন্দিগ্ধতা ব'লে গাল দেওয়া ঠিক্ নয়। বাড়ীতে একজন অতিথি এলেন। অমনি কি তুমি তোমার সিন্দুকের চাবির ছড়া তাঁর কাছে ফেলে রেখে দাও ? দোকানে একজন অতি সজ্জন খদ্দের এলেন, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা কত্তে দরজার পানে ছুটে যাও কিন্তু তাই বলে কি তোমার ক্যাশ-বাক্সের নোটের তাড়া তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌তে শুরু কর, মশায়, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, এই দিলাম সব নোট, আপনি চ'লে যাবার সময়ে আপনার পকেট আমি সার্চ্চ কর্ব্ব না। তুমি বরং তখন ক্যাশ-বাক্সটীর ডালা বন্ধ ক'রে চাবি লাগিয়ে তারপরে তাঁকে সমাদর কর, পাঁচ বার গদী ছেড়ে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে পাঁচটা জিনিষ তাঁর কাছে এনে পৌঁছে দাও, এঘর, ওঘর, এ-গুদাম সে গুদাম তাঁর পছন্দ-মতন জিনিষ, খুঁজে আনবার জন্য ছুটাছুটি কর। এই জায়গায় অবিশ্বাস বা সন্দিগ্ধতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। একজন সাধু গুরুদেব হ'য়েই তোমার বাড়ী এসেছেন ব'লে তাঁর স্নান করার ঘরে তাঁর স্নানের সময়ে তুমি তোমার যুবতী কন্যাটিকে পাঠিয়ে দিতে পার না কিম্বা গভীর রজনীতে তাঁর পা টিপে দেবার জন্য তোমার বউমা, দিদি, কাকীমা, পিসীমাকে যেতে বল্‌তে পার না। এর মধ্যে কোনো অবিশ্বাস বা সন্দিগ্ধতার কথা ওঠেই না। এটা স্বাভাবিক সদাচারের কথা। অবশ্য, এসব সদাচার সতর্কতা থেকেই জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সতর্কতা আর অবিশ্বাস এক কথা নয়।

মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব

একজন শ্রোতা কোনও এক অবতার-রূপে পূজিত পুরুষের সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী বলিলেন এবং তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমন লোক যদি সমাজ-বিরোধী কার্য্য করেন, তবে তাকে কুকার্য্য না ব'লে লীলা ব'লে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত কি না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —অবতারেরা অবতার-লীলা কত্তে থাকুন। কিন্তু তোমরা ওসব আজগুবি গল্পে বিশ্বাস ক'রো না। কোনও মানুষের অলৌকিক শক্তি হ'য়েছে ব'লেই তাঁর মল দুর্গন্ধযুক্ত হবে না, হবে সুখাদ্য, তাঁর মূত্র কদর্য্য-বস্তু হবে না, হবে সুরভি পানীয়, এসব যুক্তির কোনও অর্থ নেই। অলৌকিক-শক্তিধারী মহাপুরুষেরা নানা কাণ্ড দেখিয়ে মানুষকে তাক্-লাগিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু যাদু কররা কি তার চেয়েও আশ্চর্য্য কাজ করেন না ? অলৌকিক শক্তি নাই কিন্তু নির্ল্লোভ, এমন মানুষ অনেক মহাপুরুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অলৌকিক শক্তি নাই বা থাকলেও কদাচ প্রকাশ পায় না, কিন্তু নিয়ত জীবকল্যাণে রত, নিজের স্বার্থ-চিন্তা করার অবসর নাই, এমন মানুষদের চরণ-ধূলায় অনেক খ্যাতনামা মহাপুরুষ ধন্য হবেন, জেনো। মানুষকে তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব দিয়ে বিচার কর। মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব তাঁর ত্যাগে, তাঁর প্রেমে, তাঁর সর্ব্বজীবহিতৈষণায়, তাঁর আত্মদানে, তাঁর নাম-যশ-প্রতিপত্তি-লোভহীনতায়, তাঁর অকপট আত্মবি-লোপে। কেউ অবতার হ'তে পারেন, মহাপুরুষ হ'তে পারেন কিন্তু এমন মানুষ তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

মহতের নীচ আচরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন, —মানুষকে তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব দিয়ে বিচার এই জগতে আছে ব'লেই অনেক সামান্য ঘরের ছেলেরাও পরিণামে জগত্রাতা-মহাপুরুষ হ'তে পেরেছেন। কে কোথায় জন্মাল, এই যুক্তিতে মানুষ বড় হয় না। কত মিথ্যাচারী ব্যক্তিরা লোক দিয়ে প্রচার করান, তাঁরা গৌরাঙ্গ বা নিত্যানন্দের বংশধর, তাঁরা বিষ্ণু বা শিবের অবতার। গ্রাম্য লোকে তা বিশ্বাসও করে। কিন্তু তাতেই কি এঁরা মহৎ হ'য়ে যান্? কত দুরাচার ব্যক্তি শত শত লোকের দ্বারা নিজের ঐশ্বরিকী শক্তির বিভূতি প্রচার করিয়ে কাগজে কলমে বিপুল প্রতিষ্ঠা পান। কিন্তু তাতেই কি কেউ মহৎ হন? চুরি ক'রে তোমার জেল হয়নি, এ জন্যই তুমি মহৎ? নারীর সম্ভ্রম হস্তক্ষেপ ক'রেও তোমার লোকমান কমে নি, এজন্যই তুমি মহৎ? মহতোমহীয়ান্ পরমেশ্বরের সঙ্গে যিনি যুক্ত হয়েছেন, তিনি মহৎ। তাঁর দ্বারা চুরি, বাটপাড়ি, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, লাম্পট্য ভণ্ডামি কদাচ সম্ভব নয়। লীলার ছলেও এমন গর্হিত কাজ কদাচ তাঁরা কত্তে পারেন না।

নিজেরা মহৎ হও

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তোমরা প্রত্যেকে নজেরা মহৎ হবার জন্য চেষ্টিত হও। পরমমহৎ পরমেশ্বরে নিরন্তর আত্মনিবেদন কত্তে থাক। এর ফলে সব শ্লাঘ্য সদ্‌গুণ তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবে, সব ত্যাজ্য দোষ তোমাদের

ছেড়ে চ'লে যাবে। পরমেশ্বরের চরণে নিজেদের অর্পণ ক'রে তোমরা কৃতকৃতার্থ হবার চেষ্টা কর। আমার বা অন্য কোনও মহাপুরুষের মূর্ত্তি পূজা ক'রে তোমাদের সে লাভ হবে না, যে লাভ হবে নিরন্তর পরমেশ্বরের নাম-স্মরণে। ভগবানের নামকে জীবনের পরম অবলম্বন কর। নামের মতন বন্ধু নাই, নামের মতন অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্ বস্তু আর কিছু নাই। নাম তোমাকে রূপান্তর দেবে, নবজন্ম দেবে।

১৭ই কার্ত্তিক,১৩৩৯

জগন্নাথপল্লীর বক্তৃতায় কাঠিয়াপাড়া গ্রামের যুবকেরাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অদ্য প্রাতে বহুজন বহুবিষয়ে উপদেশ চাহিতেছেন।

ভগবান্ মঙ্গলময়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —যে-কোনও বিপদ তোমার উপরে আসুক না কেন, তুমি বিশ্বাস ক'রো যে, তোমাকে পূর্ণতা দানের জন্যে এটী ভগবানের প্রদত্ত সুবিচার। তোমার প্রতি ভগবানের কোনো আক্রোশের কারণ থাকতে পারে না, কারণ তিনি করুণাময়। Have implicit faith in the perfect goodness of God (ভগবানের পরিপূর্ণ মঙ্গল-মহত্ত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী হও।) ভগবানের প্রেমময় নাম তোমাকে পরিচালিত করুক। ভগবানের নামের সেবা যদি তোমাকে বিপদের মুখে নিয়ে ফেলে, then it is surely for your good (তবে তা' নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গলের জন্যই হচ্ছে।)

সঙ্কল্পের শক্তি অর্জ্জন কর

অন্য অপরাহ্নে কাঠিয়াপাড়া গ্রামের যুবকদের একান্ত আগ্রহে সেখানে একটী সভার আয়োজন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি সেখানে ব্রহ্মচর্য্যসহায়ক আসন-মুদ্রাদি শিক্ষাদানের পরে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তোমার জীবন আর সৎসঙ্কল্পের জয় একার্থ-বোধক হউক। তোমার মননশক্তি সৎসঙ্কল্প পোষণের জন্যই ব্যয়িত হউক। বিচার ক'রে বিবেচনা ক'রে সঙ্গতভাবে ওজন ক'রে একটী সঙ্কল্পকে গ্রহণ কর এবং গ্রহণের পরে হয় মৃত্যু, নয় সঙ্কল্পের সম্পূর্ণতা তোমার জীবনের মূলমন্ত্র হোক্। ধ'রে ধ'রে ছেড়ে দেওয়া লক্ষ লোকের জীবনে দেখেছ। ধরার পরে আর না-ছেড়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত তোমরা তোমাদের জীবন দিয়ে দেখাও। সঙ্কল্প কর যে, মানুষের মত মানুষ হবে এবং সেই সঙ্কল্পকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন ক'রে জগৎকে দেখাও, জগৎকে শিখাও যে, এই তমসাচ্ছন্ন যুগেও মনুষ্যত্বের দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত করা যায়, এই অধঃপতিত দেশেও অভ্যুদয় লাভ করা সম্ভব। জীবনসংগ্রামে যারা পরাজিত হ'য়ে পলায়নপর হয়েছে, সেই দুর্ভাগাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে বুদ্ধি, সময় ও শক্তির অপচয় ক'রো না। সঙ্কল্প কর, মহৎ হবে এবং মহত্ত্ব তোমার হবেই হবে। চেষ্টার পশ্চাতে বিশ্বাসকে এবং চেষ্টার সম্মুখে আশাকে স্থাপিত কর। বিশ্বাসের ভিত্তিতে চেষ্টার প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হোক, আশার আকাশ সেই প্রাসাদ-চূড়া চুম্বন করুক।

সঙ্কল্পের শক্তিকে অর্জ্জন কর এবং সহস্র জনের আদর্শস্থানীয় হও।

আত্মজীবনী, প্রার্থনা ও আদর্শ

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীবাবামণি জগন্নাথপট্টি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনজনে তিনটী প্রশ্ন করিল।

একজন প্রশ্ন করিল, —স্বামীজী আপনার আত্মজীবনীটী জানতে চাই।

অপর জন প্রশ্ন করিল, —আপনার প্রার্থনার বিষয় কি ?

তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, —আপনার আদর্শ কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হারমোনিয়ামটী লইয়া গান ধরিলেন। বলিলেন, —

আমার আত্মজীবনী শুনবে ? তবে শোন।

তুই আমারে করলি পাগল
তাই মা পাগল হয়েছি,
তুই বহালি সবার বোঝা
তাই নীরবে বয়েছি॥
বল্লি যেদিন দুখীর তরে
তোর নাকি মা নয়ন ঝরে,
সেদিন থেকে সবার ব্যথা
নিজের বুকে লয়েছি॥
তুই দিলি গান তাই মা স্তুতি,
তুই দিলি প্রাণ তাই আহুতি,

তুই কহালি তাই ত' কথা
জগৎ জুড়ে কয়েছি,
তুই সহালি তাই অবাধে
সকল দুঃখ সয়েছি॥

এই হ'ল আমার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী। আমি নিজের ইচ্ছায় পাগল হইনি, তিনিই পাগল করেছেন। আমি নিজের ইচ্ছায় বোঝা বই নি, তিনিই বোঝা বইয়েছেন। তোমাদের সবার জন্য তাঁর প্রাণে দারুণ ব্যথা, তাই আমি তোমাদের জন্য ব্যথিত হয়েছি এবং যা কর্‌বার ক্ষুদ্র-বৃহৎ কথা ও কাজ, তাঁরই কৃপাতে ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু আমার প্রার্থনার বিষয় কি শুনবে ?

সংসার যদি টানে হে
ভাসাইয়া দিও যত প্রলোভন
তোমার প্রেমের বানে হে॥
শ্রবণে পশিলে কামনার বাণী
উচ্চে ধরিও তোমার রাগিণী,
লুব্ধ হৃদয়ে করিও মুগ্ধ
তোমারি মধুর গানে হে॥
মিথ্যা আমারে দাবী যদি করে
তুমি তব বুকে রেখ মোরে ধ'রে,
চঞ্চল চিত ক'রে নিও জয়
প্রেমালিঙ্গন দানে হে॥

অর্থ নয়, বিত্ত নয়, মান নয়, যশ নয়, প্রতিপত্তি নয়, আমার প্রার্থনা শুধু তাঁর প্রেমালিঙ্গন। তাঁর বুকের স্পন্দনের মাঝে

আমি আমার রিপুর স্পন্দন ভুলে যেতে চাই। তাঁর প্রেম নিয়েই আমার ঘরকন্না, অন্য সংসারী আমি চাই না। দীর্ঘায়ু লাভ আমার লক্ষ্য নয়, জীবন-দানই আমার লক্ষ্য। আমার আদর্শের কথা শুনবে ?

আমায় তুমি শিখাও প্রভো
জীবন-দানের খেলা,
কেমন ক'রে ভাসাতে হয়
অকূল মাঝে ভেলা॥

কেমন ক'রে ঝড়-বাতাসে
তোমার প্রেমে পরাণ হাসে,
কেমন ক'রে অভয় মিলে
ডুবে মরার বেলা॥

কেমন ক'রে আঁধার রাতে
আকাশ ভেঙ্গে পড়লে মাথে
তুচ্ছ অতি তুচ্ছ ব'লে
কর্‌ব অবহেলা॥

বিদ্যুতের ঐ চকমকানি,
ঊর্মিমালার রুদ্রবাণী
কেমন ক'রে সাজাবে মোর
আনন্দেরি মেলা॥

মাইজপাড়া (ঢাকা)
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি বেলা এগার ঘটিকার সময়ে জগন্নাথপট্টি হইতে মাইজপাড়া আসিয়াছেন।

মৌনের মহিমা

একজন তান্ত্রিক সাধু তাঁহার সঙ্গ লইয়াছেন। সারা পথই ভদ্রলোক নানাবিধ তত্ত্ব কথা কহিতেছেন। সকল কথারই যে অর্থ সুবোধ্য। তাহা নহে। কোনও কোনও কথা শ্লীলতার গণ্ডীও লঙ্ঘন করিতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —থেমে যাও বাবা, থেমে যাও। মৌনের ভিতরে যত শক্তি আছে, বাগাড়ম্বরের ভিতরে তত শক্তি নেই। মৌন শান্তিরও আগার। মৌন থেকে সঙ্কল্পের শক্তি দুর্জ্জয় হয়, মৌন সাধনাকে গভীরতা ও একলক্ষ্যতা দেয়।

পীতপর্ণা-কথা বা পঞ্চমকার রহস্য

কিন্তু সাধু মহাশয় থামিবেন না বলিয়া পণ করিয়াছেন। তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তোমাকে একটা গল্প শোনাই। মন দিয়ে শোন।

সাধু সম্মত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন, —এক দেশে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন বড়ই ভগবদ্ভক্ত। তাঁর ছিল দুইটী মাত্র দোষ, তিনি বহু পত্নীর পতি এবং অপুত্রক। জ্যেষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো পত্নীর

গর্ভেই তাঁর সন্তান হয়নি। শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তি কে ভবিষ্যতে পাবে, তাই নিয়ে সংসারে ছিল বিচিত্র উদ্বেগ। শ্রেষ্ঠীর সর্ব্বজ্যেষ্ঠা পত্নীর কোনও পুত্র-সন্তান ছিল না, ছিল একটী মাত্র গৌরবর্ণা কন্যা। কিন্তু অন্য পত্নীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিহেতু শ্রেষ্ঠী জ্যেষ্ঠা পত্নীকে আদর কত্তেন না, তাঁর গর্ভে জাতা কন্যাটিকেও না। কন্যাটির নাম পীতপর্ণা।

শ্রেষ্ঠীর কিন্তু অন্য হাজার রকমের সদ্‌গুণ ছিল। তিনি দানশীল ছিলেন। পরোপকারে তাঁর অশেষ রুচি ছিল। ভগবদ্ভক্তি তার অগাধ ছিল। নানা দিগ্‌দেশ থেকে জ্ঞানী ভক্ত সন্ত-সাধুদের এনে তাঁদের দিয়ে সদুপদেশ দেওয়াতেন, লোকে শুনে উপকৃত হ'ত।

শ্রেষ্ঠীর অন্যান্য পত্নীরা স্বামীর আদর পেয়ে পেয়ে সংসারের তুচ্ছ সুখগুলিকে ভালবাসতে লাগল। পীতপর্ণা দেখত, মা তার সর্ব্বদাই বিষাদে মলিন, এত বড় সম্পন্ন লোকের বড় বৌ হ'য়েও সাধারণ ঝি-চাকরাণীর মত তিনি অনাদৃতা। দেখত, ভগবানের কথাকথকতা যেখানে হচ্ছে, মা নতমুখে সাশ্রুনয়নে সেইখানে ব'সেই কথা শুনছেন। মায়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে পীতপর্ণার মনে বৈরাগ্য-ভাব এল। সে সংসার ছেড়ে চ'লে যাবার জন্য তৈরী হ'ল। মাকে বল্লে, —মা, আমি সন্ন্যাসিনী হ'ব, ভগবানকে ডাকব। মা বল্লেন, —সে কি ক'রে হয় মা ? তুমি হ'লে অত বড় নামী লোকের কন্যা, তুমি একাকিনী রাস্তায় বেরুলে এই বংশের নামে কলঙ্ক হবে।

কিন্তু পীতপর্ণার মন মানে না। রোজ রোজ মাকে কেবল বুঝায়,—মাগো, আমাকে ছেড়ে দাও, সংসার আমার জন্য নয়, আমিও সংসারের জন্য নই। এই ত' তোমার বিয়ে হয়েছে, কত সুখে ঘরকন্যা নাকি কচ্ছিলে। কিন্তু সে সুখ তোমার কপালে সইল কি ? এখন তুমি নিতান্ত সাধারণ একটা দাসীর চেয়েও অধম হ'য়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এই সংসারটীর মধ্যে দুঃসহ কাল কাটাচ্ছ। এর চেয়ে তুমি যদি ভগবানের নামে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে যৌবনেই যোগিনী হ'তে, তাহ'লে তোমার আর দুঃখটা ছিল কি ?

মা বল্লেন, —এ কথা সত্য।

কিছুদিন যায়, মায়ের খুব অসুখ হ'ল, মা গেলেন মারা। পীতপর্ণা খুব কাঁদল, শ্রেষ্ঠীও কাঁদতে কিছু কম কর্লেন না। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার একটী বিয়ে কর্লেন। ক'রে বল্লেন, —ওরে পীতপর্ণা, মা হারিয়েছিস্, এই তোর মা এনে দিলুম। এখন এঁকে যত ইচ্ছা মা ব'লে ডেকে প্রাণের সাধ মেটা।

কিন্তু ঘোলে কি আর দুধের সাধ মেটে ? পীতপর্ণা একদিন তার নূতন মাকে ডেকে বল্ল,—মাগো, ধ্রুব নাকি ভগবানকে পাবার জন্য সংসার ছেড়েছিলেন, আমিও সংসার ছেড়ে চলে যাব।

নূতন মা বল্লেন, —ভালই ত'। তবে তোমার বাবার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। নইলে দোষ হয়।

অনুমতি মিল্‌তে কষ্ট হ'ল না। কারণ, ছোট বউয়ের গর্ভে এক পুত্র-সন্তান জন্মাল। শ্রেষ্ঠী মনে মনে ভাবেন, একটা উপায়

করা দরকার। নবজাত পুত্রকেই তিনি সমস্ত সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী কত্তে চান। ভাবলেন, বড় বৌয়ের সন্তান, কার সঙ্গে আবার বিয়ে হয়, কে এসে আবার কোন্ সম্পত্তির দাবী করে। মিতাক্ষরার দেশ। শ্রেষ্ঠী পীতপর্ণাকে খুব আশীর্ব্বাদ ক'রে ট'রে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে দূরে এক তপোবনে এক বৃদ্ধ সাধুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। সাধুর নাম সদাচারী বাবা।

সাধু তাকে দেখে বল্লেন,—মাগো, তুমি ভাগ্যবতী যে, এই বয়সে এমন সদ্‌রুচি হয়েছে, আর পিতার পেয়েছ অনুমতি। এই আশ্রমেই থাক, আর প্রত্যহ ব্যাকুল প্রাণে ভগবানকে ডাক। ভগবানকে ডাকতে ডাকতে তিনি নিজেই তোমাকে ব'লে দেবেন, তোমার পথ কি ? অন্তরের প্রীতি নিয়ে তাঁকে ডাক, তিনি তোমাকে সদ্‌বুদ্ধি দেবেন, বিবেক দেবেন, বৈরাগ্য দেবেন, ভগবানে পরমা ভক্তি দান কর্ব্বেন। তবে, সব সময়ে সৎসঙ্গ ক'রো আর কুসঙ্গ থেকে সাবধান থেকো।

পীতপর্ণা জিজ্ঞাসা কর্ল্ল,—প্রভো, কুসঙ্গ কাকে বলে ?

সদাচারী বাবা বল্লেন, —যার সঙ্গ করলে মনে পাপ-চিন্তা আসে, অন্তরের পবিত্রতা কমে, আত্মরক্ষার ইচ্ছা দুর্ব্বল হয়, রিপুকুলের দাসত্ব স্বীকার কত্তে অন্তরে লোভ জাগে, তাকেই জানবে কুসঙ্গী।

পীতপর্ণা জিজ্ঞাসা কর্ল্লে, —প্রভো, কুসঙ্গের ফল কি ?

সদাচারী বাবা বল্লেন, —ফল অধঃপাত, ফল নিরয়গমন, ফল অনুশোচনা এবং আত্মগ্লানি।

সাধুর কাছে এসব কথা শুনে পীতপর্ণার মনে বড় ভয়

হ'ল। সে কাঁদতে কাঁদতে বল্ল,—প্রভো, আমি আপনার আশ্রয় ছেড়ে আর কোথাও যাব না। এইখানেই আমি আপনার চরণ-তলে মাথা খুঁড়ে পড়ে থাকব।

সদাচারী বাবা হাসতে হাসতে বল্লেন,—তা' কি হয় রে পাগ্‌লী? আমি আর ক'দিন? বৃদ্ধ হয়েছি। একদিন পাকা আমপাতার মত জীবন-বৃক্ষ থেকে খ'সে পড়ে যাবে এই দেহখানা। তখন তুমি একা থাক্‌বে কি ক'রে? তখন তোমার সঙ্গের প্রয়োজন হবে। তখন যাতে কুসঙ্গে গিয়া না পড়, তারই বিষয় বল্‌ছি।

একদিন সত্য সত্যই সাধু মহারাজ সদাচারী বাবা দেহ ছাড়লেন।

পীতপর্ণা অনেক কান্নাকাটি করল, তারপরে সাধুর চেলাদের সঙ্গে মিলে দেহটাকে সমাধিস্থ কর্ল্ল।

তারপরেই শিষ্যরা সব একে একে আশ্রম পরিত্যাগ কত্তে লাগ্‌ল।

একজন বল্ল,—সত্যে আবদ্ধ ছিলাম যে, আমৃত্যু গুরুর চরণ-সেবা করব। সে সত্য আমি রক্ষা করেছি। মৃত্যুটা যে আমারই হ'তে হবে, এমন কোনো দলিল লিখে দিই নাই। সুতরাং গুরুর মৃত্যুতে আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হ'য়ে গেছে। এখন আমি ঘরে ফিরে যাব।

আর একজন শিষ্য বল্লে,—শাস্ত্রেই আছে, "মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ" তেমনি তত্ত্বলিপ্সু শিষ্যও "গুর্ব্বোঃ গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ।" আমাকে এখন আর একজন গুরু খুঁজে বের কত্তে হবে। ইনি

যা দেবার তা' ত' সবই দিয়েছেন। এখন আমার আরও কিছু চাই।

অপর এক শিষ্য বল্লে,—গুরুদেবকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাস্‌তাম, তাঁর দেহাবসানেই ত' আর সেই ভালবাসা, সেই ভক্তিশ্রদ্ধা লোপ পেয়ে যায় নি! আমার গুরু সর্ব্বব্যাপী। সমস্ত বিশ্বের প্রতিজীবে আমি আমার গুরুকে দর্শন কর্ব্ব এবং জগতের প্রত্যেক প্রাণীর কর্ণে কর্ণে তাঁর পবিত্র উপদেশ-বাণী পরিবেশন কর্ব্ব। সুতরাং সেও চল্ল।

অপর এক শিষ্য বল্ল,—সবাই যখন চলে যাচ্ছে, তখন এই দারুণ জঙ্গলের মধ্যে আশ্রম পাহারা দেবার জন্য আমার থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি যাব ভাল একটা শহরে, প্রতিষ্ঠা করব নূতন ক'রে একটা আশ্রম। লোকে বলবে, হাঁ, আশ্রম বটে ত' অমুক বাবাজীর। এতদিন জোঁকের আর মশার কামড় খেয়েছি। এখন একটু আরাম কত্তে চাই।

সর্ব্বশেষে একজন বল্ল,—ও পীতপর্ণা-দি। একটা কথা শোনো। সব গুরুভাইরা ত' নিজ নিজ মতলব-সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ পথে চলে যাচ্ছেন। পাগলেও নিজের বুঝ বোঝে। তবে তুমি আমি কেন এই পোড়ার আশ্রমে প'ড়ে কষ্টে দিন কাটাই? এস আমরা পরস্পরকে বিবাহ করি, দেশে যাই, সুখে থাকি। পীতপর্ণা ধমক দিয়ে বল্ল,—এই কি তোমার গুরুগৃহে থেকে দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফল? দূর হও তুমি এখান থেকে, আমি একাই গুরুর আশ্রমে বাস কর্ব্ব।

কামলুব্ধ শিষ্যটী যখন হাজার যুক্তি দিয়েও পীতপর্ণার মত বদলাতে পার্ল্ল না, তখন শুরু কর্ল্ল অনুনয় বিনয়। কত তার

কাতরতা, কত তার প্রেম, কিছুই সে বলতে বাকী রাখ্‌ল না। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হ'ল না। তখন রাগ ক'রে বলতে লাগ্‌ল, —ওরে কুরূপা কদাকার ঘৃণ্যা নারী, তুই ভেবেছিলি, তোর জন্য আমি ব্যাকুল। মোটেই না। আমি তোর মেজাজ পরীক্ষা কচ্ছিলাম। তুই যদি রাজি হ'য়ে যেতিস্, তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে তোকে বলে দিতাম যে, তোর মত কুৎসিতা নারী দিয়ে আমার জীবনের কোনো সাধ মিটবে না। জানিস্, শহরে বন্দরে কত অপ্সরোপমা অপরূপা সুন্দরী মেয়ে আমার জন্য দিন রাত তপস্যা কচ্ছে, প্রত্যহ শিবের মাথায় এক হাজার একটী ক'রে বেলপাতা ছড়াচ্ছে ?

এই শেষ শিষ্যটীও প্রস্থান কর্ল্লে। এখন পীতপর্ণা একা। একবার সদাচারী বাবার সমাধির উপরে নত হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলে, প্রভো, আমাকে সুপথ দেখিয়ে দাও, আমাকে মিথ্যা হ'তে রক্ষা কর। আবার তাঁর নিত্যকারের উপাসনার আসনটীর সম্মুখে করযোড়ে হাটু গেড়ে বলে,—প্রভো, আমাকে আমার সঙ্গী চিনিয়ে দাও, আমাকে কুসঙ্গ থেকে রক্ষা কর।

একদিন রাবণ-বাবা নামে এক ভীষণদর্শন বামাচারী সাধু এসে আশ্রমের দ্বারদেশে ব্যোম-ব্যোম-ববব্যোম ব'লে হুঙ্কার ক'রে দাঁড়ালেন।

পীতপর্ণার অন্তর ভয়ে দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠল।

রাবণ-বাবা পীতপর্ণাকে দেখতে পেয়ে অতীব সপ্রীত ভাব ধারণ ক'রে গভীর স্নেহ সহকারে বল্লেন,—আমার এই দারুণ মূর্ত্তি দেখে তুমি ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীটী, আমি "ভীষণং

ভীষণানাং" কে ভজনা করি কি না। তাই আমার মধ্যে এত রুদ্র তেজ দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু আমার ভিতরটা বড় কোমল, একেবারে রসে ভরা। আমার অন্তর সর্ব্বজীবের প্রতি করুণায় পরিপূরিত। আমি যাকে দেখি, তাকেই আপন ক'রে নেই। আমি হাঁড়ি, মুচি, ডোম, মেথর, যবন বা ম্লেচ্ছ ব'লে কাউকে বর্জ্জন করি না। সকলের প্রতি আমার সমভাব। আমাকে ভয় করা তোমার অনুচিত।

এত বড় বক্তৃতাটা শুনে পীতপর্ণা আর রাবণ-বাবাকে অবজ্ঞা কত্তে সাহস কর্ল্লে না। একখানা কুশাসন এনে বসতে দিল।

রাবণ-বাবা জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন, —তোমার নামটী কি বলত লক্ষ্মী!

—পীতপর্ণা।

—বাঃ, চমৎকার নাম। এ নাম আমি আগেই জান্‌তুম। আমার শাস্ত্রেই তোমার নামটী অনেক আগে বলা আছে। তবে শোন, —

—"পীতপর্ণা স্বর্ণবর্ণা কমলচরণা সুন্দরী।" এসব শাস্ত্রেরই কথা। তুমি যে একদিন জন্মাবে, তারপরে এসে ঋষির আশ্রমে জীবন-গঠন কর্ব্বে, এসব শাস্ত্রেই লেখা আছে। শাস্ত্রকে সত্য জেনে, শাস্ত্রোক্ত এই দুর্ল্লভ রত্নকে অন্বেষণ করার জন্যই আমি সুদীর্ঘ পরিব্রজ্যায় এত বৎসর কাটিয়েছি। আজ তোমার দেখা পেলুম, আমি ধন্য হলুম।

রাবণ-বাবা ঐ আশ্রমেই র'য়ে গেলেন। প্রত্যহ কত ভাল ভাল কথা, কত স্তোত্র-স্তবাদি পাঠ, কত কীর্ত্তন, ভজন,

মন্ত্রোচ্চারণ যে চলতে লাগল, বলার নয়। সর্ব্বদা দূরত্ব রেখে চলতে থাকলেও আস্তে আস্তে পীতপর্ণার মনে রাবণ-বাবা সম্পর্কে একটা গভীর আস্থার ভাব জাগ্রত হ'ল।

এমন সময়ে একদিন রাবণ-বাবা প্রস্তাব কর্ল্লেন, —চলনা লক্ষ্মীটী আমার আশ্রমে। সেখানে তোমাকে কত রকমের যোগ শিখাব, কত রকমের যাগ শিখাব। যে সব আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম জীবনে শিখবার সুযোগ পাওনি, সব শিখাব।

পীতপর্ণা বল্লে,—তা হয় না প্রভো। আমার গুরুর আশ্রম ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

রাবণ-বাবা হেসে বল্লেন, —তোমার গুরু ত' আমিও। একই গুরু ঘটে ঘটে প্রকাশ পাচ্ছেন। জগতের সব গুরুই তোমার গুরু। তোমার ঐ গুরু ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন্ গুরুর অস্তিত্ব আছে ? আমাতে আর তোমার ঐ গুরুদেবে যে অভিন্নতা। এসব শাস্ত্রেরই বাণী। শাস্ত্র কি কখনো মিথ্যা হয় ? ''মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।'' চল, চল, আমার আশ্রমে চল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় পীতপর্ণা রাবণ-বাবার আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'ল। এখানে কত লোক-জন, কত যাগ-যজ্ঞ, কত মন্ত্র-তন্ত্রের সমারোহ।

এদিকে তিনটা নরকঙ্কাল ঝুলছে, ঐদিকে পাঁচটা নরমুণ্ড গড়াগড়ি খাচ্ছে, এখানে কয়েকজন ভক্ত দিবারাত্রি মা মা ব'লে চীৎকার কচ্ছে, ওখানে কয়েক জন ব'সে ব'সে মন্ত্রপূত গাঁজায় দম দিচ্ছে। আশ্রম একেবারে গুলজার।

পীতপর্ণা জিজ্ঞাসা কর্ল্ল,—প্রভো, এসব কি ?

রাবণ-বাবা বল্লেন,—সবই অধিকারী-ভেদে হয়। যে যার অধিকারী, সে তেমন সাধন পায়। এসব দেখে মাথা খারাপ ক'রো না বাছা। তোমার হচ্ছে দিব্যাচার। পাপস্পর্শ-বিরহিত আশ্চর্য্য দিব্য-সাধনা তোমার জন্য। মন খারাপ ক'রো না।

দিন যায় আর মাস যায়। পীতপর্ণার কাছে যে সব ব্যাপার অসহ ছিল, সেগুলি ক্রমশঃ গাসহা হ'য়ে উঠে।

একদিন রাবণ-বাবা মৎস্য-সাধনে বসলেন। চমৎকার দেখে রোহিত মৎস্য রন্ধন করা হ'ল। প্রভুর সম্মুখে ভোগ-নিবেদন করা হ'ল। নানাবিধ মন্ত্রোচ্চারণ করার পরে রাবণ-বাবা বল্লেন, —পীতপর্ণা, তুমি জগতে সুদুর্ল্লভ। দুর্ল্লভতম সাধনের অসরূপে আজ তোমাকে মৎস্য-সাধন কর্ত্তে হবে। এস, এই মন্ত্র উচ্চারণ কর এবং মৎস্যখণ্ডগুলি সেবন কর। তুমিই আমাদের এই ভৈরবীচক্রের কেন্দ্রবর্ত্তিনী মহাশক্তি। এই বস্তু তোমার ওষ্ঠস্পর্শ করার পরে ভক্তগণ তোমার প্রসাদ পাবে। এই দিচ্ছি আমি মৎস্যখণ্ড তোমার মুখাগ্রে তুলে, তুমি অবহেলে গলাধঃকরণ কর। আর, দাও তুমি আমার মুখাগ্রে তুলে, আমিও গ্রহণ ক'রে মৎস্যসাধনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মতন পীতপর্ণা আজ ঠিক সেই কাজটীই কল্লে, যে কাজটী এর আগে জীবনে আর কখনো করে নি।

রাবণ-বাবা বল্লেন,—গুরুবাক্য দ্বিধাহীন চিত্তে পালন কর্ত্তে হয়। তবে বল্ব, হাঁ, শিথ্য বটে। শাস্ত্র বল্ছেন,—''গুরোর্বচঃ সত্যম্ অসত্যম্ অন্যৎ।'' গুরুর বাক্যই সত্য, অন্য বাক্য মিথ্যা।

পীতপর্ণা জিজ্ঞাসা কল্ল,—কিন্তু তাই ব'লে মৎস্য সেবন কত্তে হবে ? মাংস-সেবন কত্তে হবে?

রাবণ-বাবা বল্লেন,—আরে, আমার মুখের কথা বরং নাই মান্লে। শাস্ত্রও মানবে না ? শাস্ত্র বল্ছেন,—

"ন মৎস্য-ভক্ষণে দোষো, ন মাংসেন চ মৈথুনে,
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

পীতপর্ণা বল্লে—ঐ ত' শাস্ত্রেই নিবৃত্তিকে মহাফলদায়িনী বলা হচ্ছে প্রভো!

রাবণ-বাবা বল্লেন, —তুমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছ না লক্ষ্মীটি। শাস্ত্রের অনেক কথার অর্থ অতীব গূঢ়, একমাত্র গুরুবক্ত্রগম্য। গুরুদেবের মুখ ছাড়া অন্য জায়গায় শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাবে না। অতএব নিবৃত্তির এই ক্ষণিক প্রশংসা দেখে ভুল বুঝে ব'সো না। শাস্ত্র বল্ছেন,—

"মৎস্যাস্য ভক্ষণাৎ পুণ্যং, শক্তিলাভো সুনিশ্চয়ঃ।
তস্মাৎ মৎস্যান্ সুসেবেত গুরুবাক্যানুসারতঃ॥"

গুরুবাক্যানুসারে সব কাজ করা যায়, দ্বিধার কোনো কারণ নেই পীতপর্ণা।

কিছুদিন পরে মাংস সেবনের বিরাট ভৈরবী-চক্র বস্ল। পীতপর্ণা কিছুতেই মাংস খাবে না। বল্লে—ধর্ম্মের নামে প্রাণিহত্যা আমি অসঙ্গত জ্ঞান করি। রাবণ-বাবা বল্লেন,—ওটা ভ্রম মাত্র। জগতে কে কাকে মারে? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, —"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।—আমিই আগে থেকে সবাইকে মেরে রেখেছি।" সুতরাং পশুহত্যাও দোষ নয়, মাংসসেবনে ত' কোনো দোষই নেই। শাস্ত্র কি বল্ছেন জানো ?

"মাংসস্য সেবনাদ্দার্ঢ্যং, স্থিতপ্রজ্ঞো ভবেন্নরঃ,
প্রশস্তির্ভবতি নিত্যং নিগমেষ্বাগমেষু চ।"

সকল শাস্ত্রে, আগমে, নিগমে মাংসসেবনের প্রশংসা। তুমি শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন ক'রে, পাপভাক্ হ'তে চাও ?

যুক্তির দাপটে পীতপর্ণা অতি কষ্টে মাংসও গলাধঃকরণ কল্ল। কিছুদিন পরে এ জিনিষটা তার স'য়ে গেল।

একদিন রাবণ-বাবা বল্লেন,—হে পীতপর্ণা, দিনের পর দিন তোমার সাধন-চন্দ্রমা পূর্ণিমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তোমার মধ্য দিয়ে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে। আজ তোমাকে মহাব্রতে অভিষিক্তা হ'তে হবে। আজ হবে মদ্য-সাধন।

মদ্যের নাম শুনেই পীতপর্ণা রুষ্ট হ'য়ে উঠ্ল। বল্ল,—একটা একটা ক'রে আমি আপনার কথা মেনে যাচ্ছি, আর আপনি কদিন পরে পরে নূতন নূতন ব্যাপার ঘটাচ্ছেন। এ আমি আর চলতে দিব না।

সুমধুর কণ্ঠে ভুবন মাতিয়ে দিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে রাবণ-বাবা বল্লেন, শাস্ত্রে অমোঘ বাণী শোন।

"মাদয়তি মনো নিত্যং শ্রেষ্ঠং সুখানুদায়কং,
মদ্যঃ দদাতি মুক্তিস্তু সর্ব্বসংস্কার বন্ধনাৎ।"

তুমি অতীব ভাগ্যবতী সাধিকা, শাস্ত্রের এই বাণী তোমাকে মানতেই হবে। এই নাও মদ্যপাত্র, আকণ্ঠ পান কর।

পীতপর্ণার ভিতরে যেন বিপ্লবের ঝড় বইতে লাগল। সে

মনে মনে ভাবতে লাগল, এই ভণ্ড তপস্বীর বাগ্‌জালে বদ্ধ হ'য়ে আমি কোন্ দিকে চলছি ? না, আর না। আর এঁর কথা শুন্‌ব না। তবে সে মনের কথা মুখে প্রকাশ না ক'রে মদ্যপাত্র ঘ্রাণ ক'রেই ফিরিয়ে দিল। লুব্ধ ভক্তেরা কাড়াকাড়ি ক'রে প্রসাদ পান কত্তে লাগল। মদ্যপানে অত্যধিক লিপ্ত হবার ফলে অনেকের বুদ্ধিবিলোপ হ'তে লাগল এবং রাবণ-বাবা সহ সকলে অতিশয় কুৎসিত ব্যাপার সব কত্তে লাগ্‌ল। কে যে কার সঙ্গে কি ব্যবহার কত্তে লাগ্‌ল, তার কোনো ঠিকানাই নেই। এক সুযোগে পীতপর্ণা স্থানত্যাগ ক'রে নিজের শরীরটাকে অসম্মান থেকে বাঁচাল।

পরদিন প্রাতে উঠেই রাবণ-বাবা পীতপর্ণাকে ডেকে বল্‌লেন, — তোমাকে কাল চক্রের মাঝে কেন দেখ্‌তে পাই নি ?

পীতপর্ণা মনে মনে ভাবল, মিথ্যা বলা পাপ কিন্তু লম্পটের সাথে বিপজ্জনক সত্য বলা আরো পাপ। পীতপর্ণা মিথ্যা বলাই সঙ্গত জ্ঞান কল্ল। বল্‌ল,—কেন প্রভো, কাল সারা রাত আমি আপনার সাথে সাথে ছিলাম। মদ্যসাধনে উল্লসিত হ'য়ে আপনি যখনি যেদিকে ছুটে গেছেন, আমি তখনি আপনার কাছখানটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি এক নিমেষের জন্যও আপনার কাছ-ছাড়া হইনি। আমি মদ্য অতি অল্পই পান করেছিলাম, তাই আমার সংজ্ঞার লোপ হয় নি। আমি আপনার উল্লসিত মূর্ত্তি দেখে তার অভিপ্রায় বুঝেছি। তাই আমি আপনার সঙ্গছাড়া হইনি।

রাবণ-বাবা বল্‌লেন, সত্যি বলছ ত। আমার ত' কিছু খেয়ালে

আস্‌ছে না।

পীতপর্ণা বল্‌লে, —আপনার দিব্যি দিয়ে বল্‌ছি প্রভু, আমি সত্য কথাই বলছি।

রাবণ-বাবা খুশী হ'য়ে বল্‌লেন, —বেশ। তবে এস মুদ্রা-সাধন শেখো। এই ভাবে এই কাজ, ঐ ভাবে ঐ কাজ ক'রে যেতে হবে। তার নাম মুদ্রা-সাধন। পূর্ণাভিষিক্ত হ'লে এতে অধিকার জন্মে। গুরু দয়া ক'রে অতি ভাগ্যবান্ শিষ্য-শিষ্যাকে এই নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেন। এস, দেরী ক'রো না।

পীতপর্ণা বল্‌লে,—না প্রভো। এ পারব না। মুদ্রা-সাধনে আমার প্রয়োজন নেই। এতদিন যা হ'য়েছে, তাতেই আমার যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছে। আর উন্নতি আমি চাই না।

রাবণ-বাবা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—শাস্ত্রে কি আছে জানো ?

"মুদ্রায়াঃ সাধনে সৌখ্যম্, আনন্দং বচনাতীতম্।
লঙ্ঘয়েন্ন কদাপ্যস্য শাসনং গুরুদর্শিতম্।"

পরম আনন্দের বিধায়িক মুদ্রা সম্পর্কে গুরু যা নির্দ্দেশ দেবেন, তা' কদাচ লঙ্ঘন কত্তে নেই।

পীতপর্ণা বল্‌লে,—না, আমি লজ্জাশীলতা বিসর্জ্জন দিতে পারব না।

রাবণ-বাবা হেসে বল্‌লেন,—লজ্জা-ফজ্জার কথা তুলো না। গুরুর কাছে আবার লজ্জা কি ? আচ্ছা, মুদ্রাসাধন শিখতে না চাও ত' মৈথুন-সাধনটা শিখে নাও। শাস্ত্র কি বল্‌ছেন জানো ?

"মৈথুনং ন করোতি যস্তস্য তু জীবনং বৃথা।
যোন্যাঃ যোন্যান্তরং যাতি, নরকান্ন নিবারিতঃ॥"

আরো শোনো পীতপর্ণা, শাস্ত্রে আছে,—

"পঞ্চমকার-সাধনং যঃ করোতি অনুক্ষণম।
সদ্যো লভিষ্যতে মুক্তিং নাত্রাত্র বিন্দুসংশয়ঃ॥"

পঞ্চমকার সাধন যে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হবে।

এবার পীতপর্ণা ক্ষেপে উঠ্‌ল। বল্‌ল, —সাবধান, আর আপনি এসব বাক্য উচ্চারণ কর্ব্বেন না। যা অধঃপাত আমার হবার, হয়েছে। আর অধঃপাতে যেতে চাইনে।

কিন্তু রাবণ-বাবা পীতপর্ণার জন্মান্তর গ্রহণের দুঃখ ঘুচাইবেনই, পীতপর্ণাকে নরক থেকে রক্ষা কর্ব্বেনই। পীতপর্ণাকে সদ্যঃ সদ্যঃ মুক্তির রসাস্বাদন তিনি করাবেনই। তিনি উন্মত্তের মত পীতপর্ণাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হ'লেন। রাবণ-বাবার সিঁদুর-মাখা ত্রিশূলটা ছিল হোমকুণ্ডের কোণে বসান। পীতপর্ণা তাই তুলে নিয়ে সবলে রাবণ-বাবার বক্ষে তীক্ষ্ণ আঘাত কর্ল্ল এবং সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ দিয়ে নিকটবর্ত্তী বনে প্রবেশ কর্ল্ল।

চতুর্দ্দিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। একবার যদি পাওয়া যায় তবে ধ'রে এনে মাকালীর চরণ-তলে খড়্গাঘাতে বলি দিতে হবে।

একজন শিষ্য বল্‌লে,—প্রভো, শাস্ত্রে স্ত্রী-বলি নিষেধ আছে।

রাবণ-বাবা বুকের ক্ষতটায় হাত দিয়ে চাপা দিয়ে ধ'রে অতীব কষ্টের সঙ্গে বল্‌লেন,—গুরু-আজ্ঞায় সব কিছু করা যায়। শাস্ত্র ত' গুরুরই মুখের বাক্য। একদা যা শাস্ত্র ছিল, গুরুর আজ্ঞাতে

তা' অশাস্ত্র বা কুশাস্ত্র হ'তে পারে। গুরু নিত্য নূতন শাস্ত্র রচনা কত্তে পারেন। শান দিয়ে রাখ মা-কালীর খড়্গ, আর সবাই মিলে অসৎ স্ত্রীলোকটীকে যেখান থেকে পার ধ'রে নিয়ে এস।

এদিকে ঘটনার নূতন আবর্ত্তন ঘটেছে। শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পদের খ্যাতি শুনে একদল দস্যু রজনীযোগে শ্রেষ্ঠীর গৃহে প্রবেশ করেছে এবং একটী একটী ক'রে প্রত্যেকটী প্রাণীকে হত্যা করেছে। শ্রেষ্ঠী তাঁর নগদ টাকা কদাচ নিজ বাড়ীতে রাখতেন না, রাখতেন গিয়ে রাজার বাড়ীর ধনাগারে। ফলে এতগুলি নরহত্যা ক'রেও ডাকাতেরা নগদ টাকা বিশেষ কিছুই পেল না। এই আক্রোশে তারা ঘুমন্ত শিশুকে, এমন কি কুকুর-বিড়ালগুলিকেও ধ'রে ধ'রে কচুকাটা ক'রে রেখে গিয়েছে।

পরদিন সকালে রাজার বাড়ীতে খবর গেল। রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে স্বয়ং গিয়ে হাজির হ'লেন। দেখ্‌লেন, এখন আর কিছু করার নেই।

পার্ষদেরা বল্‌লে, —শ্রেষ্ঠীর কোনও উত্তরাধিকারী নেই। সুতরাং এর ঘর-বাড়ী আর অন্যান্য সম্পত্তি সব আপনার। এখনি এখানে পাহারা নিযুক্ত করুন।

রাজা বল্‌লেন, —পাহারা নিযুক্ত এখনি হবে, তবে এ সম্পত্তি আমার ব'লে নয়। এ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠীর কন্যা পীতপর্ণার। সে কোন্ এক আশ্রমে আছে। তাকে খুঁজে আন্‌তে হবে। আর, শ্রেষ্ঠীর কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ আমার ভাণ্ডারে গচ্ছিত আছে। তাও তাকে প্রত্যর্পণ কত্তে হবে।

কথাটী যেমনি রাষ্ট্র হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে বিবাহেচ্ছুক যুবকের

দলে একটা হৈ-হল্লা লেগে গেল ! কত জন যে কত রকম বেশভূষা পরিধান ক'রে সুশ্রী সেজে নানা দেশে নানা দিকে রওনা হ'ল, বলার নয়।

এই রাজধানীতেই শুক্লাম্বর নামে এক সাধক যুবক বাস কত্ত। তার মায়ের বড় সখ যে, পুত্র বিবাহ করে। কিন্তু শুক্লাম্বর বলে,—মাগো, বিয়ে ক'রে সিংহের মত পুরুষগুলিও শেষে ভেড়া ব'নে যায়। মহাত্যাগীরাও ভোগীর অধম হয়। উদ্যমীরও উদ্যম বিবাহ ক'রে হ্রাস পায়। বিবাহের পরে অন্তরের ভগবৎ-প্রেম যেন শুকিয়ে যায়। থাকে শুধু বালুর চরা, কাষ্ঠ হাসি আর ভক্তির মিথ্যা অভিনয়।

মা বল্লেন, —না রে না। যোগ্যা পাত্রীর সঙ্গে যোগ্য পাত্রের মিলন হ'লে এসব কমে না, বাড়ে। তুই বিয়ে কর। আমি তোকে যোগ্যা পাত্রী খুঁজে এনে দেব।

শুক্লাম্বর বল্লে,—তা' কি হয় ? তুমি বৃদ্ধ হয়েছ। তুমি ঘরে ব'সে থাক। তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে, আমাকে বিবাহ কত্তেই হবে, তখন আমি জিদ ক'রে তোমার কথার অমান্য কর্ব্ব না। পাত্রী আমি নিজেই খুজে নেব।

শুক্লাম্বর দেশ-পর্যটনে বের হ'ল।

নানা দেশ পর্যটন কত্তে কত্তে একটা জায়গায় এসে শুক্লাম্বরের মনটা আপনা আপনি বিপুল হর্ষে পূর্ণ হ'য়ে গেল। একটী সমাধির উপরে কিছু শুষ্ক পুষ্পমাল্য প'ড়ে আছে, নিকটে একটী নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত প্রদীপ, আর কিছু ধূপারতির সামগ্রী। স্থানটী পরিচ্ছন্ন কিন্তু গাছের পাতা প'ড়ে সব ঢেকে আছে। দেখলে মনে হয়,

কিছু কাল আগেও এখানে মানুষ বাস কত্ত। আশ্রম-কুটীরে প্রবেশ ক'রে শুক্লাম্বর দেখতে পেল একখানা যোগাসন, তার উপরে এক জোড়া খড়ম। কে যেন এখানে পূজা কত্ত। শুক্লাম্বর ভাবল, এসব হচ্ছে ইঙ্গিত। ভগবান্ আমাকে বলছেন, বধূ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হবি কেন, সাধনে ব'সে যা। শুক্লাম্বর সাধনে ব'সে গেল।

এই জায়গাটী কিন্তু অন্য কোনও স্থান নয়। সেই সদাচারী বাবার আশ্রম।

এদিকে বিবাহার্থী যুবকের একটা দল নানা দেশ ঘুরে ঘুরে রাবণ-বাবার আশ্রমের কাছাকাছি স্থানে এসে একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম কচ্ছে আর কথাবার্ত্তা বলা শুরু করেছে।

একজন বল্ল,—ওরে শোন্। পীতপর্ণা। নামটী আমি আর ভুলতেই পাচ্ছি না। দিনরাত কেবল জপ কচ্ছি পীতপর্ণা, পীতপর্ণা, পীতপর্ণা।

পীতপর্ণার কাণে তার নিজের নামটা পৌছতেই সে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। ভাবল, এরা কে ? রাবণ-বাবারই চর নয় ত'? এত দূর বন-জঙ্গল পার হ'য়ে এসেও ঐ রাক্ষসের দলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না ? হে প্রভু পরমেশ্বর, এ তুমি কি করলে ? ভয়ে পীতপর্ণার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল, কণ্ঠ শুকিয়ে গেল, শরীর কাঠ হ'য়ে গেল।

আর একজন বললে,—তুই ত' ভাই পীতপর্ণা পীতপর্ণা ব'লে নামজপ কচ্ছিস। আমি কচ্ছি ধ্যান। একেবারে আপাদমস্তক ধ্যান। কেমন তার চোখ, কেমন তার মুখ, কেমন

তার বিম্বৌষ্ঠ, কেমন তার ভ্রূযুগল, কেমন তার অক্ষিতারকা—

আর একজন এক ধমক দিয়ে বললে,—থাম্, থাম্। বাড়াবাড়ি কত্তে হবে না। ধ্যান ত' কচ্ছি আমি। কেমন তার পীনপয়োধর, কেমন তার.....

চতুর্থ একজন বললে, —থাম্, থাম্। তুই মহাকবি কালিদাস হয়েছিস্। মাতৃশরীরের সর্ব্বাঙ্গ বর্ণনা পাপ, তা' তুই জানিস্ ? পীতপর্ণাকে আমি বিয়ে কর্ব্ব। আমি দূর সম্পর্কে তোর খুড়ো,মানে ছোট বাপ। আমার স্ত্রী তোর কাকী অর্থাৎ ছোটমা, তুই পীতপর্ণার শরীরের বস্ত্রাচ্ছাদিত অংশের বর্ণনা করবার কে রে? মা বিয়ে হবার পর তোকে কাকী ব'লে ডাকতে হবে, পীতপর্ণাকে গড় ক'রে প্রণাম কত্তে হবে।

এই সব শুনে পীতপর্ণার বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগল। সে দ্রুত অন্য দিকে প্রস্থানের উদ্যোগ কত্তে যাচ্ছিল, এমন সময়ে এক নিদারুণ বাণী তার কর্ণে প্রবেশ কর্ল্ল।

প্রথম জন চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, —যত সব মাতাল আর গেঁজেল, তোরা ভাবছিস্ পীতপর্ণাকে বিয়ে করবি। ছিঃ, তোরা কি তার যোগ্য ? সে হ'ল কত বড় শ্রেষ্ঠীর কন্যা। কত তার ধন। কত তার সম্পদ। ভাগ্যে ডাকাতেরা এসে শ্রেষ্ঠীকে হত্যা করেছিল, ভাগ্যে রাজা আমাদের ভাল মানুষ। নইলে কি তোদের মতন তুচ্ছ বিড়াল এই সিংহের কন্যার পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে পাত্ত ? যা তোরা সব চলে, আদেশ কচ্ছি আমি। একাই আমি পীতপর্ণাকে বিয়ে কর্ব্ব, একাই আমি তার বিপুল সম্পত্তি অধিকার কর্ব্ব।

একজন চীৎকার ক'রে বলে উঠল,—না, না। তোমাকে একা বিয়ে করতে দেব না। আমরা সবাই মিলে বিয়ে কর্ব্ব, আমরা সবাই মিলে সম্পত্তি ভোগ কর্ব্ব।

আর একটী কণ্ঠ শোনা গেল, যা এতক্ষণ শোনা যায় নি। সে বল্লে,—দ্রৌপদীর বিবাহ পঞ্চস্বামীর সঙ্গে হয়েছিল বটে কিন্তু ঐ দৃষ্টান্ত ঐ খানেই খতম। পীতপর্ণার বিয়ে একজনের সঙ্গেই হবে, এখন সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ যেই হোক। কিন্তু তোরা কি ভেবে দেখেছিস যে, পীতপর্ণা যেই মুহূর্ত্তে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনবে, তখনি শোকে অধীর হ'য়ে যাবে। তখন তোরা কে কি করবি, সেইটী আগে ঠিক কর।

কে কি করবে, তাই নিয়ে তুমুল কোলাহল লেগে গেল। কেউ বল্লে, চোখের জল মুছে দেব, কেউ বল্লে, বুকে ধ'রে নিয়ে শোক ভুলাব, কেউ বল্লে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁদব, কেউ বল্লে, বারংবার পরলোকগত শ্রেষ্ঠীর কেবল গুণপ্রশংসা কর্ব্ব, কেউ বল্লে, ডাকাতেরা যে কচুকাটা ক'রে গেছে এই কথাটী গোপন রাখব। একজন বল্লে,—যাই বল আর যাই কর, অনেক ধন যে রাজার কাছে শ্রেষ্ঠী মশায় রেখে গেছেন, তা' যেন প্রথমেই প্রকাশ না পায়। কারণ, তা' প্রকাশ পেলে আমাদের মত হাড় হাভাতেগুলিকে পীতপর্ণার পছন্দই হবে না।

নানা কথা শুনতে শুনতে পীতপর্ণার মনে হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। ভাবল, এরা সব নীচ চরিত্রের অসৎ লোক। উদ্দেশ্য এদের মধ্যে কারোই খুব পরিচ্ছন্ন নয়। অনুনয় ক'রে সফলকাম না হ'লে বলপ্রয়োগ ক'রেও এরা বিবাহ কত্তে পারে। সুতরাং

এসব পাপী লোকের কাছে আত্মপ্রকাশ করা হবে না।

চ'খের জল মুছে চ'খে মুখে স্বাভাবিক ভাব এনে পীতপর্ণা আস্তে আস্তে রাস্তা ধরল। নবাগত বিবাহার্থীদের কাছাকাছি আসতেই একজন বল্লে, দেখ ত' কে আসছে ?

সবাই চীৎকার ক'রে উঠল, —ঐ, নিশ্চয়ই ঐ পীতপর্ণা।

যেন কিছুই শুনতে পায় নি, এই ভাণ ক'রে পীতপর্ণা এগিয়ে এল। সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা কর্ল্ল, —তুমি কে ? তুমি কে ?

পীতপর্ণা হাত জোড় করে বল্লে,—একজন একজন ক'রে কথা বলুন। নইলে ত' শুনতেই পাব না।

—তুমি কে ?

—আমি কমলা। দেবী পিতপর্ণার দাসী।

—দাসী ? তুই দাসী ?

—আরে রাম বল, দাসীকেই আমরা দেবী ব'লে মনে কচ্ছিলাম। ছিঃ ছিঃ। ঘেন্নায় ম'রে যাচ্ছি।

—আজ্ঞে হাঁ, আমি কমলা দাসী।

—এই কমলা দাসী, তোর জাত কি ?

—মালিক, আমি চণ্ডাল-কন্যা। পীতপর্ণা দেবী দয়া ক'রে সঙ্গে রেখেছিলেন।

—তাই বল্। চণ্ডাল না হ'লে এমন চেহারা হয় ? শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ, নির্দ্দয় মূরতি। তা বেশ ত' দাসী, বল্‌না পীতপর্ণা দেবী এখন কোথায় ?

—দেবী তার গুরুর আশ্রমে আছেন। আমাকে জঙ্গলের ঔষধ-পত্র শিকড়-বাকড় তুলবার জন্য দূরে দূরান্তরে

পাঠিয়েছিলেন।

—এখান থেকে অনেক দূর ? ক' দিনের পথ ? আমাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌছে দিতে পারিস্ ?

—হাঁ পারি, যদি পথে পথে আপনারা গোলমাল না করেন। দেবীর আদেশ এই ছিল যে, সারা পথ আমাকে একাকিনী আস্‌তে হবে, নইলে ঔষধে কাজ হবে না। সুতরাং আমি 'আপনাদের দলের আগে আগে এতটা দূরে থাকব যেন আমি সর্ব্বদাই আপনাদের দৃষ্টিগোচর থাকি কিন্তু আপনারা লোষ্ট্র-নিক্ষেপ কর্ল্লেও আমার গাত্রস্পর্শ না করে। এইটী দেবীর আদেশ। এই জন্যই পথে পথে কত লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে, সঙ্গে থাকি নি। তারপরে আমি চণ্ডালিনী ব'লে সবাই একটু ঘেন্নাও করে।

—ঘেন্না করবে না ? ঘেন্নার কথাও বটে।

চল্‌ল সবাই সদাচারী বাবার আশ্রমের দিকে। পীতপর্ণা মনে মনে ভাবল, এতগুলি লম্পটের মাঝখান থেকে আত্মরক্ষা করা কঠিন। এতএব যে-কোনও প্রকারে গুরুর আশ্রমে প্রবেশ ক'রে ঘরের দুয়ারে খিল বন্ধ ক'রে আগুন লাগিয়ে মরতে হবে। নইলে সতীত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আশ্রমের কাছে এসেই পীতপর্ণা বল্লে,—প্রভো, আপনারা এই বাইরের আঙ্গিনায় দাঁড়ান। আমি দেবী পীতপর্ণাকে ডেকে দিচ্ছি।

ব'লেই সে কুটীর-মধ্যে প্রবেশ ক'রে সজোরে দুয়ার বন্ধ ক'রে দিল। যেখানটায় দেয়াশলাই থাকে, সেখানটায় হাতড়ে দেয়াশলাই বের করল। একগোছা পাটখড়ি একত্র ক'রে তাতে

অগ্নিসংযোগ কর্ল্ল, তারপরে ভাবল মরার আগে গুরুদেবের উপাসনার আসনটুকুর সামনে একবারটী প্রণাম ক'রে নিই।

সম্মুখে যেতেই আতঙ্কিত হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—এ কে ? কে আপনি ?

শুক্লাম্বরের ধ্যানভঙ্গ হ'ল। বল্লে,—ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি পথিক। চল্‌তে চল্‌তে আশ্রমটুকু দেখতে পেলাম, কেউ নেই, ত' ধ্যানে ব'সে গেলাম। কিন্তু তুমি কে ?

—আমার পরিচয় আমি পরে দিব। এখন আমাকে রক্ষা করুন। একদল লম্পট পীতপর্ণাকে বিয়ে করার জন্য ছুটে এসেছে। এরা লুব্ধ, এরা চরিত্রহীন, এরা সব পারে। এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচান।

—আশ্রমে কোনো অস্ত্র আছে ?

—আছে, কিন্তু সে বড় পবিত্র অস্ত্র। গুরুদেব ছিলেন অতীত জীবনে যোদ্ধা পুরুষ। তিনি ক্ষাত্রবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে সাধু হবার পরেও এই অস্ত্রখানাকে পূজা কত্তেন। বল্‌তেন, অস্ত্র ধারণ কল্লেই হিংসা হয় না। নির্য্যাতিতের নির্য্যাতন চোখের উপরে নীরবে দর্শন করাই প্রকৃত হিংসা। সেই সুতীক্ষ্ণ অসিখানা এই নিন।

দুয়ার খুলে অসি হস্তে সম্মুখে এসে শুক্লাম্বর বজ্রকণ্ঠে বল্লে, —তোমরা কে, কি চাও ?

সকলে সমস্বরে বলে উঠ্‌ল,—আমরা পীতপর্ণাকে চাই।

—পীতপর্ণা ? কে সে ?

—শ্রেষ্ঠীর কন্যা। গৃহত্যাগিনী কুমারী। সাধুর আশ্রমে থাকে।

আমরা তাকে বিয়ে কর্ব্ব, তবে ছাড়্‌ব।

পীতপর্ণার দিকে তাকিয়ে শুক্লাম্বর বল্লে,—ব্যাপার কি দেবী ? পীতপর্ণা কে ?

যুক্ত-করে পীতপর্ণা বল্লে—আমিই পীতপর্ণা। চিরকাল তপস্যা ক'রেছি। কৌমার্য্য আমার অক্ষত। কিন্তু লম্পটদের অত্যাচারে প'ড়ে আমি ভাবছি আমি গৃহে ফিরে যাব, বিবাহ কর্ব্ব। আমাকে রক্ষা করার যোগ্য পুরুষ একজন চাই।

শুক্লাম্বর মনে মনে কি ভাব্‌ল,—তার পরে বল্‌ল,—বেশ। নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমারও অবস্থা তোমার মতন। কিন্তু মায়ের অনুমতি ব্যতীত আমার কিছু করার উপায় নেই। কুলে আমি ক্ষত্রিয়, শীলে আমি তপস্বী, আকুমার ব্রহ্মচারী।

তার পরে যা হ'ল, তা' অনুমান কর। অস্ত্রাঘাতের ভয়ে কাপুরুষের দল পলায়ন কর্ল্ল। আর দেশে ফিরে গিয়ে প্রচার কত্তে লাগ্‌ল, তারাই পীতপর্ণাকে বন থেকে খুঁজে বের ক'রে এনে শুক্লাম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাদের বাহাদুরীটা কম নয়। রাজামশায় যেন পুরস্কার দেবার কালে দয়া ক'রে কথাটা একটু মনে রাখেন।

শুক্লাম্বর গেল মায়ের কাছে, পীতপর্ণা গেল শূন্য গৃহে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায়, মায়ের অনুমতিতে বিবাহ খুব ধুমধান ক'রে হ'য়ে গেল। পীতপর্ণা সংসারী হ'ল।

একদিন শুক্লাম্বর বল্লে,—শোন পীতপর্ণা, এক সময়ে পঞ্চমকার-সাধনা ব'লে এক প্রকারের সাধনা তান্ত্রিক আচার্য্যদের দ্বারা এদেশে প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। তার তাৎপর্য্য বড়ই নিগূঢ়।

মৎস্য, মাংস, মদ্য আদি জতীয় বস্তু নিয়ে তার ব্যাপার নয়। গঙ্গা আর যমুনা যেমন দুইটী নদী প্রয়াগে এসে সম্মিলিত হ'য়েছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যোগে ঈড়া এবং পিঙ্গলা তেমন সুষুম্নাতে যুক্ত হ'য়েছে। এই অবস্থায় চিত্ত আপনা আপনি স্থির হয়। শ্বাস এবং প্রশ্বাসের যোগে তুমি যখন গুরুমুখশ্রুত ক্রিয়া কর, তখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যোগে তোমার ঈড়া নদীতে আর পিঙ্গলা নদীতে মন-রূপ মৎস্য বিচরণ করে এবং উভয়ের যখন স্বাভাবিক কুম্ভক এসে যায়, তখন পিঙ্গলা-রূপ সঙ্গমস্থলীতে ঐ মৎস্য নিজ চঞ্চলতা পরিহার ক'রে স্থির ভাবে অবস্থান করে। একটা মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র। এরই নাম মৎস্য-সাধন।

পীতপর্ণা বল্লে,—ঘোরাচারীরা অন্যরূপ কাজ করে।

শুক্লাম্বর বল্লে,—আমার অম্বর অর্থাৎ বস্ত্র শুক্ল, অর্থাৎ এতে দাগ নেই। আমার বা তোমার জন্য ঐ ঘোরাচার নয়।

শুক্লাম্বর বল্লে, —রসনার নাম মা। মা মানে রসনা। অংসে মানে ভোজন করা। মাংসে মানে, মা-কে রসনাকে ভোজন করা অর্থাৎ মৌন অবলম্বন করা। বাক্-চপলতা পরিহার ক'রে মৌন-ভাবে অন্তরের ভাব-সমুদ্রে ডুব দেওয়ার নাম মাংস-সাধন। প্রকৃত মাংস-সাধনের জন্য পাঁঠা কেটে তার বসা, পেশী, অস্থি, মজ্জা রান্না করার প্রয়োজন নেই, তা' ভক্ষণেরও প্রয়োজন নেই।

শুক্লাম্বর বল্লে,—মনকে একাগ্র ক'রে ইষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট হ'লে সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে অমৃতবৎ মহাবস্তু ক্ষরিত হ'য়ে জিহ্বাতলে পতিত হয় এবং ইহার স্পর্শমাত্র সমগ্র দেহ-মনে অপূর্ব্ব আনন্দ,

শিহরণ, পুলক এবং সম্মোদন অনুভূত হয়। এই অনুভূতি লাভ করাকে বলে মদ্য-সাধন। বোতলের পর বোতল উড়িয়ে দেবার নাম মদ্য-সাধন নয়।

শুক্লাম্বর বল্লে, —প্রকৃত তান্ত্রিকেরা বলেন, শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকামধ্যস্থ বিশুদ্ধ আত্মার জ্ঞান মুদ্রা-সাধন। এর জন্য লজ্জাশীলতার হানিজনক কোনও প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা নেই।

শুক্লাম্বর বল্লে,—জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন-সাধনের, ঐক্য বিধানের, অভিন্নত্ব উপলব্ধির চেষ্টার নাম মৈথুন-সাধন। এর জন্য শরীরকে নিয়ে কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই। স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে যেমন বিপুল আগ্রহ-ব্যাকুলতা থাকে, তেমন আগ্রহ-ব্যাকুলতা নিয়ে জীবাত্মার পক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যে ঐকান্তিকী চেষ্টা, প্রকৃত তান্ত্রিকেরা তাকেই মৈথুন-সাধন নাম দিয়েছেন। যে কাজ প্রত্যেকটী স্বামী নিজ পত্নীর সাথে বা প্রত্যেকটী পত্নী নিজ স্বামীর সাথে করার ধর্ম্মতঃ, ন্যায়তঃ এবং সমাজ-সঙ্গত ভাবে অধিকারী, সেই কাজ করার জন্য সাধুদের আশ্রমে বা গুরুদেবের আশ্রয়ে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই। স্বামী ও পত্নী নিজেদের দৈহিক মিলন-চেষ্টার মধ্যে নিয়ত ভাগবতী অনুভূতি জাগিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা কর্ব্বেন, মাত্র এই উপদেশই এই প্রসঙ্গে দেওয়া চলে। আখড়ায় আর আড্ডায় বা ভজন-চক্রে গিয়ে এসব অনুশীলনের কোনো প্রয়োজন নেই।

গল্পটী শেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সাধুটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —কি হে সাধুবাবা, গল্পটী কেমন লাগল ?

সাধুটী কোনও উত্তর না দিয়া অপ্রসন্ন মুখে নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে নৌকা হইতে নামিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে যৌগিক আসন-মুদ্রা প্রদর্শনের ক্লাস হইল। তৎপর সমাগত যুবকদিগকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

নিত্যসুখই কাম্য হউক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —সুখাস্বাদনই যদি হয় তোমার জীবনের প্রার্থনীয়, তাহ'লে এমন সুখকেই আস্বাদন কর, যাতে তোমার আস্বাদনের সমগ্রটা শক্তি সম্পূর্ণরূপে ডুবে যেতে পারে। এমন সুখকে আস্বাদন কর, যাকে আস্বাদনের পরে আর কিছু আস্বাদনের লোভ না থাকে, যেন পূর্ণ পরিতৃপ্তি এসে যায়, যেন সুখ-পিপাসা চিরতরে মিটে যায়। রসনার সুখ আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, শত আস্বাদনেও সে সুখাস্বাদনের স্পৃহা মিটে না। রাজা যযাতি সহস্র বৎসর রমণীসুখ ভোগ ক'রেও সুখের পূর্ণ পরিতৃপ্তি পেলেন না, প্রাণের পিপাসা মিট্‌ল না। এই অসম্পূর্ণ সুখের জন্য আলেয়ার পশ্চাদনুসরণ ক'রে লাভের মধ্যে পাবে অনুতাপ আর মনোবেদনা। আর কিছু লাভ এতে নেই। একথা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম কর এবং যাতে পূর্ণ সুখের সম্ভাবনা, তার জন্য হৃদয়কে লালায়িত কর। যে উদ্দেশ্যে জীবনধারণ কচ্ছ সেই উদ্দেশ্যের মহনীয়তার ভিতরে সকল সুখের নিদানকে অন্বেষণে সমর্থ হও। ব্যর্থ সুখকে লক্ষ্য না ক'রে সার্থক সুখকে লক্ষ্য কর, সেই সার্থক সুখের সেবা কর।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শ্রুতিসুখ, রসনাসুখ প্রভৃতি অপরিহার্য্য যত সুখানুভব প্রতিদিন কচ্ছ, তাদের ভিতর দিয়ে সকল সুখের আকর যিনি, তাঁর কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা কর। নিত্যসুখই তোমার কাম্য হোক, অনিত্যসুখ বিবেকের অনলে দগ্ধ হ'য়ে মরুক।

১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

মাইজপাড়া গ্রামের যুবকদের ভিতরে একটী আশ্চর্য্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অনেকেই নানা বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

নামের মধু

একজনকে উপদেশপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —কেউ যদি প্রলোভনে প'ড়ে না জেনে বিষমিশ্রিত মধু খায়, তাহ'লে তার অবস্থা কেমন হয় জান? যতক্ষণ বিষের ক্রিয়া আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বারংবার সে ঐ মধুই সেবন করে। কিন্তু যখন বিষের ক্রিয়া শুরু হয়, মস্তক ঘূর্ণন, তালুর শুষ্কতা, শরীরে স্বেদ ও কম্প প্রভৃতি দুর্লক্ষণ প্রকাশিত হ'তে থাকে, মাংসপেশীর আক্ষেপ এবং চর্ম্মের জ্বালা শুরু হয়, তখন আর তার বুঝ্‌তে বাকী থাকে না যে, সে বিষপান করেছে। মধুর জন্য তখনো তার আসক্তি রয়েছে, কিন্তু বিষের জ্বালা তাকে অধীরও করছে। সে তখনি প্রাণরক্ষার মানসে বিষনাশক ঔষধ সেবন করে. বারংবার ঔষধ সেবন কত্তে কত্তে বিষের বিষক্রিয়া লোপ পায়, তার প্রাণরক্ষা হয়। তোমাদের অবস্থা সেইরকম। মধু ভেবে হলাহল পান করেছ। হলাহলে কিছু মধু মিশ্রিত রয়েছে, তাই

সেবনকালে মিষ্টি লেগেছে। কিন্তু এখন চতুর্দ্দিকে নানা দুর্নিমিত্ত আত্মপ্রকাশ কচ্ছে। এই সময়ে তোমাদের অবিলম্বে ঔষধ সেবন আবশ্যক। প্রেমের লোভে কামের সেবা ক'রে দেহে মনে যে বিপজ্জনক বিষের ক্রিয়া চলেছে, তার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অমোঘ ঔষধ শ্রীভগবানের নাম। এই মহাবস্তুকে অবিলম্বে সেবন কর, যতক্ষণ না কামের জ্বালা বিদূরিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেবন কর। দেখবে, সমস্ত বিষ নিরস্ত হবে এবং যেই মধুর লোভে হলাহল পান করেছিলে, সেই মধুর চিরস্থায়ী ও খাঁটি আস্বাদন এই নামরূপী মহৌষধের ভিতরে পাবে। এখন যে নাম মিষ্টি লাগে না, তার কারণ, বিষে তোমার রসনার স্বাদশক্তিকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে।

দারিদ্রে ভীত হইও না

অপর একজনকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —দারিদ্র্যের জন্য তুমি দুঃখ কচ্ছ ? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মানবগুলি চিরদারিদ্র্যব্রতী ছিলেন। সম্পদ যেমন মানুষের চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গে, দারিদ্র্য তেমন ভাঙ্গতে পারে না। অর্থবান্ লোকের পশুত্ব টাকার স্তূপে ঢাকা থাকে ব'লে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই ভ্রম ক'রে মনে করছ যে, সমৃদ্ধি-সম্পদ থাকলে তুমি এরকম কত্তে ওরকম কত্তে, এ-ভাবে কত্তে আত্মোন্নতি, ও-ভাবে কত্তে জীবের সেবা। কিন্তু দরিদ্র ছাড়া জগতের দরিদ্রদের দুঃখ কে বুঝবে ? বিশ্বাস কর যে, তোমার জীবন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবসেবার জন্যই উৎসর্গীকৃত হওয়া চাই। এজন্যই

ভগবান্ বাল্য থেকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তোমাকে শক্ত ক'রে গ'ড়ে নিচ্ছেন। ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ হও যে, তুমি তাঁর চিহ্নিত সন্তান। যেন তুমি আমৃত্যু সকল দরিদ্রের প্রাণের ক্লেশ সহজে উপলব্ধি কত্তে পার, তার জন্য আজ তিনি তোমাকে দিয়ে সকল ক্লেশ অল্পবিস্তর সহ্য করিয়ে নিচ্ছেন। বিদুর ছিলেন দরিদ্র, সুদামা ছিলেন দরিদ্র, শবরী ছিলেন দরিদ্র, এসব ভগবদ্গতপ্রাণ মহতের পানে তাকাও এবং বুকে বল সঞ্চয় কর। দারিদ্র্য দেখে ভীত হ'য়ে যেয়ো না।

দরিদ্রের আত্ম-সম্মান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন, —দরিদ্র হওয়ায় লজ্জার কিছু নেই। বরঞ্চ দরিদ্র হ'য়েও ধনী ব'লে মর্য্যাদা পাওয়ার যে কপট চেষ্টা, সেটাই দারুণ লজ্জাকর। দরিদ্র হওয়ায় অপরাধ কিছু নাই। বরং দারিদ্র্যকে দূর ক'রে দেওয়ার জন্য শ্রম, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ প্রযত্ন অবলম্বন না করাই মারাত্মক অপরাধ। তোমার নিজের কোনো দোষে কি তোমার এই দরিদ্রতা ? দরিদ্র পিতার সন্তান হয়েছ, বহুসন্তানের পিতা তাঁর একটী সন্তানকেও পুষ্টিকর খাদ্য, উপার্জ্জনক্ষম বিদ্যা বা শিক্ষার্জ্জনের সুযোগ দিতে পারেন নি। এটা তোমার দোষ নয়। আলস্য অমিতাচার, বিলাসব্যসন, অপব্যয় এবং দুশ্চরিত্রতার জন্য যদি তাঁর এ দারিদ্র্য না হ'য়ে থাকে, তবে তিনিও এজন্য দোষী নন। দোষী তোমার সমাজ-ব্যবস্থা। যে সমাজ-ব্যবস্থার গুণে একজন বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না ক'রে অক্লেশে রাশি রাশি অন্নের অপচয়

কচ্ছে, আর একজন সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও পেট ভ'রে দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে না, দায়ী সেই অসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা। তোমার দরিদ্রতার জন্য তোমার বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। দৈবক্রমে যারা দরিদ্র নয়, তাদের প্রতি কোনো বিদ্বেষও পোষণ করার প্রয়োজন নেই। প্রতিজ্ঞা কর যে, ধনীর মর্য্যাদা পাওয়ার লোভে কখনো বচনে বা বসনে বা আচরণে ধনীত্বের ভাণ কর্বে না। দরিদ্র থেকেই আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের বলে উঁচু মুখে উঁচু বুকে সমাজ-মধ্যে বিচরণ কর্বে। আরো প্রতিজ্ঞা কর যে, দারিদ্র্য-মোচনের জন্য জগতে কোনো বৈধ পন্থাকেই অনবলম্বনীয় মনে কর্বে না। রাস্তায় খবরের কাগজ বেচলেই মান যায় না, মান যায় লোকের কাছে সাহায্য প্রার্থনায় হাত পাতলে।

পূজ্য দরিদ্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —যে দরিদ্র প্রাণ গেলেও কারো কাছে ভিক্ষা করে না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র লাভের লোভে অপদার্থলোকের গুণ-কীর্ত্তন করে না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র মহাঅর্থকৃচ্ছ্রের ভিতরেও হতাশ হ'য়ে দুঃখ-বিদূরণের চেষ্টা ছেড়ে দেয় না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র জগতের মানব-সমাজের সহস্র উৎপীড়নের ভিতরেও কারো প্রতি কণামাত্র বিদ্বেষ পোষণ করে না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র সহস্র বিঘ্ন-বাধার ভিতরেও নিজ সন্তানগুলির মনে আত্ম-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দিতে অক্ষম হয় না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র প্রাণাতায়

সত্ত্বেও পরধনে অন্যায় লোভ করে না, সে দরিদ্র পূজ্য। যে দরিদ্র জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভগবানে বিশ্বাস হারায় না, সে দরিদ্র পূজ্য।

প্রেমধনে ধনী হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —সংসারের দারিদ্র্যই কি তোমাকে প্রকৃত দরিদ্র কত্তে পারে? ভগবৎ-প্রেম-ধনে ধনী হও। সংসারের দারিদ্র্য তোমার কৌলীন্য অপহরণে সক্ষম হবে না। ভালবাসার ধনে যে ধনী, জগতের রাজ্যেশ্বর সম্রাটও তার পদনখের যোগ্য নয়।

অপার্থিব ধন

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —যে ভগবৎ-প্রেমের অমূল্য ধনে ধনী, সে তার ধন নিজের সিন্দুকে আটক ক'রে রাখতে পারে না। পার্থিব ধনে আর অপার্থিব প্রেম-ধনে এই হচ্ছে প্রধান পার্থক্য। পার্থিব ধনী ধনকে বন্দী ক'রে রাখতে চায়, অপার্থিব ধনী তার ধনকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত ক'রে দিতে চায়। পার্থিব ধনের ধনীর লক্ষ্য শুধু আত্মতৃপ্তি, অপার্থিব ধনের ধনীর লক্ষ্য হচ্ছে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি, পরমাত্মতৃপ্তি। পার্থিব ধনের এক জন ছাড়া আর দুইজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী থাকতে পারে না, একই ধনে দুই জনের পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে না, কিন্তু অপার্থিব ধনে নিখিল জগতের সকলের সমাধিকার ও পূর্ণাধিকার। ধ্যানবলে অপার্থিব ধনের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব ক'রে তাকে করায়ত্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর হও।

ভগবান্ মঙ্গলময়

অপরাহ্ণে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি দুয়াল্লী পৌঁছিলেন।

রাত্রে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —নিশ্চিতই ভগবান্ মঙ্গলময়। এতে বিন্দুমাত্র সন্দিগ্ধ হ'তে পারি না। যখনি আমরা বিপদে পড়ি, তখনি আমরা ভগবান্‌কে অবিশ্বাস কত্তে প্রলুব্ধ হই। কিন্তু আমরা একথা বিবেচনা কত্তে ভুলে যাই যে, যে দুর্ভাগ্য আমাদের আক্রমণ করেছে, সে এসেছে আমাদেরই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের অপরিহার্য্য ফল-স্বরূপে। বরং যে পরিমাণ অনিষ্টকর কার্য্যের আমরা অনুষ্ঠান করেছি, তার জন্য পূরাপূরি শাস্তি অবতীর্ণ হয় নাই। জীবের অসহায় দুর্ব্বলতা দেখে ভগবান্ মাত্র ততটুকু শাস্তি দিয়েই রেহাই দিচ্ছেন, যতটুকু শাস্তি না দিলেই নয়। যতখানি প্রাপ্য তার সবখানি দিলে আমাদের অস্তিত্ব থাক্‌ত না। শাস্তি দানও তিনি স্নেহবশেই করেন, ক্রোধবশে নয়, আক্রোশ বশতঃ নয়। ধৈর্য্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা সহকারে আমরা যখন তাঁর দেওয়া দুর্ভাগ্যকে তাঁর আশীর্ব্বাদের দান ব'লে গ্রহণ করি এবং নিজেদের অপরাধ লাঘবের জন্য আত্মশোধনে যত্নশীল হই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝড়ের বেগ কমিয়ে দেন, দুঃখের বোঝা যতটা সম্ভব সরিয়ে নেন। দুঃখ পাই ব'লেই তাঁর করুণাময়ত্বে অবিশ্বাস কত্তে পারি না।

শূলী রাজার গল্প

শ্রীশ্রীবাবামণি একটী গল্প বলিলেন, —এক দেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ছিল ভীষণ পিত্তশূল। হঠাৎ যখন ব্যথা উঠ্‌ত, তখন প্রাণ যায় যায় অবস্থা হ'ত। বহু ঔষধ ও শুশ্রূষার পরে সুস্থ হ'য়ে কিছুদিন আবার ভাল থাক্‌তেন। একদিন রাজা বল্লেন—মন্ত্রিগণ, ভগবান্ যদি করুণাময় হতেন, তাহ'লে আমার এই প্রাণান্তকর পিত্তশূল রোগ হয়েছে কেন? মন্ত্রীরা সবাই ভয়ে চুপ ক'রে রইলেন। সভা-পণ্ডিত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতীব সত্যবাদী পুরুষ,—তিনি বল্লেন,—মহারাজ, এই রাজ্যে আপনার সহস্র সহস্র প্রজা আছে। তাদের অধিকাংশই বড় দুঃখে বড় ক্লেশে দিনাতিপাত কচ্ছে, আপনি একবার কষ্ট ক'রে তাদের কষ্ট পরিদর্শন ক'রে আসুন। তাহ'লেই বুঝবেন, ভগবান্ করুণাময় কিনা। রাজা বল্লেন, —বেশ, যাব। ব্রাহ্মণ বল্‌লেন,—রাজবেশ প'রে গেলে হবে না, ওটি পরিত্যাগ কত্তে হবে। রাজা বল্‌লেন, —বেশ, তাই হবে। সন্ধ্যাকাল সমাগত হ'ল, রাজা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ ক'রে বৃদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে প্রজাদের অবস্থা দর্শনের জন্য বহির্গত হলেন। একটি দরিদ্র প্রজার গৃহে ক্রন্দন শুনে ব্রাহ্মণবেশী রাজা এবং বৃদ্ধ পণ্ডিত ভিতরে প্রবেশ কর্ল্লেন,—তাঁরা বল্লেন, —দেখ হে, আমরা তোমাদের কান্না শুনে জান্‌তে এসেছি যে, কেন তোমরা কাঁদছ। গৃহস্থ বল্লে,—দেখুন কর্ত্তারা, আমি বড়ই দুর্ভাগা, আমার সাতটী দুগ্ধবতী গাভী, আজ একদিনে মরে গেছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,

—আচ্ছা বাছা, বলত' তোমার এরূপ বিপদ ঘটল কেন ? গৃহস্থ বল্লে, —কর্ত্তা, কারণ ছাড়া কি কখনো কোনো কার্য্য হয় ? আমার পাপ ছিল, তাই তাপ হয়েছে। আমার প্রতিবেশীর গরু রোজ এসে আমার তৃণক্ষেত্রের তৃণ খেয়ে যায়। শক্ত ক'রে বেড়া দিয়ে তার প্রতিরোধ করা এবং প্রয়োজন মতন তাড়িয়ে দেওয়াই ছিল আমার কর্ত্তব্যের সীমা। কিন্তু তাতেই তুষ্ট না থেকে আমি মনে মনে কামনা কত্তাম যে, প্রতিবেশীর গরুর দুধ যেন সব স্তনেই শুকিয়ে যায়। ভগবান ত' অন্তরের কথা শুনতে পান। তিনি ভাবলেন, দাঁড়া, তোকে অপরের অনিষ্ট-কামনার প্রতিফলটা হাতে হাতে দিয়ে দিচ্ছি। তাই আজ আমার এই দশা। কর্ত্তা, পাপ ছাড়া কি তাপ হয় ? এই বলে গৃহস্থ কাঁদতে লাগল। বৃদ্ধ পণ্ডিত শোকার্ত্ত গৃহস্থকে কয়েকটী সান্ত্বনাবাক্য ব'লে অপর একদিকে চল্‌লেন। অপর এক গৃহের পাশ দিয়ে যাবার কালে তাঁরা ক্রন্দন শুনতে পেলেন। গিয়ে দেখেন, আঙ্গিনায় দুইটী স্ত্রীলোকের এবং একটি পুরুষের মৃতদেহ প'ড়ে আছে, আর একটী প্রৌঢ়-বয়স্ক পুরুষ আর্ত্তস্বরে খেদ কচ্ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন, —ওহে গৃহস্থ, ব্যাপার কি ? কান্না থামিয়ে গৃহস্থ বল্লে,—প্রভো, আমি বড়ই দুর্ভাগা, আমার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ এই তিনজন হঠাৎ আজ অপরাহ্নে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'য়ে একসঙ্গে মারা গেছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—তোমার এরূপ বিপদ ঘটার কারণ কিছু অনুমান কত্তে পেরেছ ? গৃহস্থ বল্লে,—প্রভো, অনুমান কত্তে যাব কেন, কারণ ত' একেবারে প্রত্যক্ষ। কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। আমি আমার

প্রতিবেশীর সুখ-সমৃদ্ধি সহ্য কত্তে পাত্তাম না, তাদের পুত্র-বৃদ্ধি, পৌত্রবৃদ্ধি দেখ্‌লে অন্তরে জ্বালা অনুভব কত্তাম। ভগবান্ ভাবলেন,—দাঁড়া, তোকে এর প্রতিফল দিচ্ছি। তিনি আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমাকে একেবারে নির্ব্বংশ ক'রে ছাড়লেন। দেখুন প্রভু, সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়, ভগবানকে ত' যায় না! এই ব'লে গৃহস্থ উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন কত্তে লাগল। বৃদ্ধ পণ্ডিত শোকার্ত্ত গৃহস্থকে কয়েকটী সান্ত্বনাপূর্ণ সহানুভূতিসূচক বাক্য ব'লে ব্রাহ্মণবেশী রাজাকে নিয়ে অপর একদিকে চল্লেন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক দরিদ্র গৃহে কাতর ধ্বনি শ্রবণ ক'রে তাঁরা সেই গৃহে প্রবেশ ক'রে দেখেন, একটী লোকের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে। তাঁরা বল্লেন,—দেখ হে, তোমার কাতর ধ্বনি শুনে জানতে এসেছি ব্যাপার কি ? লোকটী বল্‌লে,—দেখুন দেবতারা, আমি বড়ই দুর্ভাগ্য, পাথরের কাজ কত্তে গিয়ে আমার হাত দু'খানাতে চাপ প'ড়ে ভেঙ্গে যায়, প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে চিকিৎসক হাত দু'খানা কেটে দিয়েছেন, তারই যন্ত্রণায় আমি কাতরধ্বনি কচ্ছি। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—তোমার এরূপ বিপদ ঘট্‌বার কারণ কি ? লোকটী বল্‌লে—দেবতা, কারণ ছাড়া কি কার্য্য হয় ? আমি আমার প্রতিবেশীদের রোজ রোজ রুদ্ধকণ্ঠে শাসিয়েছি যে, জোর ক'রে তাদের অন্ন কেড়ে নিলে তারা আমার কি কত্তে পারে ? বাহুবলদীপ্ত হ'য়ে আমি তখন ভাবিনি যে, এ বাহুর গর্ব্ব বৃথা। তাই ভগবান্ বল্‌লেন,—দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি। রাজার বিলাস-প্রাসাদ নির্ম্মিত হচ্ছে, আমি তার পাথরের মিস্ত্রী, ভারী পাথর তুলে নিয়ে স্থান-

মাফিক বসাবার সময় হাত দুটো চাপা প'ড়ে গেল। দেখুন, পাপ ছাড়া তাপ নেই। এই ব'লে লোকটী আর্ত্তধ্বনি কত্তে লাগল। বৃদ্ধ পণ্ডিত লোকটাকে কয়েকটী সান্ত্বনাসূচক বাক্য ব'লে ব্রাহ্মণবেশী রাজাকে নিয়ে আর এক রাস্তায় চল্‌লেন। চল্‌তে চল্‌তে দূরে দেখতে পেলেন এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়েছে। খুব জোরে ছুটে তারা আগুনের সাম্‌নে এসে দেখেন, এক গৃহস্থের ঘর দুয়ার সব জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। গৃহস্থ হাহাকার করছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—ব্যাপার কি ? গৃহস্থ বল্‌লে,—দেখুন ঠাকুর, শিশুরা খেলার ছলে না জেনে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, এখন তাতেই আমার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হ'য়ে গেল, —বৃদ্ধ পণ্ডিত বললেন,—বল্‌তে পার, কেন এমন হ'ল ? গৃহস্থ বল্‌লে,—সে কথা আর বলতে পারব না ? আমি অর্থমদে মত্ত হ'য়ে প্রত্যহ অপরকে চিত্তদাহকর বাক্য-সমূহ বল্‌তাম। ভাবতাম না যে, এই দুনিয়াদারী দু'দিনের। আমার পাপ ছিল, তাই আজ এ চিত্ততাপ ভোগ কচ্ছি। বৃদ্ধ পণ্ডিত গৃহস্থকে সান্ত্বনাবাক্য ব'লে রাজাকে নিয়ে বিদায় হ'লেন। পথে যেতে যেতে রাজাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, এসব দেখে কিছু বুঝতে পাচ্ছেন ? রাজা চিন্তিত মনে বল্‌লেন, —তাইত' অতি সামান্য পাপে এদের এক এক জনের কি সাংঘাতিক সর্ব্বনাশ হচ্ছে, আমারো তাহ'লে পিত্তশূল রোগ কোনো পাপের ফলেই হ'য়ে থাক্‌বে। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্‌লেন,—মনের অগোচর পাপ নেই, সুতরাং কোন্ পাপে আপনি রোগের ক্লেশ ভোগ কচ্ছেন ; সেটা আপনিই ভাল বলতে পারেন। বৃদ্ধ

পণ্ডিত ছদ্মবেশী রাজাকে নিয়ে অপর এক পল্লীতে উপস্থিত হ'লেন। একটী অল্পবয়স্কা বিধবা তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, —মা, তুমি কাঁদছ কেন ? বিধবা মেয়েটী বল্ল,—আমি কাঁদব না ত' জগতে কে কাঁদবে বাবা ? সাতদিন হয় আমার এই শিশুটী জন্মেছে, কিন্তু আমার স্তনে দুগ্ধ নেই। তার উপরে তিনদিন হ'ল আমার স্বামী মারা গেছেন। আজ সকালে রাজার লোকেরা এসে আমার দুগ্ধবতী গাভীটিকে খাজনার দায়ে কেড়ে নিয়ে গেল। এখন আমি এই শিশুটাকে বাঁচাব কি ক'রে ? বৃদ্ধ পণ্ডিত আর কোনও সান্ত্বনা-ভাষণ উচ্চারণ কর্‌লেন না, রাজাকে নিয়ে তিনি অন্য এক পল্লীতে অপর এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌লেন। একটী বৃদ্ধ ও একটী বৃদ্ধা ঘরের কোণে ব'সে কাঁদছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—বাছারা, তোমরা কাঁদ্‌ছ কেন ? বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ব'লে উঠ্‌ল,—অত্যাচারী রাজার রাজ্যে বাস করি, আমরা কাঁদ্‌ব না ? শক্তি নেই যে, এ রাজার রাজ্য ত্যাগ ক'রে যাই, নইলে এই মুহূর্ত্তে দেশত্যাগী হতাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, —কেন হে, ব্যাপার কি ? বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমস্বরে ব'লে উঠ্‌ল, —আমাদের পাঁচটী ছেলে, সবাই জোয়ান, উপার্জ্জনক্ষম, কিন্তু রাজার নাকি প্রমোদ ভবন তৈরী হচ্ছে, কুলীর দরকার, তিনি পাইক দিয়ে জোর ক'রে বেগার খাটবার জন্য আমার ছেলেদের আজ মাসেক কাল হয় ধ'রে নিয়ে গেছেন, ছেলেগুলি দিনরাত সেখানেই খাটে, সেখানেই খায়, বেতন ত' কিছু পায় না, তাই গৃহেও আসে না। আমরা দুই বুড়ো-বুড়ী অন্নাভাবে

জর্জ্জরিত হ'য়ে এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা কচ্ছি। বৃদ্ধ পণ্ডিত কোনো সান্ত্বনাধ্বনি উচ্চারণ করলেন না। তিনি ব্রাহ্মণবেশী রাজাকে নিয়ে অন্য পল্লীর দিকে চললেন। একটা পর্ণকুটীরে একটী লোক কতক্ষণ পরে পরে খুব কাস্‌ছে আর কাঁদ্‌ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হে বাছা, কাঁদছ কেন? রুগ্ন লোকটী বললে,—দেখুন ঠাকুর, যে রাজ্যের রাজা দুশ্চরিত্র, সে রাজ্যে সুখ কোথায়? আমি কঠিন রোগশয্যায় প'ড়ে আছি, আমার অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা আমার প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা ক'রে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা কচ্ছে, আর এর মধ্যে কাল বিকেল বেলা রাজার পাইকেরা এসে আমার সতীসাধ্বী স্ত্রীকে জোর ক'রে ধ'রে রাজার বাড়ীতে নিয়ে গেছে। তিনি নাকি এক বিশাল প্রমোদ-উদ্যান রচনা করেছেন, সেখানে নাকি এক সহস্র সুন্দরী প্রমদা চাই। সেবাপরায়ণা সাধ্বী পত্নীর অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি কাঁদ্‌ছি ঠাকুর, নইলে আমি রোগের ক্লেশকে ক্লেশই মনে করি না। বৃদ্ধ পণ্ডিত কোনো সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ না ক'রে অন্য পল্লীর দিকে চললেন। একটী গৃহে একটী যুবতী রমণী এক একবার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে, এক একবার স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকে, এক একবার মূর্চ্ছাপন্ন হ'য়ে যায়। মুখ মলিন, কেশ আলুথালু, দৃষ্টি অর্থহীন, বসন অবিন্যস্ত, মেয়েটী অর্দ্ধোন্মাদগ্রস্ত। বৃদ্ধ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন,—কি মা, তোমার কিসের ক্লেশ? কেন তুমি এমন উদ্‌ভ্রান্ত? রমণী বললে—আহা আমার হাতে যদি একখানা ধারাল ছুরি থাকত? বৃদ্ধ পণ্ডিত বললেন,—কেন তা'হলে কি হ'ত? রমণী বললে—

তা'হলে আমি সেই ছুরিকা হয় নিজের বুকে বিদ্ধ ক'রে প্রাণ দিতাম, নয় অত্যাচারী রাজার বুকে বিঁধিয়ে তার প্রাণ নিতাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত বললেন,—কেন, রাজা তোমার কি করেছেন? রমণী বললে, কি করেছেন? কেন, কি করেন নাই? আমার কন্দর্পকান্তি স্বামীকে তিনি বিনা দোষে জোর ক'রে ধরিয়ে নিয়ে গেলেন। শুনেছি রাজার নাকি একটা অন্ধের যাদুঘর আছে। সেখানে শত শত ব্যক্তিকে চক্ষু উৎপাটিত ক'রে অন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। রাজা যখন প্রমোদ-উদ্যানে যাবেন, তখন এই সব অন্ধদের তামাসা দেখ্‌বেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত একটীও সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ করলেন না, কুটীরের বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়ালেন. ততক্ষণে পূর্ব্ব দিকে উষা-প্রকাশ হচ্ছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্লেন, —মহারাজ, কিছু বুঝতে পাচ্ছেন? রাজা নতমস্তকে স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত বললেন, ভগবান্ যে আপনাকে শুধু পিত্তশূলের ব্যারাম দিয়েই রেহাই দিয়েছেন, আপনি বুঝতে পার্চ্ছেন যে, এতে তাঁর কত করুণা, কত ক্ষমা প্রকাশিত হচ্ছে? রাজা তখনও নিঃশব্দে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্লেন,—মহারাজ, এ সকল অপরাধ যদি কেউ করে, তা'হলে তাকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ ক'রে হত্যা করলে কি শাস্তি কিছু অতিরিক্ত হয়? রাজা বল্লেন,—না ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধ পণ্ডিত বল্লেন,—তবে বুঝে দেখুন মহারাজ, আপনাকে কত কম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইহকালেই সব শাস্তি শেষ হ'য়ে গেল না মহারাজ, পরকালের জন্যও শাস্তি রয়েছে। যাতে সেই পরকালের অসহনীয় শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন, তার জন্য

অবিলম্বে ভগবানের করুণার শরণাপন্ন হোন্। জীবনে যত দোষ করেছেন, এখনো তার প্রায়শ্চিত্ত করুন। সংশোধনের এখনো সময় আছে মহারাজ।

দুয়াল্লী (ঢাকা)
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শব্দযোগ

ত্রিপুরা-মাঝিয়ারা-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—"চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র মতবাদের সংস্পর্শে আসিয়া বাবা ভুলিয়া যাইও না যে, তুমি শব্দযোগী, অনাহত নাদের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়াই তোমার সাধনা। যে নাদ অহর্নিশ তোমার অজ্ঞাতসারেই জগতের প্রতি বস্তুতে স্বতঃসমুত্থিত হইতেছে, তাহাতেই নিজস্ব ধ্যান লাগাইয়া রাখা তোমার তপস্যা। ইহাই প্রেমবস্তুর পরমাস্বাদ লাভ করিবার সর্ব্বোত্তম পন্থা। প্রথম শুষ্ক মনে হইতে পারে, কিন্তু সাধনাই সিদ্ধির জন্মদাত্রী,—দার্শনিক যুক্তিবিচার-বিতর্কাদি নহে। এই কথাটী স্মরণে রাখিয়া একাগ্র মনে নামের সাধনা করিয়া যাও, নামই তোমার জন্য অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিবে।"

"জগতের প্রতি বস্তু শ্রীভগবানকে স্বতঃই যে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, তোমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও তাহাই নিয়ত উচ্চারণ করিতেছে। অনাহত মহাধ্বনি নিয়ত যে প্রেমমাখা নামের স্মৃতি তোমার ভিতরে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতেই অহর্নিশ চেতনা যুক্ত করিয়া রাখ।"

"জগতের যত ধ্বনি, সকলের মধ্যে যাহা সামান্য বা common factor, তাহাই ওঙ্কার। জগতের যত ধ্বনি, সকলের মিলনের যাহা ফল, তাহাই ওঙ্কার। G. C. M. ও L. C. M. উভয়ই প্রণব। তত্ত্বটা গভীর চিন্তা দ্বারা যতটা না বুঝিবে, নির্ব্বিচারিত চিত্তে একাগ্র মনে সাধন করিতে করিতে তাহার চাইতে সহস্র গুণ অধিক বুঝিবে। বাহিরের শত কলরোল উপেক্ষা করিয়া নির্ভয়ে উপদেশ পালন করিয়া যাও। পরমাত্মার পরমকৃপার প্রভাব তোমাদের জীবনে আপনি প্রস্ফুটিত হইবে।"

বালক ও স্ত্রীলোকদের প্রণবে অধিকার

নোয়াখালি-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"বালকেরা ও স্ত্রীলোকেরা ওঙ্কারের তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা কাণেই শুনিয়া যাও, তাহা লইয়া তর্ক চালাইয়া সময় নষ্ট করিও না। আজিকার তরুণ কালিকার প্রৌঢ়। তরুণকে যদি প্রণবতত্ত্বে অধিকার না দাও, প্রৌঢ়ও ত' অলব্ধপ্রবেশই থাকিবে। আট বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণের ছেলেগুলিকে উপবীত-সংস্কার দেওয়া হইতেছে। এই প্রথা আজিকার কোনও নব্য প্রবর্ত্তন নয়। এই প্রথা ভারতীয় আর্য্য সমাজের সৃষ্টি-পুষ্টির গোড়া হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বালকেরা প্রণব-তত্ত্ব, গায়ত্রী-তত্ত্ব বুঝিবে না যুক্তিতে আজ পর্য্যন্ত ত' কোনও জ্ঞানী গুণী এই প্রথার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন নাই। প্রণব উচ্চারণ করিবে না, গায়ত্রী পাঠ করিবে না, এমন যজ্ঞসূত্র-

সংস্কার কোথাও দেখিয়াছ ? আট বছর বয়সের ব্রাহ্মণের ছেলে যাহা পারিবে, এই যুগে সেই বয়সের একটী কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা বৈশ্যেতর জাতির ছেলে তাহা পারিবে না বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কি হেতু থাকিতে পারে ? পাঠশালে, স্কুলে বা কলেজে ত' ব্রাহ্মণের ছেলেদিগকেই সর্ব্বদা প্রথম হইতে দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে সব সময়ে ত' ব্রাহ্মণের ছেলেরাই বৃত্তি লাভের গৌরব অর্জ্জন করে না। বরঞ্চ বহু ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের ছেলেদের পশ্চাতে ফেলিয়া কখনো কখনো মেয়েরাই পরীক্ষায় প্রথম বা অতি প্রশস্ত স্থান সমূহ অধিকার করিতেছে, ইহা ত' আজিকার দিনে একান্ত বিরল ঘটনা নহে। বিজ্ঞানের ক্লাসে শব্দতত্ত্বের অধ্যয়নে ইহারা কেহই অপারগ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কিন্তু মন্ত্রতত্ত্বের বেলাই স্ত্রীলোক হইলে বা ব্রাহ্মণের ছেলে না হইলে একেবারে অযোগ্য অধম হইয়া যাইবে, এইরূপ যুক্তি বিচারসহ নহে। গোড়া হইতে শিক্ষা দেবার চেষ্টা থাকিলে যে-কোনও পুরুষ বা নারীকে প্রণবতত্ত্বে পারঙ্গম করা সহজসাধ্য। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণের পরিবারে মন্ত্রতত্ত্বের সর্ব্বদা আলোচনা হেতু ব্রাহ্মণ বালক অতি সহজে প্রণবতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিত। এই জন্যই আট বৎসর বয়সেই তাহাকে উপবীতী করা হইত। ক্ষত্রিয় সংসারে অস্ত্রশস্ত্রাদির চর্চ্চার আনুকূল্য অধিক হইত বলিয়া ইহা অপেক্ষা একটু বেশী বয়সে তাহাদিগকে উপবীতী করা হইত। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সহিত নানা ভাবে ব্রাহ্মণ-পরিবার-সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতা অধিক থাকার হেতুতে বৈশ্য-সন্তান অপেক্ষাও অল্প বয়সে ক্ষত্রিয় সন্তান গায়ত্রী-

দীক্ষার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বৈশ্য-পরিবারের সহিত ব্রাহ্মণ-পরিবার-সমূহের সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ না হওয়াতে এবং বৈশ্যপুত্রের স্বাভাবিক প্রতিভার উপরেই তাহার মন্ত্রতত্ত্ব আয়ত্ত করার কুশলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিত বলিয়া তাহাকে বলিতে গেলে পূর্ণ বয়স্ক হইয়াই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণ-সন্তান ও ব্রাহ্মণেতর-সন্তানগণের উপবীতকালীন বয়সের এই পার্থক্যের মূল কারণ তাহাদের পারিবারিক সংস্কারের পার্থক্য। জন্মপ্রভাব (Heredity) নহে প্রতিবেশ-প্রভাবের (environment) পার্থক্য হইতেই যজ্ঞসূত্র গ্রহণের বয়সের পার্থক্য উৎপন্ন হইয়াছে। শূদ্রগণের উপরে ব্রাহ্মণগণের প্রভাব তথা তপঃসাধন-সম্পর্কিত প্রতিবেশ-প্রভাব অতি অল্পই বিস্তারিত হইতে পারিতেছিল। এইজন্য তাহাদিগকে ব্রহ্মদীক্ষায় দীক্ষিত করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। উদ্দেশ্যের প্রতি তাকাইয়া প্রথার বিচার করিও। আজ সেই ব্রাহ্মণ কোথায়, সেই ক্ষত্রিয় কোথায়, সেই বৈশ্য কোথায় ? আচারে ব্যবহারে, বাক্যে, চিন্তায়, তেজে, তপস্যায়, কয় লক্ষ পরিবার খুঁজিলে একজন ব্রাহ্মণ মিলিবে ? গালি দিবার জন্য বলিতেছি না, সত্যনির্দ্ধারণের জন্য বলিতেছি। আজ যদি ভারত খুঁজিয়া ব্রাহ্মণ না পাও, তাহা হইলে গতি আছে দুইটী। এক গতি তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সন্তানদেরই ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিয়া তাহাদের প্রণীত-কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করা। দ্বিতীয় গতি আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী ও প্রণবের পবিত্র অধিকার আয়ত্ত করিবার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিবার চেষ্টা করা। প্রথম পন্থাও যে নির্দ্দোষ হইবে, তাহা নহে। ব্রাহ্মণাচার-বর্জ্জিত

ব্যক্তিকে ত' ব্রাহ্মণ বলা যায় না। গুরুতর অপরাধ-সমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা পুরাকালে বহু ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট, পতিত ও নিম্নজাতির অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যাঁহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া সগর্ব্বে পরিচয় দিতেছেন এবং জুতার দোকান, চর্ম্ম-ব্যবসায়, মাংস-বিক্রয়, শৌণ্ডিকালয় প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিলেও তাঁহাদের পুত্রদিগকে কি বলিয়া পূজা করা হইবে ? যদিও শত সহস্র অব্রাহ্মণ-সন্তান ভিন্ন দেশে গিয়া অপরিচিত সমাজের মধ্যে নিজের গাইগোত্র ব্রাহ্মণোচিত ভাবে প্রকাশ করিয়া কৌশলে ব্রাহ্মণ-সমাজের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভারতাক্রমণকারী অহিন্দু ক্ষত্রিয়গণের পুরোহিতগণ স্বীয় যজমানদের হিন্দুধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত ব্রাহ্মণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, তথাপি অতি মাত্রায় আর্য্যামির বড়াই করিয়া যাঁহারা অন্তরে সুখ পান, তাঁহাদের অভিমানে আঘাত করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিবার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু আজিকার চর্ম্ম-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের পুত্র, আজিকার সুরা-বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণের পুত্র কি করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অধিকারী হইবেন ? ইহা কি একটা সমস্যা নহে ? প্রতিবেশ-প্রভাব প্রতিকূল বলিয়াই না আজ তাঁহার পিতাকে গলায় পৈতা দোলাইয়াও ব্রাহ্মণের অশোভন উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে হইতেছে ? সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে দ্বিতীয় পন্থার আশ্রয় লইতে হয়। যাঁহারা সত্যই ব্রাহ্মণ হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অনুকূল প্রতিবেশ প্রদান করিবার জন্যই আচণ্ডাল-

ব্রাহ্মণকে ওঙ্কারের মহামন্ত্র গানে ঐক্যতান-বদ্ধ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা পাইতে পাইতে যাহাদের পূজাপ্রাপ্তির লালসা অনন্ত আকাশকে ছাড়াইয়াও লতা বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের পূজা চাহিবার যোগ্যতা বর্দ্ধনের জন্যই সর্ব্বজাতির প্রণব-সাধনার মধ্য দিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রতিপক্ষকে ইহা বুঝাইতে না পার, ক্ষতি নাই। তর্কের পথে জমার অঙ্ক একটীও আসিবে না, তর্ক ছাড়িয়া নীরবে নিজের কাজ করিয়া যাও. যাহারা সম্মানাতুর, তাহাদিগকে সম্মান দাও, অসম্মান করিও না ; ব্রাহ্মণসন্তানদের চিরপ্রাপ্ত মর্য্যাদায় আঘাত হানিয়া তাহাদের মনকে বৃথা-তিক্ত এবং সুখকে বৃথা-কটু করিও না। পাগলেরও আপন-বুঝ খাঁটি। নিজের বুঝ ষোল আনা বুঝিয়া চল।"

কোন্ ব্যক্তি চোর

কিশোরগঞ্জ-(ময়মনসিংহ)-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"কয়েকটা বিষয়ে আমার ধারণা তোমাকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া রাখি। যে শিক্ষক ছাত্রদের কাছ হইতে বেতন লয় অথচ প্রাণপণ যত্নে ছাত্রদের শিক্ষা দানের চেষ্টা করে না, আমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি চোর। যে উদ্যান-স্বামী উদ্যান-রোপিত ফলবৃক্ষের মূলদেশে সার প্রয়োগ করে না, অথচ বৃক্ষজাত ফল অনায়াসে আহরণ করে, আমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি চোর। যে রাজা প্রজার নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব গ্রহণ করে, অথচ প্রজা-সাধারণের ভূমির উন্নতি, কৃষির উন্নতি ও পশুপালের উন্নতি সাধনের জন্য

প্রযত্নশীল হয় না, আমার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি চোর। যে ব্যক্তি মাতৃস্তন্য পান করিয়া বড় হইয়াছে, অথচ মাতৃজাতির মঙ্গলকল্পে সমগ্র জীবনে কোনও সৎকার্য্য করে নাই, আমার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি চোর। চোরের অন্ন খাইলে চোর হইতে হয়।"

আত্ম-বিলোপ

লাকসাম (ত্রিপুরা)-নিবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের সেবায় আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহি। আমার এই আত্মবিলোপমূলক সেবার কাহিনী জয়ঢক্কা-নিনাদে জগতের কাছে প্রচারিত হইতে দিবার আমার কামনা নাই। তোমাদের যাহার সহিত যেভাবে আমার নিভৃত প্রেম জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধুর কাহিনী তোমাদের বক্ষে আর আমার বক্ষেই লুকাইয়া থাকুক। তোমাদের মধ্য দিয়া আমি আমার প্রাণারাধ্য দেবতার অর্চ্চনা করিতেছি। এই জন্যই আমি আমার প্রেমের কথা বিপুল ভুবনে বলিয়া বেড়াইতে চাহি না। তোমরাও পারিলে স্বস্থ হইও। যে যাহা বুঝিয়াছ, জানিয়াছ, অন্তরে লুকাইয়া রাখ। মানুষের সহিত ব্যবহারে সাধারণ মানুষের মতই থাক এবং রাখ, অন্তরের অবদানে তোমরা অতিমানব হও।"

দুয়াল্লীর বক্তৃতা

অপরাহ্ন আড়াই ঘটিকার সময়ে একটী সভার অনুষ্ঠান হইল। চারিদিকের পাঁচ ছয় খানা গ্রাম হইতে বহু যুবক আসিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতার পরে সভাভঙ্গ হইল।

পবিত্রতাই পূর্ণতা

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —পবিত্রতাই পূর্ণতা নির্লোভতাই ঋষিত্ব। তোমরা পবিত্র হ'তে যত্নবান্ হও। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই যথার্থ সৌন্দর্য্য। বাইরের স্বরূপতা রূপ নয়। ভিতরের স্বরূপতাই রূপ। সেই রূপে তোমরা রূপবন্ত হও। ভগবানের নিকটে এইটাই তোমাদের প্রার্থনা হোক,—"হে ভগবান, অন্তর আমাদের স্বচ্ছ কর, সুন্দর কর, পবিত্র কর।" বিশ্বাস কর, পবিত্রতাই সকল গুণের সেরা, এই একটী মাত্র সদ্‌গুণ থাক্‌লে জগতের অন্য সকল গুণ থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। অথবা সত্য ক'রে বলতে হ'লে একথাই বলতে হয় যে, পবিত্রতার যদি অধিকারী হ'তে পার, তাহ'লে নিখিল গুণগ্রাম আপনি তোমাকে আশ্রয় কর্ব্বে। এই জন্যই বলেছি পবিত্রতাই পূর্ণতা।

দৈহিক ও মানসিক নিষ্পাপতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —অনেক ক্ষেত্রেই দৈহিক মানসিক পবিত্রতার সহায়ক এবং সকল ক্ষেত্রেই মানসিক পবিত্রতা দৈহিক পবিত্রতার প্রণোদক। দেহকে পাপ থেকে যে সযত্নে বিরত রেখেছেন মনকে পাপ থেকে বিরত রাখা তার পক্ষে সহজসাধ্য। আবার, মনকে যে পাপ থেকে বিরত রেখেছে, দেহকে পবিত্র রাখা তার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। সুতরাং দৈহিক নিষ্পাপতাকে অনাবশ্যক জ্ঞানে উপেক্ষা ক'রো না। দেহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিয়োজিত ক'রে মানবজন্ম সার্থক করার পক্ষে দৈহিক নিষ্পাপতা

এক অত্যাবশ্যক সর্ত্ত। যে দেহ যত নিষ্পাপ, সে দেহ ভগবৎ-কার্য্য সম্পাদনে তত অধিক যোগ্য।

পবিত্র দেহেই পবিত্র মনের বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —বুদ্ধিবিভ্রম বশতঃ অতীতে যদি পবিত্রতা থেকে স্খলিত হ'য়ে থাক, তার জন্য হতাশ ভগ্নোদ্যম কেউ হ'য়ো না। অতীতকে বিস্মৃত হ'য়ে এই মুহূর্ত্ত হ'তে অনাগত কাল জুড়ে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ থাক্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হও। তোমাদের এই প্রশংসনীয় চেষ্টার পথে তোমরা অনেক ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাবে, যারা বলবে,—''দেহ তথাকথিত পাপে লিপ্ত থাক্‌লে কি হয়, মনের ভিতরে আমরা এমন বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রে যাচ্ছি, যাতে কোনো গ্লানিই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ কত্তে পাচ্ছে না, কোনও তথাকথিত অবৈধ আচরণই আমাদের আভ্যন্তর শুদ্ধতাকে টলাতে পাচ্ছে না।'' তাদের কথায় কর্ণপাত ক'রো না। শরীর যার রিপুর দাস, মন তার রিপুর প্রভু হবে, একথা তোমরা বিশ্বাস ক'রে ঠ'কো না। পবিত্র মনকে পবিত্র দেহেই বাস কত্তে দাও, অপবিত্র দেহে পবিত্র মনকে বাস করতে দেওয়ার কসরতে তোমরা প্রবৃত্ত হ'য়ো না।

মাতৃচিন্তা পবিত্রতার পরিপোষক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —এই ক্ষুদ্র পল্লীতে একদিন আমার পরমপূজ্যা জননীদেবী ভূমিষ্ঠা হ'য়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে এই পল্লীর প্রত্যেকটী ধূলিকণা আমার নিকটে তীর্থরেণুর অধিক পবিত্র। সেই জন্যেই আজ আমার প্রাণে পবিত্রতার সুগভীর

আলোড়ন অনুভব কচ্ছি। দেখ বন্ধুগণ, দেখ পুত্রগণ, মাতৃচিন্তার মত পবিত্রতার পরিপোষক কোনও চিন্তা এ জগতে নাই। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জননীকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র মানব-বিগ্রহ-রূপে চিন্তা কত্তে অভ্যাস কর এবং মাতৃচিন্তার ফলস্বরূপে মনে যে কৃতজ্ঞতা-কোমল সুমধুর ভাবের উদ্ভব হয়, নিখিল জগতে সেই অপূর্ব্ব ভাবকে সম্প্রসারিত কর। কে আছে জগতে এমন পাষণ্ড নারকী, মাতৃক্রোড়ে উপবেশন ক'রে যে কুচিন্তা কত্তে সমর্থ হয় ?

জননী ও দেশাত্মবোধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —জগতে দুইটী ভাব সর্ব্বজন-সমাজে বড় সমাদৃত। একটী দেশাত্মবোধ, অপরটী ভগবৎ-প্রেম। প্রথমটী রাজসিক উন্নত ভাব, দ্বিতীয়টী সাত্ত্বিক উন্নত ভাব। কিন্তু দেশকে যে দেশ-মাতৃকা বলে, সে শুধু নিজ জননীর সঙ্গে তুলনা দিয়ে। জননীর প্রতি অঙ্গ যেমন সন্তানের নিকট আদরণীয়, জননীর সঙ্গে তুলনা দিয়েই দেশপ্রেমিক কল্পনা করে যে, স্বদেশের প্রত্যেকটী অংশ দেশবাসীর নিকট তেমনি আদরণীয়। মাতৃ-অঙ্কে বাস ক'রে শিশু একথা ভাবে না, ''আমি ত' জননীর পদপ্রান্তে বসে নেই যে, চরণ-যুগলের কোনও ক্ষতি হ'লে চঞ্চল হব।'' বরং সে ভাবে—''জননীর বক্ষে বা ক্রোড়ে বা অঙ্কে বা পদপ্রান্তে যেখানেই আমি থাকি, সমগ্র জননীই আমার ভালবাসার বস্তু; জননীর যে-কোন অঙ্গের যে-কোনও ক্ষতি হ'লে সে ক্ষতি আমারই ক্ষতি।'' জননীর সঙ্গে তুলনা দিয়েই দেশ-প্রেমিক

ঠিক তেমনি চিন্তা ক'রে থাকেন, —''আসাম, বঙ্গ, উড়িষ্যা, বম্বে, বিহার, মদ্রদেশ, আগ্রা কিম্বা অযোধ্যা, পাঞ্জাব কি সিন্ধুদেশ, সব নিয়ে আমার ভারতজননী, তাঁর বিশাল অঙ্গের যে অংশেই আমি ঠাঁই পেয়ে থাকি না কেন, অপর যে কোনও অংশের ক্ষতি হ'লে সে ক্ষতি আমারই ক্ষতি। দেশাত্মবোধের এইরূপ নির্ম্মল প্রেরণায় কত কত নরনারী আমৃত্যু লাঞ্ছনাকে হাসিমুখে সহ্য ক'রে যায়, কত কত নরনারী যন্ত্রণাপ্রদ মৃত্যুকে দেশমাতৃকার স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞান ক'রে তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করে। পৃথিবীর কোন্ দেশ আছে, যেখানে দেশপ্রেমিকের সম্মান নাই ? পৃথিবীর কোন্ জাতি আছে, যে জাতি দেশপ্রেমিকের পূজা করে না ? ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা সকল দেশে দেশপ্রেমিকের জন্য পূজার অর্ঘ্য সজ্জিত আছে; অথচ দেশকে মায়ের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় ব'লেই দেশের ডাক এমন অলঙ্ঘনীয় আহ্বানে পরিণত হয়। ভেবে দেখ, মা কেমন বস্তু।''

জননীর নিকট জগতের আধ্যাত্মিক ঋণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভগবৎ-সম্বন্ধীয় আমাদের যতগুলি চিন্তা, তার অধিকাংশ আমাদের মায়ের তুলনায় অনুশীলন কত্তে হয়েছে। ভগবান্ প্রেমময়, স্নেহময়, কৃপাময়, ক্ষমাময় এই কথা শুনে ভগবানের মহিমা উপলব্ধি কত্তে শিক্ষা করার বহু পূর্ব্বে আমাদিগকে জননীর প্রেম, জননীর স্নেহ, জননীর ক্ষমা ও জননীর করুণার আস্বাদন কত্তে হয়েছে। ভগবানকে স্নেহময়

ব'লে বিশ্বাস কত্তে উপদিষ্ট হওয়ার বহু পূর্ব্বে আমরা প্রত্যেকে শত শত স্নেহময়ী জননীকে নিজ সন্তানের জন্য আকুল বাৎসল্যভাবে অনুপ্রাণিত হ'তে দেখেছি। দেখেছি আমরা, মা কেমন সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে স্তন্যপীযূষ পান করান। দেখেছি আমরা মা কেমন নিজে না খেয়ে ক্ষুধিত সন্তানকে আহার করান। দেখেছি আমরা, মা কেমন সমগ্র রজনী জেগে থেকে রুগ্ন সন্তানের শুশ্রূষা করেন। দেখেছি আমরা, সহস্র অপরাধে অপরাধী সন্তানকে মা কেমন অম্লান বদনে ক্ষমা করেন। মায়ের তুলনায় আমরা ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করতে শিখেছি। ঈহুদীদের একটী প্রবচন আছে,—''ভগবান্ ত' সব স্থানে যেতে পারেন না, তাই তিনি সবস্থানে থাকার জন্য জননীদের সৃষ্টি ক'রেছেন।'' অবশ্য ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু ঈহুদী প্রবচনের অর্থ হচ্ছে এই যে, মায়ের ভিতরেই ভগবানের স্নেহ-করুণ ক্ষমার পার্থিব প্রকাশ। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে আর কে বাস্‌বে ? পিতা সন্তানকে পরিত্যাগ করতে পারে, ভ্রাতা-ভগিনী নিদারুণ শত্রুতে পরিণত হ'তে পারে, স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ কত্তে পারে, বন্ধু বন্ধুকে বিষপান করাতে পারে, আত্মীয়-কুটুম্বেরা অনাত্মীয় অকুটুম্ব হ'তে পারে, কিন্তু মা সকল অবস্থাতেই মা। কোনও অবস্থাতেই মায়ের স্নেহের হ্রাস নাই, মায়ের করুণার সীমা নাই, মায়ের ক্ষমায় কার্পণ্য নাই। মায়ের এই অপার অসীম গুণাবলির তুলনা দিয়েই জগতের অধিকাংশ ভগবদ্ভক্তের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা সৃষ্ট, পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। যাঁরা সখাভাবে বা কান্তভাবে ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদেরও

প্রাথমিক ধারণা মায়ের চরিত্র ও গুণ অবলম্বনেই গঠিত হয়েছে। যাঁরা ভগবানকে দণ্ডবিধাতা, শাসনকর্ত্তা, অন্যায়ের প্রতিকারকারী, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, মহারুদ্রতেজা স্বরূপে উপাসনা করেন, তাঁরাও তার ক্ষমাশীলতার কথা বর্ণনা কত্তে গিয়ে এমন সব উক্তি ক'রে থাকেন, যে উক্তি-সকল শ্রবণ করলে জননীর ক্ষমার কথাই মনে পড়ে। অতএব, অন্যে এ কথা স্বীকার করুক আর না করুক, আমি বজ্রকণ্ঠে বল্‌ব, জননী জগতের ভগবদ্‌ভক্তির মূল। পৃথিবীর কোন্ দেশ আছে, যেখানে ভগবদ্‌ভক্তের পূজা নাই ? পৃথিবীর কোন্ জাতি আছে, যে জাতি ভগবদ্‌ভক্তকে সসম্ভ্রমে প্রণতি না করে ? চিন্তা ক'রে দেখ, মায়ের কাছে আধ্যাত্মিক ভাবেও জগৎ কত ঋণী।

সামাজিক জীবনে মায়ের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নেপোলিয়ান বলেছেন,—The future destiny of the child is always the work of the mother (সন্তানের ভবিষ্যৎ মায়ের শ্রমের উপরেই নির্ভর কচ্ছে)। এমার্সন বলেছেন,—Men are what their mothers made them (মায়েরা যেমন গড়ে, দেশের মানুষগুলি তেমনি হয়)। অর্থাৎ সমাজগঠনের মূলে মায়ের কৃতিত্বই সর্ব্বাধিক। একদিন সম্রাট নেপোলিয়ান ম্যাদাম ক্যাম্পানকে (Campan) জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—ফ্রান্সের যুবকদের সুশিক্ষা বিধানের জন্য কি প্রয়োজন ? ম্যাদাম ক্যাম্পান তার উত্তরে বলেছিলেন,—ভালো মা। এই উত্তরে মুগ্ধ হ'য়ে নেপোলিয়ান বলেছিলেন,—Here

is a system in one word, তুমি একটী কথায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার কথা বলে দিলে। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সহস্র সহস্র বালবিধবার বৈধব্য-দুঃখে বিগলিত হ'য়ে একটা সম্পূর্ণ বিরোধী সমাজের মাঝখানে পূর্ণ বলিষ্ঠতায় একটা অপ্রত্যাশিত ও অভিনব আন্দোলন চালিয়ে গেলেন, তার পশ্চাতে ছিল, তাঁর পুণ্যগর্ভা জননী ভগবতী দেবীর একটী ক্ষুদ্র অশ্রু-বিন্দু। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি তোমাদের সমক্ষে প্রমাণিত কত্তে পাত্তাম যে, সামাজিক জীবনের পূর্ণ কুশলের পশ্চাতে মায়ের শক্তি কেমন ভাবে কাজ করে। কিন্তু সে কথা বলার চেয়েও বড় কথা আমার আছে।

জননীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —হে শ্রোতৃবৃন্দ, জননীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে দেহের তথা মনের পবিত্রতা প্রদান কর্ব্বে। এই কৃতজ্ঞতা প্রকারান্তরে তোমার দেশাত্মবোধ ও ভগবদ্‌ভক্তি পরিবর্দ্ধিত কর্ব্বে। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে ইহকালের তৃপ্তি এবং পরকালের শান্তি সংগ্রহ ক'রে দেবে। এস, আজ আমরা ভক্তি-ভরে এই কথা ব'লে প্রণাম করি,—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

২১ কার্ত্তিক, ১৩৩৯

বেলা আট ঘটিকায় দুয়াল্লী ও দিঘলী গ্রামের বহু যুবকই

নানা বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

স্বাবলম্বন কাহাকে বলে

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —স্বাবলম্বন কথার মানে হচ্ছে নিজের কাজ নিজে করা, নিজের কাজ নিজে দেখা, পরের উপরে নিজের কাজের ভার না দেওয়া, পরের চোখে নিজের কাজ না দেখা। যে যতটা পার নিজের অভাব নিজে মোচন কর, তোমার অভাব মোচনের জন্য অপরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় ব'সে থেক না। তোমরা দুঃখের প্রতীকার, তোমার অভাবের বিদূরণ ভগবান্ এসে ক'রে দেবেন ভেবে ভগবানের উপরেও ভার দিও না। ভগবান্ ত' সব কিছুই কত্তে পারেন, কিন্তু তবু তিনি কত কিছু করার ক্ষমতা তোমাকে দিয়েছেন। সেই ক্ষমতার তুমি সদ্ব্যবহার কর, এটা নিশ্চয়ই ভগবানের অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায় না থাক্‌লে তোমাকে সে সব ক্ষমতা তিনি দিতেন না। সত্য বটে তোমার সকল ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ কিন্তু ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার পূর্ণ সৎপ্রয়োগে যে ক্ষমতার পরিমাণ বাড়ে, একথাও ত' প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, ভগবদ্দত্ত ক্ষমতাগুলি মঙ্গল-কর্ম্মে ব্যবহার ক'রে কাজে লাগাও, এটা ভগবদভিপ্রায়। অহঙ্কৃত হ'য়ে তুমি নিজেকে যত শক্তিমান্ মনে কর, তুমি তত শক্তিমান্ নও, এই হ'ল তোমার ক্ষমতার সীমা। আবার, হতাশ নিরাশ হ'য়ে মানসিক দুর্ব্বলতার-প্রভাবে তুমি তোমাকে যত অক্ষম, যত ক্ষীণবীর্য্য মনে কর, তুমি তত অক্ষম ও ক্ষীণবীর্য্য নও। এই হ'ল তোমার ক্ষমতার বিশেষত্ব। ভগবানের কাছে বিপৎকালে তুমি যে সাহায্য

প্রার্থনা কর, সেই সাহায্য লাভের অধিকাংশ শক্তি তিনি জন্ম থেকেই তোমার ভাণ্ডারে দিয়ে রেখেছেন। এ কথা বিশ্বাস করার নামই আত্মবিশ্বাস।

ভগবদ্বিশ্বাস কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ক্রমওয়েল বলেছিলেন, —Trust in God but keep your powder dry,—ভগবানে বিশ্বাস কর, কিন্তু বন্দুকের বারুদ শুষ্ক রাখ। ভগবানে বিশ্বাস রাখার মানে এই নয় যে, আমি বেলা দশটা পর্য্যন্ত প'ড়ে ঘুমুব, আর ভগবান্ আমার চায়ের জল গরম ক'রে দেবেন। ভগবান্ যে মঙ্গলময়, একথা বিশ্বাসের নামই ভগবদ্বিশ্বাস। জীবন-ব্যাপী দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ, বিঘ্ন-বিপত্তি প্রভৃতির ভিতর দিয়েও তিনি আমাকে তাঁর চরণের সমীপস্থই ক'রে নিচ্ছেন, এইরূপ বিশ্বাসের নামই ভগবদ্বিশ্বাস। তাঁর প্রদত্ত শক্তিকে আমি দুঃখ-দৈন্য-বিদূরণে, অভাব-অভিযোগ-বিমোচনে, বিঘ্ন-বিপত্তি নিরাকরণে ব্যবহার কর্ব্ব না, সব তিনি ক'রে দেবেন ব'লে তাঁর ঘাড়ে আমার সকল কর্ত্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত অলস জীবন যাপন কর্ব্ব, এর নাম ভগবদ্‌বিশ্বাস নয়।

ভগবদ্‌বিশ্বাসীর লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভগবদ্‌বিশ্বাসীর আদোষদর্শী চক্ষু সর্ব্বত্র ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায়কে দর্শন করে। ভগবদ্‌বিশ্বাসী ব্যক্তি ভগবৎ প্রদত্ত শক্তিকে ন্যস্ত ধনের মত যত্নে রক্ষা করেন

এবং সদ্ব্যবহারের দ্বারা তাকে বর্দ্ধিত ক'রেও মূলধনের মালিককেই সমগ্র ধনের মালিক ব'লে জ্ঞান করেন। ভগবদ্‌বিশ্বাসী ব্যক্তি পাপী অথবা পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক অথবা অসাধুচরিত্র সকল ব্যক্তিকে ভগবানের সন্তান জ্ঞান ক'রে সমান প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন এবং উভয় শ্রেণীর লোকের প্রতি শুধু কর্ত্তব্য-বোধে প্রয়োজন-স্থলে ব্যবহারের তারতম্য করেন। ভগবদ্‌বিশ্বাসী ব্যক্তি ভগবৎপ্রদত্ত আত্মশক্তিতে আস্থাবান্ থাকেন, এই শক্তিকে শুদ্ধ, পবিত্র, অন্যায়-বর্জ্জিত, পাপ-প্রসক্তি-মুক্ত রাখ্‌বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সর্ব্বদা এই শক্তিকে ভগবৎ-সেবায়, নিজ-হিত-সাধনে ও পরহিত-সম্পাদনে নিয়োজিত রাখেন।

বর্ত্তমান জাতিভেদ উদ্দেশ্যহীন

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —একটী ছেলেকে বলা হ'য়েছিল বাজার থেকে সন্দেশ কিনে আন্‌তে। এজন্য তাকে পয়সাও দেওয়া হয়েছিল। আদেশ শুনেই কর্ম্মঠ ছেলেটি তীব্রবেগে বাজারের দিকে দৌড়ুল। কিন্তু কতটা পথ গিয়ে সে ভুলে গেল যে, কেন সে এত জোরে ছুটছে। ছোট্‌বার ক্লান্তি তার হচ্ছে, কিন্তু যতক্ষণ জীবনীশক্তি আছে, ততক্ষণ ছুটাও বন্ধ কত্তে পাচ্ছে না। এই ছেলেটীর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের ন্যায় অবস্থা আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদের। মানুষের মত মানুষ যাতে জন্ম গ্রহণ কত্তে পারে, তারই জন্য সমস্বভাব ব্যক্তিদিগকে এক-

একটা জাতির গণ্ডীতে আবদ্ধ করা হ'ল, কারণ, সমস্বভাব পিতার সাথে সমস্বভাব মাতার মিলনে ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট স্বভাব সন্তানের ভিতরে বিশিষ্ট হ'য়ে প্রকাশিত হয়। সমস্বভাব ব্যক্তিদিগকে এক শ্রেণীর জীবিকার ব্যবস্থাও সেই জন্যেই দেওয়া হ'ল। কিন্তু কদিন পরেই সবাই ভুলে গেল যে, এক একটা বিশিষ্ট প্রতিভা নিয়ে সুসন্তান জননের উদ্দেশ্যকে পুরুষানুক্রমিক ভাবে সফল করার চেষ্টা চালাবার জন্যই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ জাতিরও উৎকর্ষ কিছু হ'ল না, ক্ষত্রিয়েরও না, বৈশ্যেরও না। ফলে সব জাতি নামে বিভিন্ন হলেও এক শূদ্র জাতিতেই পরিণত হয়েছে।

সাধু-জীবন-যাপনের পন্থা

বেলা দশটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি দিঘলী গ্রামে আসিলেন। দুই ঘণ্টা কাল নানা স্থানে চিঠিপত্র লিখিলেন। তৎপরে সমাগত উপদেশার্থীদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —পরের নিন্দা করবে না, নিজের নিন্দা শুনে ক্রুদ্ধ হবে না, এটী সাধুজীবন-যাপনের পন্থা। অপরের অভিমানে আঘাত ক'রে কোনো অপ্রিয় কথা বল্‌বে না, কিন্তু নিজের অভিমানের উপরে আঘাত এলে আঘাতকারীর প্রতি বিরক্ত হবে না, এ'টি সাধুজীবন-যাপনের পন্থা। নিজে কখনো সম্মানের কাঙ্গাল হবে না, কিন্তু অপরকে সম্মান দান কত্তে কার্পণ্য কর্ব্বে না,—এ'টি সাধুজীবন-যাপনের পন্থা।

পরের কদাচার দেখিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —কেবল পরনিন্দাই বর্জ্জনীয়, তা' নয়, অন্যলোকের কদাচার দর্শন করা থেকেও দূরে থাক্‌তে হবে। অন্যলোকে কি পাপ করে, চুপি চুপি দেখার চেষ্টায় লাভ নেই এক কণাও, ক্ষতিই বরং ষোল আনা। অপরের পাপাভিনয় দেখতে দেখতে নিজের ভিতরে পাপানুষ্ঠানের লালসা জন্মে। কারণ, তুমি আমি অন্যকে যখন কিছু কত্তে দেখি, তখন নিজেদের অজ্ঞাতসারে ঐ লোকটীর সঙ্গে নিজেকে অনেক সময়েই একেবারে অভিন্ন ব'লে বোধ করি। ফলে তার কৃত কাজটুকু মনে মনে তোমার বা আমার কৃত কাজে পরিণত হ'য়ে যায়। ফুটবল্ খেলছে মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গল। তুমি দেখতে গিয়েছ। তুমি মনে মনে চাও না যে, গোলটা হোক। কিন্তু ইষ্টবেঙ্গলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সাংঘাতিক এক কিক্ ক'রে বস্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানের গোলরক্ষকের প্রতি সহানুভূতিতে তোমার হাত দুটো আকাশে উঠে গেল, যেন গোলটা তুমিই ঠেকাবে। ইতিমধ্যে গোলরক্ষক-অদ্ভুত নৈপুণ্যে বলটাকে দূরে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বলটা পড়ল গিয়ে ইষ্টবেঙ্গলের রাইট ইনের পায়ের কাছে। আমি কিন্তু চাচ্ছিলাম, ইষ্টবেঙ্গল গোলটা করুক। রাইট ইনের ভদ্রলোক শট্ মারেন কি না মারেন, আমার পাটা হঠাৎ নড়ে উঠ্‌ল, আর তুমি ছিলে আমার সামনে ব'সে, আমার পায়ের গুঁতো একেবারে তোমার পিঠের উপরে গিয়ে পড়্‌ল। বল, এরকম ঘটনা হয় কি না? হয়। সর্ব্বদাই হয়। কেন

হয়? কারণ, প্রদর্শক আর দ্রষ্টার মধ্যে একটা একত্বের সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছে। খুব মনোযোগ দিয়ে কোনো কিছু দেখতে গেলে এইরূপ সম্বন্ধ সকল ক্ষেত্রেই গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে। এই জন্য গোপনে কারো পাপানুষ্ঠান দেখতে নেই।

অম্বর মহারাজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এক সাধু ছিলেন, তার নাম ছিল অম্বর মহারাজজী। কোন্ দেশের লোক কেউ জানে না, কিন্তু বড় বিনয়ী আর ধর্ম্মনিষ্ঠ। লোকের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি অসাধারণ এবং কয়েকজন গুণবান্ শিষ্যও তাঁর এসেছে। শিষ্যদের প্রায় সকলেরই বয়স কাঁচা, সকলেই চিরতরে সংসার ছেড়ে এসেছে। প্রায় সকলেই বড় মানুষের ছেলে। প্রত্যেকের জন্য এক একটী আলাদা আলাদা কুঠী নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়া হয়েছে, যার যার শয়নঘর আলাদা, ভজন গুহা আলাদা, স্নানের ঘর আলাদা। প্রত্যেকটী কুঠীর চতুর্দ্দিকে নানা সুদৃশ্য লতাপাতার বাহার, কত সুরভি পুষ্পপাদপ। অম্বর মহারাজ যখন ধর্ম্মোপদেশ দেন, তখন সবাই তাঁর চরণ-সমীপে একত্র হয়। অন্য সময়ে যার যার কুঠীতে ব'সে কেউ ভজন গায়, কেউ ধ্যান করে, কেউ বা বেদান্তের টীকা-ভাষ্যের অনুলিপি করে। একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলের রান্না হয়, পাচকেরা সময়মত যার যার ঘরে তার তার খাবার দিয়ে আসে। অনেক লাখপতি ক্রোড়পতি সব অম্বর মহারাজের ভক্ত, সুতরাং টাকাকড়িরও অভাব নেই, আহারীয় সামগ্রীরও অনটন নেই। অম্বর মহারাজ সব সময়ে

নিজের ভাবেই থাকেন। ন-মাসে ছ-মাসে একবার কোনো শিষ্যের কুঠীতে পদার্পণ কর্ল্লে দু পাঁচ মিনিটের বেশী সেখানে বসেন না। সবাইকে কেবল উপদেশ দেন, পরনিন্দা ক'রো না, মিথ্যা কথা ব'লো না, ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ো না। বাস্। এর বেশী খবরদারী তিনি কারো করেন না, করার অবসরও নেই। তিনি সত্যিকারের সাধক, নিজের সাধনেই সদা বিভোর।

কিন্তু শিষ্যেরা কি এতটা স্বাধীনতা পাবার যোগ্য? কারো মনে লালসা এল ত' সে ভোগ্যবস্তুর চিন্তা কর্ত্তে লাগল, হুঁস নেই যে, অন্যায় করা হচ্ছে। কারো মনে লোভ এল ত' সে সঞ্চয় কর্ত্তে শুরু কল্ল, খেয়াল নেই যে, বিপদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কারো মনে ক্রোধ এল ত' সঙ্গে সঙ্গে চাকর-বাকর অনুজীবী-অভ্যাগত প্রভৃতি যে কারো সঙ্গে রাগারাগি হ'য়ে গেল, হিসাব নেই যে, নিতান্ত অশোভন ব্যাপার হচ্ছে।

একজন শিষ্য, নাম তার কপিঙ্গল। সে হঠাৎ এক তরুণীর প্রেমে পড়েছে। প্রথম প্রথম মঠের সীমানার বাইরে বনপথে সে সেই সুন্দরীর সাথে দেখা কর্ত্ত। যখন দেখলো কারো চোখে কিছু পড়ে না, তখন সে নূতন ফন্দী করল। মেয়েটীর নাম কপিলিকা। তাকে বল্ল,—শোনো কপিলিকা, তুমি আমার গুরুভাইদের কুঠীর চারপাশে রোজ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু সাবধান আমার কুঠীতে যখন ঢুকবে, তখন যেন কেউ না দেখতে পায়। মানেটা হচ্ছে কি জানো? কপিলিকা বল্লে,—কি এর মানে? কপিঙ্গল বল্লে,—শোনো, হঠাৎ যদি আমার কুঠীর ভেতরে কেউ তোমাকে দেখেই ফেলে, তাহ'লে তোমাকে তখন বলতে

হবে, অমুক সাধু তোমাকে তাড়া কর্ত্তে এসেছিল, তুমি আত্মরক্ষা করার জন্য আমার কুঠীতে ঢুকে পড়েছ,—আসলে কিন্তু তুমি আমাকে চেনও না, কখনো দেখা-শুনাও তোমাতে আমাতে হয় নি। কপিলিকা বল্লে,—বড্ড মিথ্যা কথা হবে যে। কপিঙ্গল বল্লে,—রাজদ্বারে, বিবাহে আর প্রণয়ের ব্যাপারে মিথ্যা বল্লে দোষ নেই। কপিলিকা বল্লে,—এতক্ষণে সব বুঝলুম।

কিন্তু মেয়েটীর মনে বড় খচ্‌খচ্ কর্ত্তে লাগল। সে ভাবল, সাধু জেনে কপিঙ্গলকে ভক্তি করেছি, বিশ্বাস করেছি, কোনও প্রকারে এঁকে বিবাহ ক'রে ঘর বাঁধতে পারি কি না, সে কথা ভাবছি, আর ইনি আমাকে এমন মিথ্যাই শেখাচ্ছেন, যাতে অন্য নিরপরাধ সাধুর নামে হবে দোষারোপ, কুৎসা। তবে ত' কপিঙ্গল সম্পর্কে আমাকে সাবধান হ'তে হবে। এককথায় আত্মদান আমি কর্ব্ব না প্রেমের কথা মুখে মুখে কত জনেই কত বলে, দুঃখের কষ্টিপাথরে তার পরীক্ষা না হ'লে কে কাকে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর্ব্বে? আমি সাবধান হব।

সাবধান হবার প্রতিজ্ঞা কর্ল্লে কি হয়, মানুষ অভ্যাসের দাস। নির্দ্দিষ্ট একটা নিরিবিলি সময়ে কপিলিকা আসে, কতক্ষণ বসে, কিছু কথাবার্ত্তা বলে, আবার সুযোগমত চলে যায়। কেবল ভাবে, বাপ-মাও জানলেন না, কপিঙ্গলের গুরুদেবও জানলেন না, কাজটা কি ভাল হচ্ছে? ভাল হচ্ছে না, বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু অভ্যাসকে জয় করাও যাচ্ছে না।

গোপন প্রেম চিরকাল গোপন থাকে না। এক-কাণ দু-কাণ কর্ত্তে কর্ত্তে একটা জনশ্রুতি অম্বর মহারাজের কাণেও গেল।

তিনি ভাবলেন—কুকথা যখন রাষ্ট্র হয়েছে, তখন কপিঙ্গলকে মঠ থেকে সরিয়ে দেওয়াই ভাল। তবে তার আগে একবার জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। তিনি কপিঙ্গলকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—বৎস, তুমি নাকি নারীতে আসক্ত হয়েছ ? কপিঙ্গল বল্লে,—না প্রভু, আমি কদাচ কোনো নারীতে আসক্ত হইনি, হবও না। অম্বর মহারাজ বল্লেন,—তোমার প্রতি কোনো নারী আসক্ত হয়েছে কি ? কপিঙ্গল কিছুকাল চিন্তিত ভাবে থেকে তারপরে বল্লে,—না প্রভু, আমার প্রতিও কোনো নারী কদাচ আসক্ত হয় নি।

—তবে এত সব কথা শুনছি কেন ?

—ও হো, তাই ত'। আপনি ভুল শোনেন নি প্রভু, তবে সবই অতিরঞ্জিত কথা শুনেছেন।

—মানে ?

কপিঙ্গল দুই একবার ঢোক গিলে তারপরে বল্লে,—মানে হচ্ছে, আমার গুরুভাইরা কেউ কেউ মেয়েটাকে পথে ঘাটে তাড়া করেছে। তখন মেয়েটা আত্মরক্ষার জন্য যার কুঠী সামনে পেয়েছে, তার কুঠীতেই ঢুকেছে। দু-একবার সে আমার কুঠীতেও ঢুকেছিল। আমি তাকে অভয় দিয়ে নিজ গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—সত্য বলছ ?

—আজ্ঞে হাঁ, এর একবর্ণও মিথ্যা নয়।

—বেশ, এর পরে সেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে ব'লে দেবে, সে যেন আমার মঠের চতুঃসীমানা দিয়েও না হাটে। বড় দুর্নাম হচ্ছে, সে দুর্নাম তোমারই হোক আর তোমার

সতীর্থদেরই হোক। দুটোই কলঙ্কজনক।

—আজ্ঞে হাঁ, আপনার আদেশ পালন কর্ব্ব। আমি তাকে ব'লে দেব, আর যেন সে না আসে।

—বেশ, যাও।

কিন্তু কপিঙ্গল উলটা পথ ধরল। কপিলিকাকে ডেকে ব'লে দিল,—শোনো কপিলিকা, আজ থেকে তোমাকে অভিনয় কত্তে হবে। আমি তোমাকে যেমন যেমন বলতে ব'লে দেব, তুমি তেমন তেমন ব'লে যাবে, যেন নাটকের নায়িকা সেজেছ।

—এর প্রয়োজন ?

—প্রয়োজন অনেক। পরে বুঝতে পার্ব্বে। গুরুদেব অম্বর মহারাজ সব টের পেয়েছেন। ঐ বুড়োটাকে ফাঁকি দেওয়া গেল না কিন্তু কৌশলে কাজ হাসিল কত্তে হবে।

—কিন্তু তুমি আমাকে বিবাহ কর্ব্বে ত ?

—হাঁ বিবাহ কর্ব্ব বই কি। তার আগে তুমি আমার হবে, তার পরে বিয়ে।

—না, ওতে আমি রাজি নই। বিবাহে তোমার সম্মতি হ'লে মা-বাবাকে জানাবো, অম্বর মহারাজের অনুমতি নেবো, প্রকাশ্য ভাবে গুরু, পুরোহিত, সামাজিকবর্গের সম্মুখে বিবাহ হবে, তারপরে আমি তোমার হব।

কপিঙ্গল বল্লে,—আচ্ছা, বেশ। তাই হবে। কিন্তু তুমি আমার আদেশ অনুযায়ী অভিনয়গুলি ঠিক ঠিক ক'রে যাবে, তারপরে একদিন বিবাহের সম্মতি দিব।

কপিলিকা বল্লে,—অভিনয়ের কোন্ প্রয়োজন, তা' বুঝতে

পাচ্ছি না। আর, শরীর দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কোনো অভিনয় কর্ব্ব না।

কপিঙ্গল বল্লে,—চ'খে, মুখে পুরো অভিনয় থাকা চাই। প্রতি কথায় তোমাকে প্রবল প্রণয় প্রদর্শন কত্তে হবে, যেন বুড়োটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভিরমি খেয়ে মরে।

—গুরুদেব ? কেন, এর মধ্যে তাঁর আবার কথা আসে কেন ?

—আসে গো আসে। তিনি বড় কড়া নজর রেখেছেন। আমরা কি করি না করি, তিনি অতি গোপনে সব দেখ্‌ছেন।

ছিঃ ছিঃ।

—ছিঃ ছিঃ নয় কপিলিকা। এসব হচ্ছে আসল কাজের কথা। তিনি সন্দিগ্ধ হয়েছেন। এখন তাঁর শাসন থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় একমাত্র হচ্ছে তাঁকে স্বস্থানচ্যুত করা। নিশ্চয়ই তিনি গোপনে ওৎ পেতে এখন থেকে সব দেখ্‌বেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর মনে বাসনা জাগবে। তাহ'লেই আমার কর্ম্ম সিদ্ধ হবে, পথ সুগম হবে।

অম্বর বাবার মন আকাশের মতনই সাদা, তিনি এসব নীচ ব্যাপারে নেই। তিনি উকি মারতেও এলেন না, গোপন খোঁজ নেবারও চেষ্টা কল্লেন না। কিন্তু কপিঙ্গলের সতীর্থদের চক্ষু-কর্ণ সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল।

এক এক জন এক এক দিন উকি মেরে কোনো একটা দৃশ্য দেখে যায় আর নিজ কুঠীতে ফিরে এসে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। এমন একটী সুন্দরী মেয়ে সেও কি পেতে পারে না ?

দেখতে দেখতে সমস্ত আশ্রমটী একটী অতি কদর্য্য কুস্থানের রূপ ধারণ কর্ল্ল, নরক দেখতে না দেখতে গুলজার হ'য়ে উঠ্‌ল।

আস্তে আস্তে অম্বর মহারাজ সবই জানলেন, সবই বুঝলেন। একদিন শিষ্যদের সবাইকে ডেকে বল্লেন, —আমার এই আশ্রম আজ ভেঙ্গে দিলাম। আমিও এই আশ্রম ছেড়ে এখনি চ'লে যাচ্ছি। বিষয়-সম্পত্তিতে আমার কোনও লোভ নেই। কোনও এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে বা পর্ব্বতের গুহায় গিয়ে ব'সে পড়্‌ব। তোমরা লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যায় না ক'রে যার যার অভিলাষ অনুযায়ী বিবাহ কর, ঘরে ফিরে যাও এবং পিতৃমাতৃসেবা কর। সাধুত্বের ভাণে আর প্রয়োজন নেই।

শিষ্যেরা বল্লে, আমাদের কি দোষ প্রভু, সেইটী ব'লে দিন। আপনি চ'লে গেলে ত' আমরা অনাথ হব।

অম্বর মহারাজ বল্লেন, —নিরাশ্রয় কেউ হবে না। সংসার আশ্রমও আশ্রম, কিন্তু ব্যভিচারাশ্রম কোনো আশ্রম নয়। সংসারী হয়েও সাধু হওয়া যায়, ব্যভিচারী হ'য়ে তা' হওয়া যায় না তোমরা সদাসন্ন্যাসী, বিরক্ত সাধু হ'তে চেয়েছিলে কিন্তু পার্ল্লে না। তোমাদের দোষ শুধু এই যে, তোমরা পরের কুৎসিত আচরণ দেখতে আনন্দ পেতে।

চাঁদপুর
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯

গতকল্য রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর পৌছিয়াছেন। বেলা দুই ঘটিকার সময়ে চাঁদপুর হাসনালি জুবিলী

হাই ইংলিশ স্কুলে ছাত্রদের সমক্ষে দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর জুবিলী স্কুলে বক্তৃতা দিবেন এইরূপ সংবাদ শুনিয়া বাবুরহাট ও বাজাপ্তি অঞ্চল হইতে অনেক ছাত্র আসিয়াছিলেন। বক্তৃতা এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, বাবুরহাট, বাজাপ্তি প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে সভান্তে সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এই বক্তৃতার সারাংশ অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ থাকায় আমার স্বল্পই পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিতেছি।

চরিত্রগঠন ও আত্ম-পরীক্ষণ

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —আত্মদোষ অনুসন্ধান এবং সেই দোষকে নির্ম্মূল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, এরই নাম চরিত্র-গঠন। একটী দুটী দোষ নয়, যত দোষ তোমার ভিতরে আছে বা থাকা সম্ভব, দিনের পর দিন নিভৃত আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা তাকে খুঁজে বের কর বন্ধু। তোমার পরম শত্রু যতখানি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিয়ে তোমার দোষ অনুসন্ধান করে, তোমার দৃষ্টি তার চেয়েও তীক্ষ্ণ হোক্। যেদিন একটী দুর্ব্বলতাকেও অন্তরের ভিতরে খুঁজে পেয়েছ, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্ম্মূল করার চেষ্টা ক'রেছ জেনো সেই দিনটী তোমার যশস্কর দিন। যে দিন একটা অপবিত্র চিন্তাকে নির্য্যাতিত ক'রে তার উপরে সত্য ও বিবেকের প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে সমর্থ হয়েছ, জেনো, সেই দিনটী তোমার অতি শুভদিন। যে দিন একটী প্রলোভন দমন কত্তে সমর্থ হয়েছ, জেনো, সেই দিনটী তোমার মহাসৌভাগ্যের দিন। কত অপবিত্র

চিন্তা, কত পাপ-প্রলোভন গোপনে লুকিয়ে থাকে, স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া ও মমতার চিত্তাকর্ষী ছদ্মবেশ পরিধান ক'রে তারা আত্মগোপন করে; সহজ চ'খে তাদের ধরা যায় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, বিচারশীল মন দিয়ে তাদের ধরতে হয়। যেদিন একটী ক্ষুদ্রতম সংগুপ্ত নীচতা তোমার চেষ্টায় ধরা পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস সাধনের জন্য যত্ন নেবে, জানবে তোমার জীবনের মধ্যে, সেই দিনটী অতীব সুন্দর দিন। তোমাদের জীবনের প্রত্যেকটী দিন এমন সুন্দর হোক্।

চাঁদপুর

২৩ শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অদ্য দ্বাদশটী যুবকের দীক্ষা হইল। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি এক একজনকে এক একটী উপদেশ-বাক্য বলিলেন।

নামজপ ও স্তোত্রের ঐক্য

একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —নাম জপ কর্ব্বে যাঁর, স্তোত্র পাঠ করবে তাঁর। একজনকে পিঁড়ি দিয়ে অপর একজনকে অন্ন পরিবেশন কেমন রে?

নম্র নিরহঙ্কার সাধন

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —বিনীত নম্র, নিরহঙ্কার চিত্ত নিয়ে অল্পও যে সাধন করে, সে বেশী ফল পায়। যে আত্মপরিচয় দিতে অনুৎসুক, লোকে তাকেই বেশী চেনে।

ভগবৎ সাধন ও পিতামাতার বিরোধ

অপর একজন শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন, —ভগবানের কাজে অভিভাবকদের বিরুদ্ধতা দেখে পিতৃমাতৃভক্তি হারানো সঙ্গত নয়। তোমার পারমার্থিক কাজ তুমি ক'রে যাও, তাঁদের প্রতি ভক্তি-নম্র ভাব ও ব্যবহার রক্ষা কর। পরিণামে তাঁরাও ভগবানের চরণাশ্রয়ই গ্রহণ কর্ব্বেন।

গঞ্জিকা-সেবীদের সঙ্গ বর্জ্জনীয়

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —গঞ্জিকাসেবী সাধুদেরও সঙ্গ ক'রো না। তাঁদের সঙ্গ তোমাকে নেশায় আসক্ত কর্ব্বে এবং পরিণামে এতে নিষ্ঠাভঙ্গ ঘট্‌বে।

ভগবদ্‌বিশ্বাস ও সাহস

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। অন্তরে এই বিশ্বাসকে দৃঢ়রূপে স্থাপন কর। তুমি সর্ব্বকার্য্যে তাঁরই আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। হৃদয়ে এই আবেদনকে অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। এর পরে তুমি আর কাপুরুষ থাক্‌তে পার না।

জীবনের সার্থকতা আত্মত্যাগে

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা আত্মত্যাগে। ভগবানের কাছে যদি কখনো কিছু প্রার্থনা কর, তবে শুধু এই প্রার্থনা ক'রো, তোমার জীবন

যেন ত্যাগে পূর্ণতা পায়, আর সেই ত্যাগ যেন ভগবানের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

ইষ্টনিষ্ঠা ও সাধুসঙ্গ

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —সৎলোকের সংসর্গে মানুষ সৎ হয়। সুতরাং সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গে কাটাবে। কিন্তু এমন সাধু ব্যক্তি যদি পাও, যাঁর সহস্র সদ্‌গুণ আছে কিন্তু যাঁর সঙ্গের প্রভাবে তোমার ইষ্টনিষ্ঠা হ্রাস পাচ্ছে, তবে বিষবৃক্ষের ন্যায় অথবা বিষধর ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রো।

ভুলে যাও নাম ও গোত্র

অদ্য রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক সন্ন্যাসপ্রার্থী কর্ম্মী ভক্তকে এক পত্রে লিখিলেন,—

"নিজের কণামাত্র personality (ব্যক্তিত্বাভিমান) না রাখিয়া যদি বাহির হইয়া পড়িতে পার, দেখিবে অল্প সময়ে কি অঘটন ঘটিয়া যায়। (তোমার নিজ) আশ্রমের প্রতি মায়া-মমতা যদি কিছু থাকে, বাবা, ছাড়িয়া দাও। নির্ম্মম হও, পাষাণ হও, নিজের হাতে গড়া জিনিষ নিজে ভাঙ্গিবার শক্তি অর্জ্জন কর *** অতীত যদি যাইতে চাহে, জানিও মঙ্গলময় ভবিষ্যৎকে আহ্বান করিয়াই সে অদৃশ্য হইতেছে। *** অতীতের সকল সংস্কার বিস্মৃত হইয়া যাইবার নাম সন্ন্যাস। ভুলিয়া যাও, তুমি কার পুত্র, কোন্ গোত্র, কোথায় ধাম, কোন্ প্রতিষ্ঠানের তুমি স্রষ্টা। সব ভুলিয়া নিজেকে নিঃশেষে পরমাত্মার পায়ে সমর্পণ

কর,—তাঁর মঙ্গলময় অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য। ব্যক্তিত্বাভিমান, কর্ত্তৃত্বাভিমান সব সদ্গুরু পরমাত্মায় আহুতি দাও। পূর্ব্বতনু ধ্বংসের পূর্ব্বে কে কবে নূতন দিব্য দেহ অর্জ্জন করিয়াছে ?"

পত্র লিখিয়া রাত্রেই ডাকে দেওয়া হইল। তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পর হইতে অনেক দিনের উপদেশ-বাণী লিখিয়া রাখিবার কোনও উপায় হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি ঐ সময়কার যে সকল বাণী পরে আমাদের নিকট পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে নিম্নে উদ্ধার করা হইল। বলাই বাহুল্য, এই সকল বাণী কেবলই আধ্যাত্মিক তত্ত্বোপদেশ নহে, এই সকল বাণীতে তৎকালীন রাজনৈতিক কর্ত্তব্যের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

মুক্তি মন্ত্র

(১)

রুদ্র-ভৈরব গর্জ্জনে ধরিত্রী প্রকম্পিত ক'রে দাও, পদভারে মেদিনী টলাও, বীরেন্দ্রকেশরী মূর্ত্তিমান্ বীর্য্যরূপে জগতের সর্ব্বস্থানে ছড়িয়ে পড়, লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন কর, উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে উঁচু হও হিমালয়-মিত,—অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন, আক্রমণ, উদ্বেগ, অশান্তি সব-কিছুর চির-সমাধি রচনা কর তোমার আত্মোৎসর্গের পূণ্য মহিমায়। সর্ব্বস্ব দিলে সর্ব্বস্ব মিলে, না দিলে কিছুই মিলে না। ত্যাগ তোমার যত বড়, প্রাপ্তি তোমার তত বড়। ভোগের পুতুলেরা কি ক'রে লাভ কর্ব্বে স্বাধীনতার প্রাংশুলভ্য ফল ?

(২)

সুবিচারে বা অবিচারে বন্দী হ'য়ে আছ যারা বিদেশীর লৌহ-কারাগারে, লক্ষ্য রেখো, মনটী যেন তাদের স্বাধীন থাকে। স্বাধীন হবার যোগ্যতা, স্বাধীন থাকার অধিকার যার আছে, কারাগার তাকে কতকাল রুদ্ধ ক'রে রাখতে পারে ? তোমার স্বাধীনতার শত্রু কি তোমার স্বদেশবাসীরাই নয় ? তোমার পায়ের ঐ লৌহশৃঙ্খল কি তোমার দেশবাসীরাই নিজ হস্তে রচনা করে নাই ? তোমার দেশবাসীরাই কি তোমার করচরণে লৌহনিগড় পরিয়ে দেয় নাই ? তোমাদের জীবন-কাটি মরণ-কাটি তোমাদেরই নিজেদের হাতে। অন্যকে তোমরা কিসের দোষ দাও ? নিজেদের চরিত্র অধ্যয়ন কর। নিজেদের দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্বেষণ কর, নিজেদের দুর্ব্বলতার অবগুণ্ঠন-মোচন কর নির্ম্মম, নির্লজ্জ, নিঃকুণ্ঠ চিত্তে। আত্মানুসন্ধান যার নাই, তার সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

(৩)

হুজুগ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে অনেকেই পারে কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ সম্মুখে এসে পড়লে কজন সেখানে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারবে, তার হিসাবটা নাও। এই হিসাবের অঙ্কটাই তোমার আসল অঙ্ক, অন্য সব হিসাবের অঙ্ক নিতান্ত মিথ্যা এবং বাজে। কেবল গলাবাজি আর ছল-চাতুরী ক'রে তোমরা দেশকে পরিচালিত কত্তে চেও না। বক্তৃতার যথাযোগ্য স্থান আছে, সে কথা সবাই মানে, কিন্তু কাজের সময়ে বক্তৃতার দাম নেই। বক্তৃতা দেওয়া আর বক্তৃতা শোনা অধিকাংশ সময়ে

একটা ব্যসন মাত্র। যে বক্তৃতায় শ্রোতাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়ে দেয়, সত্যই "There shall be no Alps", পর্ব্বতের বাধা বাধাই নয়, সেই বক্তৃতারই প্রয়োজন। প্রয়োজন হ'লে ছল-চাতুরী করবে দেশের শত্রুদের সঙ্গে, দেশবাসীদের সঙ্গে নয়। শাঠ্য-নীতির স্থান রাজনীতিতে আর রণক্ষেত্রে, নিজ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে নয়। অন্তরের অন্তঃস্থল নিরীক্ষণ ক'রে দেখ, তোমার অসাধারণ আচরণগুলির অধিকাংশই তোমার দেশবাসীকে প্রতারণা ক'রে বিদেশীদের প্রশংসা আহরণের জন্যই কি না।

(৪)

সাহস এবং শৌর্য, এই দুইটী হচ্ছে জাতীয় উন্নতির দুই স্তম্ভ। চরিত্র-বল বা দুর্নীতিমুক্ততা হচ্ছে জাতীয় অভ্যুদয়ের ভিত্তি। ঈশ্বরে বিশ্বাস আর আত্মার অবিনশ্বরত্বে আস্থা নিষ্কলঙ্ক শুভ্র চরিত্রের জন্মদাতা ও জননী।

(৫)

তোমার স্বদেশপ্রেম বিক্রয়ের সামগ্রী নয়। স্বদেশকে ভালবাস ব'লে পুরস্কারের আশা রেখো না। নিঃশ্বাস-বায়ু গ্রহণ কর ব'লে কি তুমি কারো পুষ্পমাল্যের প্রত্যাশা কর ? স্বদেশপ্রেম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক।

(৬)

কাশী, কাঞ্চী, কুরুক্ষেত্রের চেয়েও কারাগারগুলি পুণ্যতর তীর্থস্থান। কাশীতেও তুমি বাইরে সাধুর ভাণ্ডামি ক'রে নিজের দুশ্চরিত্রতা লুকিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কত্তে পার। কারাগারে এসে সবাই সবার পাপের খবর অন্য সকলকে জান্‌তে দিতে বাধ্য

হয়। কেউ হয়ত চুরি ক'রে জেলে এসেছে, কেউ এসেছে ডাকাতি ক'রে, কেউ বা রাজদ্রোহ ক'রে। অবশ্য, রাজদ্রোহ সকল সময়েই অপরাধ নয়। অত্যাচারী রাজার দেশে অনেক সৎলোককে রাজদ্রোহ কত্তে হয়, পরস্বাপহারী অন্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলে ধরতে হয়। কেবল নিজের স্বার্থে নয়, সর্ব্বজনের স্বার্থে। কিন্তু কতক লোকের দৃষ্টিতে তারাও একপ্রকারের পাপী। অবশ্য, শ্রেণীটা তাদের ভিন্ন। নিজের স্বার্থে তারা কারাগারের নরক দর্শন করেনি, করেছে, দশজনের স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে। সবাই যেখানে বন্দী, সবাই সেখানে সরল। কারো পাপ, অপরাধ, অন্যায় কেউ আর গোপন ক'রে রাখতে চায় না। সবকিছু প্রকাশ ক'রে দিতে তার লজ্জা নেই। মন তার সরল। তার এই সরলতাই তাকে নিরভিমান করে। নিরভিমান চিত্ত পরম তীর্থস্বরূপ। দুঃখের বিষয়, কারাগার থেকে বেরিয়ে এলে আর সে সরল থাকে না, আবার সে কপট হয়।

(৭)

তোমরা কপট সমাজ সৃষ্টি করেছ। কপটতাকে পদে পদে প্রশ্রয় দিচ্ছ, যে যত বড় কপটী, তাকে তত বড় নেতা ব'লে জয়মাল্যে ভূষিত কচ্ছ। ভণ্ডামির তোমরা পূজা কচ্ছ, অনাচারের তোমরা বন্দনা কচ্ছ। মিথ্যাকে তোমরা সত্য আর ফাঁকিকে তোমরা সেবা ব'লে চালাচ্ছ। তোমাদের যদি ভগবান্ কখনো কোহিনূর তুলে দেন, তোমরা কি তার মর্য্যাদা রক্ষা কত্তে পার্ব্বে ?

(৮)

সত্যকে স্বীকারের যার সাহস নেই, সে পণ্ডিত হ'তে পারে, জ্ঞানী হ'তে পারে, লোকপ্রিয় হ'তে পারে কিন্তু প্রকৃত নেতা নয়। এমন নেতারা দেশকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যায়।

(৯)

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর্ব্বে তুমি কোন্ সাহসে? দুর্নীতির তোমার অন্ত নেই, দুর্ব্বলতার তোমার অবধি নেই। লোকের চোখে ধূলো ছড়াবার যোগ্যতা আছে ব'লেই তুমি ভগবানকে ভয় পাও। ভগবানের চোখে কেউ ধূলা দিতে পারে না। জনসমাজকে দুদিনের জন্য বোকা-ঠকান যায়, ভগবানকে কদাচ যায় না।

(১০)

তোমাদের একটী মাত্রই সাধনা। সেই সাধনা চরিত্রের সাধনা। যার মুখপানে তাকালে তোমাদের ভিতরে চরিত্রের সাধনা উদ্দীপিত হবে, সে-ই তোমাদের যোগ্য নেতা। অন্যরা নয়। প্রকৃত নেতাকে চিন্‌তে যাদের অক্ষমতা, তারা নিত্য নূতন দুর্য্যোগে পড়ে, তারা সারা জীবন হাহাকার ক'রে মরে।

(১১)

তোমরা সৎকথা শুনতে চাও? আমি একটী মাত্র কথাই শুনাব। সে কথা চরিত্রের। তোমরা সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রতা কাকে বলে, তার ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা প্রত্যেকে জানো চরিত্র কাকে বলে, সচ্চরিত্রতা কাকে বলে। সর্ব্বপ্রযত্নে চরিত্রবান্ হও। এই একটী মাত্র কাজ যদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে ক'রে যেতে পার, তাহ'লে তোমরা দেশের সেরা

সেবা করলে। দেশের সেবা দেশের সেবা ব'লে চীৎকার হচ্ছে অনেক, কিন্তু যত লোক হৈ হৈ ক'রে জেলখানাগুলিতে প্রবেশ কচ্ছ, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বুকে হাত দিয়ে নিজেদের অতি সঙ্গোপনে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা চরিত্রবান্ কিনা? তোমার কাছে তোমার ভ্রাতা বিনা দলিলে বিনা নিদর্শনে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রেখে বিদেশে গেলে দশ বছর পরে ফিরে এসে সম্পূর্ণ টাকা এক কথায় পাবে কি না? তোমার কাছে তোমার বন্ধু তার সুন্দরী সুশীলা স্বাস্থ্যবতী যুবতী ভগিনীটীকে রেখে সুদূর প্রবাসে বাণিজ্য কত্তে গেলে পাঁচ বছর পরে এসে তার বোনকে অক্ষত চরিত্রে পাবে কি না? তুমি যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাও, তাহ'লে বিপদের সময়ও না পালিয়ে বুক পেতে মৃত্যুকে বরণ কত্তে পার্ব্বে কি না? সৎপথে থেকে ধনার্জ্জন করার ইচ্ছা এবং প্ররোচনাকে পদতলে নিষ্পেষিত ক'রে চল্‌তে পারবে কি না? মহৎ কাজের কৃতিত্ব যাঁর, তাঁকে তা' না দিয়ে নিজেই সেই কৃতিত্বের যশ লাভ করার অপার সুযোগ পেয়েও তুমি নিজেকে অযশস্বী ও অখ্যাত রেখে দেশের কাজ করার সাহস রাখ কি না? এসব প্রশ্নের জবাবে যদি বলতে পার "হাঁ",—তবেই বল্‌ব তুমি চরিত্রবান্।

(১২)

লক্ষ কোটি দুর্ব্বলের শক্তি একত্রে মিলিত হ'লে মহাবলের উৎপত্তি হয়। সেই মহাবল অনেক সময়ে অতি সাধারণ কোনো লোককে হঠাৎ হিমালয়ের তুঙ্গতম শৃঙ্গে তুলে দেয়, তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেয়। লক্ষ কোটি দুর্ব্বলের সেই বলকে সংযত,

সংহত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচালিত ক'রে দেশব্যাপী উন্নয়নের অভিনব অভিযান পরিচালিত হ'তে পারে। নেতৃত্ব এখানে সার্থক। সেই শক্তিকে প্রকৃষ্ট বিকাশের সুযোগ না দিয়ে সকলের ক্ষুদ্র ত্যাগ ও সেবাকে একাকী নিজের স্বার্থ-সাধনে বা নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ-সাধনে নিয়োজিত করা যেতে পারে। নেতৃত্ব এখানে কেবল অসার্থকই নয়, অভিশপ্ত। কোটি কোটি দুঃখার্ত্তের রুক্ষ অভিসম্পাত এমন নেতাকে জন্ম-জন্মান্তরে পশ্চাদ্ধাবন করে।

(১৩)

না, চরিত্রের সাধনা ছাড়া দ্বিতীয় কথা আমার কাছে উচ্চারণ ক'রো না। আমি সেই কথা শুনব না। প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র তুমি তৈরী কল্লে, বিদেশীকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াবার জন্য কিন্তু তোমার সহকর্ম্মী সব অস্ত্র ডাকাতের দলের কাছে বিক্রী কর্ল্ল। বিরাট ষড়যন্ত্র-জাল তুমি সমস্ত দেশময় ছড়ালে বিদেশীকে হটাবার জন্য, আর তোমার আপন ভাই বা তোমার কোনো নেতা সব খবর তাদের দিয়ে দিল। তোমার ঘরের গুপ্ত কথা ইন্দুরের গর্ত্ত দিয়ে অনভিলষিত স্থানে গিয়ে পৌঁছুতে লাগল। মুখে তুমি আদর্শের বড় বড় বুলি উচ্চারণ কল্লে, কিন্তু তোমার আদর্শবাদ সর্ব্বত্র শুধু অন্যায়াচরণ আর পরস্বাপহরণকে প্রশ্রয় দিল। কি হবে এসব থেকে দেশের লাভ? আগে চরিত্রবান্ হও, চরিত্রের বল বৃদ্ধি কর, তারপরে অন্য কথা!

(১৪)

আমি ভগবানকে ভালবাসি। তোমরা ভগবানের নাম শুনতে পার না, তাতে আমার দুঃখ নেই। তোমরা যা' নিয়ে থাকতে

ভালবাস, তাই নিয়ে থাক। তোমরা ভগবানকে মান না ব'লে তোমাদের প্রতি আমার কণামাত্র বিদ্বেষ নেই। ভগবানই তোমাদের ভিতরে তাঁকে না-মানার প্রবৃত্তি দিয়ছেন। তোমরা যা কচ্ছ, তা তাঁরই ইচ্ছায় কচ্ছ। আমি তোমাদের সঙ্গে কলহ কর্ব্ব কেন? কিন্তু আমিও তাঁরই ইচ্ছায় তাঁকে ভালবাসি। তোমরা ঈশ্বরকে না মেনে যদি পরার্থে জীবন উৎসর্গ কত্তে পার, কর, আমি তোমাদের ত্যাগকে, সেবাকে, মনুষ্যত্বকে খাটো ক'রে দেখব না। কিন্তু ঐ সব মহনীয় কাজের এক কণাও যদি আমার দ্বারা কদাচ সম্ভব হয়, তবে তা' হবে একমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাসের শক্তিতে। আমার ঢং-এ ভগবান্ যাদের তৈরী করেছেন, তারা সবাই ভগবানে বিশ্বাস করার ফলেই হাসতে হাসতে পরার্থে আত্মোৎসর্গ কর্ব্বে।

(১৫)

জীবনটাকে দিয়ে দেওয়ার মধ্যেই তার সার্থকতা, কোনও প্রকারে তাকে ধ'রে রাখার মধ্যে কোনও সার্থকতা নেই। একটা মাত্র প্রশ্নের সদুত্তর চাই। কি কাজে জীবনটা দেবে? নিজের প্রয়োজনে? দশের সেবায়? দেশের কল্যাণে? ভগবানের কাজে? এই প্রশ্নটারই জবাব চাই। শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো পৌরুষ নেই, কোনো গৌরব নেই। বাঁচার মত বাঁচা চাই, মহৎ লক্ষ্যে বাঁচা চাই, মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য বাঁচা চাই, মহাব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য মরা চাই। জীবন এবং মৃত্যুকে দুটো আলাদা জিনিষ ব'লে জ্ঞান ক'রো না। বাঁচার মত বেঁচে থাকবার জন্য মৃত্যুকে করতলে ধারণ ক'রে চলতে হবে, মরার মত মরার জন্য জীবনকে মাটির সরার মতন তুচ্ছ ব'লে জানতে

হবে। যে মরার মত মরতে প্রস্তুত, বাঁচবার অধিকার তার, যে বাঁচার মত বাঁচতে ইচ্ছুক, বাঁচবার সার্থকতা তার। জীবন আর মৃত্যু একই জিনিষের দুটো দিক্। দুটোকেই এক ব'লে জানতে হবে, বুঝতে হবে, স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

(১৬)

তুমি, তোমার স্বদেশ আর তোমার পরমেশ্বর, এই তিনটীর মধ্যে পূর্ণ অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক্। পরমেশ্বর না মানো, ব্যক্ত-অব্যক্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কর। তারপরে এই তিনটীতে অভেদ-ভাব কর। স্বদেশের সঙ্গে যার অভেদত্ব, সে নিজের যশ, নিজের মান, নিজের স্বার্থ, নিজের কর্তৃত্ব, নিজের অমরত্ব, নিজের ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর এক কণা ক্ষতিও কত্তে পারে না। এই অভেদ-বোধ যার জন্মে নাই, সে অনায়াসে দেশবাসীর সেবার নাম ক'রে তাদের জন্য অকথনীয় দুঃখ ও দুর্দ্দশার সৃষ্টি কর্ব্বে হাসিমুখে, খোশখেয়ালে, নিজের অন্যায় জিদ ও অহমিকার প্ররোচনায়। ঠাণ্ডা মাথায় নরহত্যার মত এ পাপ জঘন্য এবং নিন্দনীয়। স্বদেশের সঙ্গে পরমেশ্বরের বা জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য স্থাপন যে কত্তে পারে, তার স্বদেশ সেবা বিশ্বসেবারই রূপান্তর মাত্র, উগ্র স্বাদেশিকতার মোহে সে কদাচ জগদ্বাসীদের জন্য দুঃখদুর্দ্দশার সৃষ্টি কত্তে পারে না। নিজেতে আর পরমেশ্বরে যার অভেদ-জ্ঞান আসে, সে অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হয়, ব্যক্তিগত অহমিকা তাকে কাবু কত্তে পারে না, অপরের সুখ-দুঃখে সে উদাসীন থাকতে পারে না, নিজের কোলে ঝোল টানবার হীনবুদ্ধি তাকে পরিত্যাগ করে, চালাকী

আর চতুরতার নীচ পথ সে নিজের দিব্য স্বভাবেই বর্জ্জন ক'রে চলে, বিশ্বাত্মার তৃপ্তির মধ্যে দিয়ে সে তার নিজাত্মার তৃপ্তি আহরণ করে।

(১৭)

তুমি যে তুমি, অন্য কিছু নও, এই কথাটা স্পষ্ট ভাবে স্মরণ রাখতে পারার নাম চরিত্রবল। তুমি যখন আত্মবিস্মৃত, তখনই ত' কর যত ভুল-ভ্রান্তির অনুশীলন, অনুতাপ-যোগ্য পাপের চর্চ্চা, তোমার অনুপযুক্ত নীচ কর্ম্মের সাধনা। তুমি কে, এই কথা কদাচ তুমি ভুলো না। নিজেকে নিজে নিয়ত স্মরণ রাখতে পারলে দুনিয়ার বাহবা তোমাকে পথভ্রষ্ট কত্তে পার্ব্বে না, যেমন পারবে না তুচ্ছ হীন প্রলোভন।

(১৮)

লক্ষ লোক যখন একই ভাবে উদ্বেলিত হয়, লক্ষ হস্ত যখন একই কাজে সংলগ্ন হয়, তখন এমন এক আলোড়নের সূচনা হয়, যার সর্ব্বত্র চলে যুগপৎ এক উন্মাদনা,—এক দিকে সৃষ্টির, অন্য দিকে ধ্বংসের। এই উন্মাদনার মধ্যে এমন এক আনন্দ রয়েছে, যার আস্বাদন অনির্ব্বচনীয়। এই আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাস কোটি কোটি উদাসীন নরনারীকে বিহ্বল করে এবং ইচ্ছার অজ্ঞাতসারে ঘটনাবলির স্রোতোবেগ-বর্দ্ধনে নিয়োজিত ক'রে দেয়। এরই নাম বিপ্লব। বিপ্লব অর্থহীন একটা আজগুবি ব্যাপার নয়।

(১৯)

বিপ্লব, আপ্লব, বিবর্তন—সবকিছুর মধ্য দিয়ে ঘটে জাতি বা

সমাজের অভ্যুদয়ের পথযাত্রা। এগুলি যারা চাইবে না, কিছুই তারা পাবে না। উন্নতি-পথে অগ্রগমণের এরা অনতিক্রমণীয় সর্ত্ত।

(২০)

বিদ্বেষকে বিবর্দ্ধিত ক'রে নয়, প্রেমকে প্রবর্দ্ধিত ক'রেই বিপ্লবের সার্থকতা। যেখানে বিপ্লব আছে, প্রেম নেই, সেখানে বিপ্লব ব্যর্থ। যেখানে প্রেম আছে, বিপ্লব নেই, সেখানে অভ্যুদয় অসম্পূর্ণ, আড়ষ্ট, পঙ্গু। না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। যত দামী জিনিষ দেবে, বিনিময়ে তত দামী জিনিষ পাবে। হৈ-হৈ ক'রেই ত' বেড়ালে, প্রাণ কি ভাবে দিতে হয়, তার কিছুই শিখলে না, প্রাণ দেবার সকল সুযোগ থেকে নিজেদের দূরে দূরে সরিয়ে রাখলে, তোমরা কাপুরুষে পরিণত হ'লে। কাপুরুষেরা শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ ক'রে নিজেদের ক্লীবতা ঢেকে রাখতে চায়। কিন্তু ক্লীবের ত' পৌরুষ নেই। অবীর, অপুরুষ অমানুষেরা যখন ক্ষমতা পায়, তখন তারা করে তার অপব্যবহার। একটা মহাযুদ্ধে জাতির যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, অমানুষের নেতৃত্বে শান্তির সময়েও ক্ষতি হয় তার শতগুণ বেশী।

(২১)

যুদ্ধকে নিষ্ঠুর ব'লে বর্জ্জন কত্তে পার কিন্তু জাতির মঙ্গলের জন্য অনেক সময়ে যুদ্ধ একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ভীরু কাপুরুষগুলির মুখোস খুলে ধরে যুদ্ধ, সহস্র সহস্র ভেড়ার পালের মাঝখান থেকে সিংহ-শিশুকে খুঁজে বের করে যুদ্ধ, অদৃষ্ট-বিলাসী চির-আলস্যের কিঙ্করদিগকে দুঃসাহসী কর্ম্মবীরে

পরিণত করে যুদ্ধ। যুদ্ধ যখন ন্যায়কে রক্ষার জন্য, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ধর্ম্মকে বাঁচাবার জন্য, তখন যুদ্ধ বাঞ্ছনীয়।

(২২)

পৃথিবীর নামী নামী বীরেরা যুদ্ধ ক'রেই জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন ব'লে মনে ক'রো না, যুদ্ধজয়ই জাতির প্রকৃত গৌরব। জাতির গৌরব সেই সমাজ-ব্যবস্থা, যা প্রতিজনের প্রাণে দেবে পবিত্রতা, মনে দেবে উচ্চাভিলাষ, চিত্তে দেবে সর্ব্বজনে প্রেম, দেহে দেবে কান্তি, পুষ্টি, বল, উদরে দেবে ধর্ম্মোপেত স্বোপার্জ্জিত সুপ্রচুর অন্ন, পরিবারে দেবে শান্তি, পল্লীতে দেবে স্বাস্থ্য, পরিবেশে দেবে সন্নীতি, সদাচার ও সদ্‌রুচি। এই লক্ষ্যে স্থির থেকে যে কাজ কর্ব্বে, সে কাজকেই সৎকাজ ব'লে জানবে। এই লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যা করবে, সব তোমার পণ্ডশ্রম হবে। আমি সচ্চরিত্রতার আন্দোলন করি, তোমরা তা' পছন্দ কচ্ছ না। কিন্তু তোমরা যদি চরিত্রহীন হও, আর তোমাদেরই হাতে যদি দেশের ভাগ্য কখনো ধরা দেয়, তা' হ'লে তোমাদের প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা প্রকাশ্য বচনের ললিত-মাধুরী রূপে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে মূর্খদের চক্ষু ঝলসাবার জন্য, আর দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দৈন্য দুর্দ্দশা বর্দ্ধনের জন্য। তোমরা করবে স্বদেশসেবা আর দেশবাসী তার ফলে নিরন্তর ফেলবে চোখের জল।

(২৩)

চরিত্রহীনকে বিশ্বাস ক'রো না। তাকে বিশ্বাস করলে ঠক্‌বে। নানা দেশে চরিত্রহীনেরাও রাজ্য চালায়, এরূপ কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু তার সত্যাসত্য জানি না। কিন্তু এদেশ চরিত্রহীনকে

চায় না। চরিত্রহীনের মতিস্থিরতা থাকে না। চরিত্রহীন নিত্য নূতন পথ পালটায়। চরিত্রহীন সত্যকে ভয় পায়, মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসিয়ে পূজা করে আর দেশবাসীকে সেই অনুচিত পূজা করতে বাধ্য করে।

(২৪)

প্রতিভাবানকে সম্মান কর। তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশের সহায়তা কর। তার অপ্রকাশিত শক্তির যাতে দ্রুত স্ফুরণ হয়, তা' কর। তার প্রতিভা যাতে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তা' কর। তাকে যন্ত্রের দাস হ'তে বাধ্য ক'রো না। তোমার নিজের ভিতরে কি কোনো সুপ্ত প্রতিভা প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে ? সশ্রদ্ধ শুদ্ধ চিত্তে তারও অনুসন্ধান কর। আমরা যে ঈশ্বর-প্রেমের কথা বলি, এই জন্যই বলি। ভগবানে ভালবাসা এলে মানুষ নিজেকে নিজ স্বরূপে জান্‌তে পারে। তখন শত হস্ত গভীর সরোবরের তলদেশে অস্ফুট মৃণাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তখন তুমি নিজেকে দেশ, জতি, জগতের কল্যাণে প্রকৃষ্টরূপে দিয়ে দেবার আকুল আগ্রহ অনুভব কর্ব্বে। সেই আগ্রহ একাগ্র হ'লে তুমিই জগতের বহু প্রতিভাবানের অভাব একাকী দূর ক'রে দিতে পার্ব্বে। প্রতিভাবান্ নারী-পুরুষেরা জাতির শুধু অলঙ্কারই নয়, সম্পদও। তারা জাতির শক্তি।

(২৫)

প্রতিভাবান্ আর প্রতিভাহীন ব'লে দুটো আলাদা শ্রেণী নেই। প্রত্যেকটী মানুষের নিজস্ব প্রতিভা আছে কিন্তু সেই প্রতিভার কোনো পরিচয়, কোনো স্বীকৃতি নেই, এই জন্য তার কোনো

প্রকাশও নেই। কার প্রতিভা কোন্ দিকে, এইটী খুঁজে বের করাই মহতের কাজ। সেই মহতেরা ধর্ম্মক্ষেত্রে, সংসারক্ষেত্রে বা রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে-কোনও ক্ষেত্রে কাজ কত্তে পারেন। জহুরীরাই জহর খুঁজে বের কত্তে পারে, অন্যে নয়। কিন্তু অধিকতর লোকেরই ঝোঁক হচ্ছে, অপরের প্রতিভার সহজ প্রকাশকে দাবিয়ে রেখে সেই প্রতিভাকে নিজের কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য লাগানো। এর নাম পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা। এ সব ক্ষেত্রে নূতন প্রতিভার আবির্ভাবকে অন্য প্রতিভাবানেরা ঈর্ষ্যার চোখে দেখে এবং তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টায় ধর্ম্মের নাম ক'রে অধর্ম্মের, সত্যের নাম ক'রে অসত্যের, ন্যায়বিচারের নাম ক'রে অন্যায়ের আর অবিচারের নির্লজ্জ অনুশীলন করে। এই সব দুর্লক্ষণ জাতির চরিত্রহীনতার পরিচায়ক।

(২৬)

চরিত্র বড় দুঃসাহসী বস্তু। সে বাধা মানে না, বিঘ্ন মানে না, তার মৃত্যুভয় নেই, একমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া ছল-চাতুরীও তাতে নেই। চরিত্র বড় শাদাসিধা জিনিষ, বচনের বাহার অপেক্ষা কর্ম্ম-কুশলতাকে সে বেশী দামী মনে করে। চরিত্র বড়ই নির্ম্মম ও নিরঙ্কুশ, জাতির রক্ষার জন্য সে মূলসত্যে বিসর্জ্জন দেয় না। তোমরা চরিত্রবান্ হও।

(২৭)

সুযোগের সন্ধানে থাক। চ'খ-কান খোলা রাখ, চৌদিকে কে কোথায় কি করে কি বলে, তা' দেখে যাও। কিন্তু কথাটী ব'লো

না। শার্দ্দুল-শিকার তোমার কাজ, তুমি কেঁচো খুঁড়তে আস নি। সুযোগের প্রতীক্ষায় থাক। এমন ভাবে প্রস্তুত থাক যেন সুযোগ এলে অমনি পালিয়ে না যেতে পারে। সুযোগ আসা মাত্র তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার কত্তে হবে। এর জন্য যারা প্রস্তুত, তারা বৃথা নিদ্রায় অচেতন হ'য়ো না, কারো স্তোকবাক্যে ভুলো না।

(২৮)

তোমরা যা' করেছ বা কচ্ছ বা কত্তে চাও, তা' কি নূতন জগৎ সৃষ্টি কচ্ছে? পুরাতনের প্রতি অন্ধ অনুরাগীদের চোখের সামনে তা' কি বসুন্ধরার নূতন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে? নবাগত তরুণ-তরুণীদের ভিতরে নূতন আশার, নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার কচ্ছে? জগৎ যা ছিল, ভিতরের গৌরবে আর বাইরের সৌষ্ঠবে তা' কি পূর্ণতর ও শ্রেষ্ঠতর হ'তে চলেছে? এই যে সুন্দর সুষম সুঠাম ক্রমবিকাশ, তা' কি তোমাদের কর্ম্মে, চেষ্টায়, প্রচারে, ভাবনায়, উচ্ছ্বাসে, ধ্যানে ত্বরান্বিত হচ্ছে? না কি স্বাধীনতা দেবার নাম ক'রে আর একদল নূতন ঢং-য়ের ক্রীতদাস তোমরা সৃষ্টি কত্তে যাচ্ছ, যারা তুচ্ছ এক টুক্‌রা রুটীর লোভে নিজেদের মা-বোন্‌কে বর্ব্বরের হাতে সঁপে দিতে লজ্জাবোধ করবে না?

(২৯)

তোমরা আমাকে পছন্দ কর না, একথা আমি জানি। কারণ, তোমরা ভগবানকে অসত্য ব'লে জ্ঞান কর আর আমি সেই ভগবানকেই আমার সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বেশ্বর ব'লে চিনেছি। কিন্তু আমি ত' ভগবানের কথা তোমাদের কাছে কদাচ বলতে যাই

নি। আমি ত' বলেছি, তোমরা চরিত্রবান্ হও। নইলে আমার সোণার ভারত তোমাদের হাতে নিরাপদ নন। আমি ত' বলছি রাজনৈতিক মতামত তোমাদের যার পক্ষে যাই গ্রহণীয় হোক্, আমি রাজনীতির বাইরে থেকেই আমার কাজ ক'রে যাব। তোমাদের মতামতের স্থিরতা অস্থিরতা দুদিনের, আমার মতামত আমার পক্ষে আজও সত্য, কালও সত্য, তিন শতাব্দীর পরেও সত্য। আমি তোমাদের রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসে তলিয়ে যাবার মত ক্ষুদ্র নই। তোমরা ব্যস্ত বর্ত্তমানকে নিয়ে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জান না। আমি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইটাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছি। দল বাড়াবার বুদ্ধি আমার নেই, কেননা, বল আমার যথেষ্ট। আমার বলের উৎস পরমেশ্বর। আমার বলের বিকাশ চরিত্রে।

(৩০)

চরিত্রবান্ যুবক-যুবতীরাই দেশকে দেবে গৌরব, জগৎকে দেবে শান্তি। চরিত্রবান্ প্রলোভন-দমনের সামর্থ্য রাখে, ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি ক'রে অপর দশটা দুর্ব্বলকে পায়ের তলায় নিষ্পেষণ ক'রে চরিত্রবান্ কদাচ বড় হ'তে চায় না। চরিত্রবান্ জানে, তার চরিত্রই তাকে বড় কর্ব্বে। বড় হবার জন্য ইতর উপায়ের আশ্রয় নেওয়া সে আত্মসম্মানের হানিকর ব'লে জ্ঞান করে। দেশকে যদি সেবা কত্তে চাও, যে যা' পার, দেশের চরিত্রের ভাণ্ডারে নিজ নিজ অবদান অর্পণ কর। কেবল বক্তৃতা, কেবল চালবাজী, কেবল ষড়যন্ত্র দিয়ে কখনো দেশকে বড় করা যায় না। চরিত্রের মানদণ্ডে ছোট হ'য়ে গিয়েও যখন বাইরে বড়ত্বের ভাণ কর, মনে রেখো, তখন তুমি তোমার দেশবাসীর শত্রুদের

সঙ্গেই হাত মিলাচ্ছ।

(৩১)

উদ্যম আর চরিত্রবল, এই দুইটী তোমার সম্বল হোক। বোমা তৈরী করা শিখেছ ব'লেই আমি তোমাকে দেশসেবক ব'লে মানি না। কারাগারে বন্দী হয়েছ ব'লেই আমার দৃষ্টিতে তুমি দেশসেবক নও। তোমার জীবনের দৃষ্টান্ত, তোমার ত্যাগের শক্তি, তোমার অপ্রমেয় পৌরুষ তোমার অনমনীয় চরিত্র তোমার দেশের লোকের চরিত্রের মেরুদণ্ড কতখানি শক্ত করেছে, সেইটী আমাকে বল। দেশকে যতখানি চরিত্রধন দিতে পেরেছ, তুমি ততটুকু স্বদেশ-সেবক। অনন্তকাল ধ'রে বংশের পর বংশ বেয়ে তোমার দেওয়া যে সম্পদটুকু এই দেশবাসী বা জগদ্ব্যাপী প্রতিজনের ভাবী প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রবাহিত হবে, তোমার সেবার, তোমার দানের, তোমার মহত্ত্বের বিচার আমি তা দিয়ে কত্তে চাই। সস্তা প্রশংসাপত্র আমার কাছে মিল্‌বে না।

(৩২)

চিন্তার সমান দ্রুততা নিয়ে কর্ম্ম তোমার চলে কি? না চলে ত', সেইটী আগে অভ্যাস কর। একটা দেশের দুর্ভাগ্য-মোচন কেবল বাক্য-বিলাসে চলে না। কর্ত্তব্য কি, তা বুঝে নিয়েছ কি? কর্ত্তব্যকে ঠিক চিনেছ কি? তোমার এই চেনার ভিতরে ভ্রান্তি নেই, গোঁজামিল নেই, এই বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হ'তে পেরেছ কি? তা' যদি হ'তে পেরে থাক, তবে আর দেরী নয়। যেমন ভাবা, তেমন করা, মাঝখানে সময়ের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেওয়া হবে না। কি তোমার করা উচিত, তা' নির্ণয়

করার কালে চারিদিকের ক্ষুদ্র তুচ্ছ হাজার হাজার বিপদের সম্ভাবনাগুলিকে ওজন ক'রে দেখবে। পথের সব কাঁটাই কাঁটা, ক্ষুদ্র ব'লে কোনো কাঁটাকে তুচ্ছ মনে ক'রো না। ক্ষুদ্র বাধা, বৃহৎ বাধা, সব বাধাকে এই উদ্দেশ্যেই ধরতে হবে যে, এদের অতিক্রম ক'রে তোমাকে বিজয়ের রথ সগৌরবে চালিয়ে যেতে হবে। হেরে তুমি যেতে পার না। পরাজয় স্বীকার করা হবে না। ভয়ে জড়সড় হবার জন্য নয়, সফলতাকে সুনিশ্চিত করার জন্যই তোমাকে এই সময়ে ভীরু হ'তে হবে। পতন-সম্ভাবনাগুলির দিকে যে লক্ষ্য দেয় না, সে পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় কদাচ উঠ্‌তে পারে না। এই সতর্কতাকে কাপুরুষতা বলা ভুল। কিন্তু একবার যখন সঙ্কল্প ঠিক ক'রে ফেললে, তারপরে আর পশ্চাদপসরণের কোনো প্রশ্নই নেই। তারপরে আর ডর নেই, ভয় নেই, দ্বন্দ্ব নেই, কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, সন্দেহ নেই। তারপরে প্রশ্ন মাত্র একটী, —কেমন ক'রে সফল হব, কেমন করে জয়ী হব, কেমন ক'রে উদ্দেশ্য সাধন কর্ব্ব। তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন যদি প্রয়োজন হয়, নিঃসঙ্কোচে কর্ব্ব, হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণবলিদান দিয়ে দেব।

(৩৩)

বীরের মৃত্যু মরব, কাপুরুষের মৃত্যু নয়,—এই সঙ্কল্পটী চাই সকলের আগে। চরিত্রবল ছাড়া এই সঙ্কল্প আসে না। তাই ব্যাপক ভাবে চরিত্র-সাধনার প্রয়োজন। সর্ব্বশক্তি একস্থানে প্রয়োগ কর্ব্ব, দিকে দিকে শক্তিকে বিক্ষিপ্ত হ'তে দেব না। আর কাজ করব ঝড়ের বেগে, উল্কার গতিতে, শম্বুক গতিতে নয়,

গয়ং গচ্ছ ক'রে নয়। এই তিনটী বিশেষত্ব তোমার মধ্যে একত্র হয়েছে কি ? সর্ব্বশক্তি একত্র প্রয়োগের সামর্থ্য, বিদ্যুতের বেগে কাজ ক'রে যাওয়া আর মৃত্যুলাঞ্ছন দুঃসাহস বা মৃত্যুকে সগৌরবে আলিঙ্গনের উৎসাহ,—এই তিনটীর সাধনা করেছ ত' ? ক'রে থাক্‌লে আমার কাছে এসে ব'লো যে, তুমি দেশ-সেবক। নইলে ঐ দূরে গিয়ে আসন গ্রহণ কর।

(৩৪)

একটী লক্ষ্যে সমগ্র শক্তি নিয়োগ ক'রেও হাজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে যে চল্‌তে পারে, তাকেই বলব কর্ম্মী। কাজও কর্ম্মে সমস্ত মনটা একাগ্র ক'রে, আবার চোখও খোলা রাখবে, যাতে তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে কেউ কণ্টক-রোপন ক'রে না যেতে পারে। লক্ষ্য লাভ করাই সব কথা নয়, সম্ভব হ'লে এই লক্ষ্য লাভের পথের কণ্টকগুলি একটা একটা ক'রে উৎপাটন ক'রে যেতে হবে। তবে, একথাও মনে রেখো যে চাণক্য পায়ের তলার কুশাঙ্কুরগুলি তুলে ফেল্‌বার জন্য প্রযত্ন করেছিলেন সত্য কিন্তু তিনি শুধু ঐ কাজেই লেগে থাক্‌লে চন্দ্রগুপ্তকে ভারতের সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে হত না। দশদিশিবিস্তারিত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সহায়ে কেবল পরিচয় লাভ কর যে, তোমার বাধা কোথায়, বিঘ্ন কোথায়, কিন্তু অগ্রগমনে বিরত হ'লে চল্‌বে না। অমানুষিক বীর্য্য সহকারে তোমাকে কেবল এগিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যে পড়ছ না, এ বিষয়ে তোমার সুস্থির প্রত্যয় জন্মাবার সঙ্গত কারণ থাকা চাই। কোনও প্রকারে আত্মসন্তুষ্ট থাকার নাম অগ্রগমন নয়।

(৩৫)

যারা তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার উপরে নির্ভর কর্চ্ছে, তাদের মনে এই বিশ্বাসটুকু জন্মানোই যথেষ্ট নয় যে, তোমার নেতৃত্বে তারা এগুচ্ছে পরন্তু অগ্রগমনের স্বাভাবিক প্রকাশ তাদের চরিত্রের মধ্যে প্রস্ফুটিত হওয়া চাই। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের নেতারা আর নীতরা দিনের পর দিন মিথ্যাভাষী, নীতিভ্রষ্ট ও মিথ্যাচারী হচ্ছে, এ যদি হয়, তবে বুঝতে হবে, তোমাদের অগ্রগমণের ধূয়া নিতান্তই ভূয়া। তোমার সহকর্ম্মী নারীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ কর্লে সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌তে পার ? তোমার সঙ্গী পরের অন্ন কেড়ে খাচ্ছে দেখলে কি তুমি তাকে ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়ে দিতে পার ? তোমার সাঙ্গোপাঙ্গদের আচরণে দেশের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে দেখামাত্র তুমি কি তোমার পার্থিব প্রতিপত্তির ভবিষ্যৎ-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ কর্ত্তে পার ? এই প্রশ্নের জবাব চাই।

(৩৬)

চরিত্রহীনের ঈশ্বর-সাধনা ভুল, স্বদেশ-সাধনা মিথ্যা। সাধন পথে নেমে হঠাৎ তোমার পদস্খলন হ'তে পারে, এটা কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়। বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ আদি ঋষির মত ব্যক্তিরও হঠাৎ ভুল হ'তে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত সাধকেরা সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম-সংশোধন করেন,—একটী ভুলকেই জীবনের পরম-সত্য ক'রে নিয়ে সেই ভুলের মাশুল জগদ্বাসীকে দিতে বাধ্য করেন না। তুমি কুকাজ কর্ব্বে আর জনসাধারণকে বাধ্য করবে তার

সুব্যাখ্যা প্রচার কত্তে, তুমি করবে চুরি আর জনসাধারণকে দিয়ে বলিয়ে নেবে যে, এটা তোমার আপনপর ভেদ-বোধের অভাব জনিত এক আশ্চর্য্য মহানুভবতা, তুমি করবে সর্ব্বনাশ আর জনসাধারণকে দিয়ে বলিয়ে নেবে যে, তোমার মতন জনহীতকারী দেশ-দরদী পুরুষ অতীতেও কখনো জন্মে নি, ভবিষ্যতেও কখনো জন্ম নেবে না, পদে পদে অস্থিরচিত্ততা, দুর্ব্বলমতিত্ব, সুনির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্পের অভাব তোমার চরিত্রকে কর্ব্বে বিশোষিত আর জনসাধারণকে দিয়ে বলিয়ে নেবে যে, তোমার মতন ধীমান্ পুরুষ তিন ভুবনে সুদুর্ল্লভ, এগুলি ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণদানের প্রতিজ্ঞা দিনে একশ বার ক'রে কর্ব্বে আর প্রাণদানের প্রয়োজন-সময়ে কূট-কৌশল সৃষ্টি ক'রে নিজেকে সযত্নে সকল দায়িত্ব ও পৌরুষ থেকে দূরে রাখবে,— স্বার্থপর, চরিত্রহীন না হ'লে এ আচরণ কার হয় ? তোমরা সযত্নে চরিত্রকে গঠন কর, দেহে মনে হও দুর্জ্জয়, তবেই তোমরা সঙ্কল্পে অপরাজেয় হবে। লক্ষ্য রাখ উচুতে, ভুলভ্রান্তি কিছু ঘ'টে গেলে দ'মে না গিয়ে অধিকতর পৌরুষ সহকারে কেবল এগিয়ে যাও। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তে অগ্রসর যারা হয়, পৃথিবীর কোনো বস্তু তাদের ভয়ের নয়।

(৩৭)

বিঘ্ন যেমন বিষম, পৌরুষও চাই তেমনই অপ্রতিম। বলবীর্য্যহীনের আস্ফালন ত' ঝিঁঝিঁপোকার চিৎকার। তার প্রতি কর্ণপাত কে কর্ব্বে ? তুমি যে কেশরী, একথা যদি প্রমাণ কত্তে পার, তোমার একটী গোপন নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনবার

জন্যও লক্ষ কর্ণ উৎকণ্ঠিত থাকবে। তোমার শত্রুরা তোমাকে করবে ভয়, সেই ভয় থেকে জন্মাবে ঐহিক শ্রদ্ধা, যার স্বরূপ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা থেকে আলাদা। সেই শ্রদ্ধা তোমাকে তোমার শত্রুদের অজ্ঞাতসারে তাদের পূজার সামগ্রী কর্ব্বে। আর দুর্ব্বলের উৎকট চীৎকারকেও একটা কাণা কড়ির মূল্য দেবে না, এমন কি তার চিরকালের বন্ধুরাও। সুহৃদেরা তোমাকে ঘন ঘন বাহবা দেয় বলেই মনে ক'রে বসো না যে, সত্যই তারা তোমাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। তোমার প্রতি তাদের আনুগত্য ত' কেবল স্বার্থোদ্ধারের জন্য। যে তোমার প্রকৃত বন্ধু, সে তোমার মুখের উপরে রুষ্ট রুক্ষ অভিযোগ উত্থাপন কত্তে বিন্দুমাত্র ভয় পাবে না, যদি তুমি ভুল ক'রে থাক। তোমার ভুলগুলিকে যারা সমর্থন করে, তারা তোমার দুর্ব্বলতার সুযোগ-সন্ধানী, তোমার পতনের পথ তারাই তৈরী কচ্ছে।

(৩৮)

দুর্ব্বল হত্তে অসিধারণ মিথ্যা। এ অসি তোমার শত্রুরা কেড়ে নিয়ে তোমারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ কত্তে পারে। সবল হও। অসির যখন প্রয়োজন, তখন তাকে ধরার মত ধর, যখন প্রয়োজন নয়, তখন তাকে তিব্বতী যোগীদের চক্রঘুরাণোর মত জপের মালা কর। যখন প্রয়োজন তখন সে সভ্যতার শত্রুর বক্ষোরক্ত আকণ্ঠ পান করুক, যখন একাজ তার নিষ্প্রয়োজন, তখন সে তোমার ঈশ্বর-নামের জপসহায় অক্ষসূত্র হোক্। যে তোমার ঐহিক উন্নতির সহায়, সে তোমার পারমার্থিক উন্নতিরও সহায়ক হউক। যে তোমার পারমার্থিক উন্নতির সহায়, সে তোমার

ঐহিক উন্নতিরও সহায়ক হউক। ধর্ম্মকে দুর্ব্বলেরই অনুশীলন-সামগ্রী ক'রে রেখো না। ধর্ম্ম দুর্ব্বলেরও বল হোক, বলবানকেও ধর্ম্ম বলবত্তর করুক।

(৩৯)

ব্যভিচারের প্রবণতা, প্রবৃত্তি, পরিস্থিতি এই তিনটাই তোমাদের নাশ কত্তে হবে। স্বাধীনতার নাম ক'রে পুরুষ ও নারীরা ব্যভিচার কর্ব্বে, এ যেন হ'তে না পারে। দুঃশীলতায় যে যুগে লজ্জা নেই, সে যুগ পশুর যুগ। কদাচারে যে দেশে ঘৃণা নেই, সেই দেশ সভ্য ব'লে পরিচয় দেওয়ার অযোগ্য। চিত্ত-দুর্ব্বল নারী ও পুরুষেরা কেউ আর্টের নামে, কেউ স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে, কেউ বা ধর্ম্মের নামে যে সব অনুষ্ঠান করে, তার অধিকাংশই ব্যভিচারের দেয় প্রশ্রয়। তাকে প্রগতি না ব'লে অগতি বা দুর্গতি বলা উচিত। বলবান্ যদি হ'তে চাও, অগতি ও দুর্গতির হাত থেকে আত্মরক্ষা কত্তে হবে।

(৪০)

দেশের একটা লোকে দুর্ব্বল হ'লে সমস্ত দেশটাকে সে আংশিক দুর্ব্বল করল, সেই কথাটা বিস্মৃত হ'য়ো না। দেশের একটা লোক সবল হ'লে দেশের সমস্ত লোকের ভিতরে যে সে আংশিক সবলতাবর্দ্ধন করল, এই কথাও ভুলো না। তোমার সবলতা বা দুর্ব্বলতা একা তোমারই নয়, সমস্ত দেশের, সমস্ত জাতির, সমস্ত সমাজের, সমগ্র জগতের, নিখিল বিশ্বের তুমি অংশ, তোমার উন্নতিতে আর অবনতিতে নিখিল বিশ্বে তার কিছু-না-কিছু সঞ্চারিত হবে,—জগৎ লাভবান্ হবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নিজেকে তুচ্ছ মনে না ক'রে সর্ব্বপ্রযত্নে নিজের বলবিধান করা প্রয়োজন। তুচ্ছ সুখে, তুচ্ছ প্রলোভনে নিজেকে হেয় করার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কিছু নেই। কিন্তু মূর্খতার স্বভাবই এই যে, হেয় সুখকে সে হেয় মনে করে না, মনে করে প্রাণের চেয়ে দামী।

(৪১)

ব্যভিচার এমনই একটী ব্যাপার যে, যে-কোনও স্থানে হ'তে পারে। নিরিবিলি পেলে নাট্যমঞ্চে, পড়ার ঘরে, খেলার মাঠে, আস্তাকুঁড়ের পর্দ্দার আড়ালে, রাজদ্বারে এমন কি কারাগারেও হ'তে পারে। বলির পাঁঠা যেমন বলির পূর্ব্বক্ষণেও উত্তেজনায় অধীর থাকে, ব্যভিচারীর মন তেমন যে-কোনও সময়ের যে-কোনও সুযোগের প্রতীক্ষায় নিরত উদ্দীপ্ত থাকে। সুখলাভ ভাগ্যে থাকুক আর না থাকুক, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-লীলায় প্রমত্ত হবার জন্য সে উন্মত্ত হ'য়ে উঠে। এদের মন রুগ্ন কিন্তু এদের সংখ্যা কম নয়। যেখানে এদের সংখ্যা বেশী, সেখানে স্বদেশ-সাধনার পদে পদে লাঞ্ছনা। গীতার কর্ম্মযোগ পড়ানো নিয়ে বা স্বদেশী সঙ্গীত শেখানো নিয়ে যেখানে কুটুম্বিতার শুরু, সেখানে একটা ভাঙ্গা ইজি-চেয়ারে, একটা সরু লম্বা টুলে বা একখানা ছেঁড়া চাটাইতে তা' গিয়ে চূড়ান্ত ব্যভিচারের রূপ নিতে পারে। সবই নির্ভর করে মনের গঠনের উপর, পরিস্থিতির উপর আর সুযোগ বা দুর্যোগের উপর। হঠাৎ অনুচিত সুযোগ পেয়ে চিরকালের মহাপুরুষ একদিন অসঙ্গত কাজ ক'রে বসলেন, অথবা স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুগত্যের

নিদারুণ অধীনতা বশতঃ চিরকালের সতী সাধ্বী ধিক্কারযোগ্য কুকাজ ক'রে ফেল্লে,—এমন ঘটনা বিরল নয়। সুতরাং পরিস্থিতিকে বলদুর্দ্ধর্ষ চরিত্র সৃষ্টির অনুকূল করার সাধনাও তোমাদের কত্তে হবে। মনের উদ্দাম আবেগ যদি একবার দৈহিক ঘনিষ্ঠতার পাপাস্বাদ পায়, তাহ'লে নররক্তাস্বাদপ্রাপ্ত ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হ'য়ে উঠে।

(৪২)

দেহ দেহের কাজ করেছে, মন ত' আমার অধীনই আছে, —এসব যুক্তি কুযুক্তি। দেহ একবার তার কাজটী যেমন-তেমন ভাবে ক'রে গেলেও লজ্জা জিনিষটী চিরতরে ভেঙ্গে গেল। তখন আর বন্যার মুখে কোনো বালির বাঁধ কাজ দেয় না। দেহ যদি তার কাজটী ভাল ভাবে ক'রে যেতে পারে, তবে তারপরে উভয় পক্ষের উন্মাদনা মাত্রা ছাড়িয়ে চলে। বিশেষ ঈশ্বর-কৃপা ছাড়া তখন আর মনকে কেউ রুখে রাখতে পারে না। এজন্য দেহকে শাসনে রাখাটাই হবে সর্ব্বপ্রথম কাজ। মনকে সংযত করার কাজ চলবে তার সঙ্গে সঙ্গে বা পিছে। চিত্তজ কাম দেহজ কামে যতক্ষণ রূপান্তর না পায়, ততক্ষণ বল্গা বাধ্য থাকে। দেহজ কাম যেখানে সফল, সেখানে চিত্তজ কাম একেবারে বল্গাহীন। অনেক ক্ষেত্রে দেহজ কামই চিত্তজ কামের প্রথম জনক। এই জন্যই বলা হয়, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়, দেহের পাপই পাপ। কথাটায় সত্য আছে।

(৪৩)

আত্মসম্মান-জ্ঞান যে নারীর আছে, তার নিজত্বাভিমান বা

নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস তাকে সর্ব্বদা বর্ম্মের মত রক্ষা করে। বলপ্রয়োগ বা প্রলোভন তার উপরে সহজে সফলতা অর্জ্জন করে না। আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ সম্পর্কেও সেই কথা। আমরা সবাই সমান, এই সাম্যভাব যদি নারী বা পুরুষকে হেয় হবার প্ররোচনা যোগায়, তবে এরূপ সাম্য দিয়ে দেশের কোনও প্রয়োজন নেই। গৃহে গৃহে অশান্তি সৃষ্টি এবং দেহে দেহে যৌনরোগ-সৃষ্টি ব্যতীত ব্যভিচারের অন্য কোনও সার্থকতা নেই। প'চে গ'লে যদি মরতে চাও, অন্ধ, খঞ্জ, আতুরের যদি জন্মদাতা হ'তে চাও, তবে তুমি যত ইচ্ছা ব্যভিচার কর। ব্যভিচারী কদাচ একনিষ্ঠ হয় না, এজন্য চিকিৎসাও তার পক্ষে স্থায়িফলপ্রসূ হয় না।

(৪৪)

নিজ পত্নী ব্যতীত অন্যে উপরত হওয়ার প্রকৃত মানে স্ত্রীর উপরে নিজ স্বামিত্ব অস্বীকার করা, স্ত্রীর উপরে বলাৎকারকারী-রূপে তার সঙ্গে বাস করা। স্বামী ব্যতীত অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার মানে নিজ পতিগৃহে স্বামীর উপপত্নী হ'য়ে বাস করা। এ দুটোই সমান গ্লানিকর, সমান অসম্মানজনক। এ দুটোই জাতিধ্বংসকর পাপ। এ দুটোই ধর্ম্মদ্রোহিতার চূড়ান্ত। জাতির জননী নারী, সে স্বৈরিণী কেন হবে? পুরুষ প্রাচীন-মহাপুরুষদের মহাবীর্য্যের বাহক, সে ব্যভিচার কেন কর্ব্বে?

(৪৫)

দারিদ্র্যকে যদি উপেক্ষা কত্তে না পার, তা' হ'লে তোমার কাছে আমার কিছুই প্রত্যাশা নেই। ধনী হবার লোভ যদি

সম্বরণ কত্তে না পার, তবে তোমার দেশসেবার আকাঙ্ক্ষার সবটাই মেকি মাল।

(৪৬)

যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে যে সমান সতেজ, তারই সেবা জাতিকে গ'ড়ে তোলে। কেন না, সকল কর্ম্মে লক্ষ্যের একতানতাকে সবলে ধ'রে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়। যৌবনে উদ্দীপ্ত প্রেম বার্দ্ধক্যের হতাশায় ডুবে যদি যায়, এত সেবা এত দান সব-কিছু ভেসে যায় বৃথায় বৃথায়। না, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যদি বাঁচো, যৌবনের সৎসঙ্কল্পকে, যৌবনের প্রতিজ্ঞাকে বিস্মৃত হ'য়ো না। আমরা থাকব চির-তরুণ, এটাই হবে আমাদের বিশেষত্ব।

(৪৭)

মাটির কৃষিও কৃষি, মনের কৃষিও কৃষি। এ দুটোর একটাকেও উপেক্ষা ক'রে চলবে না। বিজ্ঞানের ও দর্শনের যাবতীয় দান এই দুইটাতে এনে সমাবিষ্ট কর, প্রথমটার মত ছোট্ট কাজে যেমন, দ্বিতীয়টার মত সূক্ষ্ম কাজেও তেমন। যাতে উৎকর্ষ, তারই নাম কৃষি। তালে বেতালে হয়রাণ হবার নাম কৃষি নয়।

(৪৮)

সংসারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই বন্ধুর প্রয়োজন। কিন্তু যে বন্ধু নির্ভরযোগ্য নয়, যার চরিত্র সন্দেহসঙ্কুল, তাকে বন্ধু ব'লে মনে মনে স্বীকার না করাই উচিত। সে যে সুযোগমত শত্রু হ'তে পারে, এই কথাটাকে চোখের সামনে রেখে তোমাকে সব পরিকল্পনা কত্তে হবে। প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে কপট বন্ধু অধিকতর বিপজ্জনক। প্রকাশ্য শত্রু সম্পর্কে তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকতে

বাধ্য হও বা সাবধান থাকা যে উচিত, এ কথাটা তুমি স্বীকার কর। কিন্তু গোপন শত্রুর কোনও অভিসন্ধিই তুমি জান না, অথচ তার মুখের মধু অন্তহীন। ধর্ম্মের জগতে প্রায় প্রত্যেক আচার্য্য শত্রুকে মিত্র ভাবতে উপদেশ দিয়েছেন। অন্তরের শান্তি লাভ কত্তে হ'লে এ উপদেশ অবশ্য-পালনীয়। কাউকে শত্রু ব'লে ভাবলে অন্তরে যে জ্বালা হয়, তাতে আয়ুঃক্ষয় হয়। কাউকে আপনার জন ব'লে ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত মনে গভীর শান্তি, নিবিড় শীতলতা আসে। তাই জগতের সকলকে মিত্র ভাবাই ঠিক। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রশ্ন যেখানে উদ্যত, সেখানে শত্রু-মিত্রে ভেদ নির্ণয়ের যোগ্যতা না থাকলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সকলকে মিত্র ভাবা সনাতন ধর্ম্ম, কিন্তু মিত্র থেকে শত্রু বেছে নেওয়ার যোগ্যতা আপদ্ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মের ন্যায় আপদ্ধর্ম্মও প্রয়োজনের সময়ে সমান যত্নে পালনীয়।

(৪৯)

রাজনীতি আর ধর্ম্মনীতি, দুটোই সুবলিষ্ঠ নীতি। এর একটার ভিতরেও কাপুরুষতার কোনো স্থান নেই। কাপুরুষরা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করে। কাপুরুষেরা দেশসেবার নাম ক'রে দেশের অনিষ্ট করে। কাপুরুষের অভ্যুদয় নেই জীবনের কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে। তোমরা মানুষের কাপুরুষতা, ক্লীবতা, আত্মবিশ্বাস-হীনতা ও চিত্তদৌর্ব্বল্যকে দূর করার সাধনায় নামো।

(৫০)

ধর্ম্মনীতি চলে অধ্যাত্ম-কুশলের মুখপানে তাকিয়ে, রাজনীতি চলে ঐহিক কুশলের দিকে চেয়ে। দুটীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

কিছুই নেই। তোমার বা আমার অধ্যাত্ম-কুশল কেবল তোমার আর আমার কুশলেই সমাপ্ত হয় না, সমগ্র বিশ্বের কুশলকে সে যতক্ষণ না আলিঙ্গন কচ্ছে, ততক্ষণ সে ধৰ্ম্মই নয়। তোমার বা আমার স্বার্থ রক্ষা যতক্ষণ না সমগ্র দেশের প্রত্যেকটী অধিবাসীর স্বার্থরক্ষার অংশ-বিশেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার জন্য সাধনা করাকে দেশসেবা বলা চলে না। ফলে, ধৰ্ম্মনীতি আর রাজনীতি উভয়েরই মৌলিক সত্য এক। তার নাম স্বার্থ-ত্যাগ, তার নাম সর্ব্বজনের শুভ-সম্পাদন, তার নাম নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে বিশ্বজনের বৃহত্তর স্বার্থের নিকটে আত্মসমর্পণ, তার নাম আত্মোৎসর্গ, আত্মবিসর্জ্জন। এই দৃষ্টিতে ধর্ম্মের সেবা আর রাজনীতির সেবা সমার্থবোধক। কিন্তু ধর্ম্ম যারা করে, একমাত্র নিজের মুক্তির জন্য, রাজনীতি যারা করে নিজের ব্যক্তিগত বা নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর স্বার্থ সংসিদ্ধির জন্য, তারা করে অতি তুচ্ছ ছোট কাজ। মাত্র ঐটুকু করার জন্যই তোমরা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাওনি।

(৫১)

ধর্ম্ম আর রাজনীতি, এই উভয় পথেই মানুষ মানুষকে যথেষ্ট ধাপ্পা দিতেছে। সুযোগ পেলে চিরকালই দিবে। তোমরাই ত' সুযোগ দাও, তাই না চতুর লোকেরা তোমাদের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে। তোমরা জাগ্রত থাকলে, সতর্ক থাকলে এভাবে প্রতারণার পাত্র তোমরা কদাচ হ'তে না। সুযোগ-সন্ধানী চতুর লোকদের সম্পর্কে সজাগ থাক। অঘোর নিদ্রায় যারা অচেতন থাকে,

তাদের ঘরেই ত' চোর আগে ঢোকে। অতন্দ্র সতর্কতা নিয়া পথ চল।

(৫২)

ধর্ম্ম যদি বলদান না করে, কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসেই তোমার কর্ম্মক্ষম বাহুযুগলকে অথর্ব্ব ক'রে রাখে, তবে তেমন ধর্ম্ম দিয়ে কাজ নেই। রাজনীতিও যদি তোমার বলবর্দ্ধন না করে, প্রত্যেকটী প্রাণকে পরম আদর্শ রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গে যদি উদ্দীপিত না করে, রাজনীতি যদি শত্রুর দুর্ব্বৃত্ততার আর মিত্রের ক্লীবত্ব ও কাপুরুষতাকেই কেবল প্রশ্রয় দিয়ে চলে, তবে তেমন রাজনীতি পদাঘাত পাবার যোগ্য। রাজনীতি যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তিগত প্রভুত্ব রক্ষার উপায় মাত্র হয়, তখন তা' দেশ ও জাতির পক্ষে মারাত্মক ও বিপজ্জনক। তখন ইতিহাস নূতন ক'রে আবর্ত্তিত হবার চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টা দৃশ্য হিসাবে বড়ই হিংস্র, বড়ই ভয়ঙ্কর।

(৫৩)

আমি রাজনীতির চর্চ্চা করি না। তাই ব'লে রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করাকে বা নিজ মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করাকে আমি দোষ মনে করি না। যে সকল ধার্ম্মিকেরা শক্তিমানের অন্যায় দেখেও তাকে পরমপূণ্য ব'লে প্রচার ক'রে নিজেদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখতে আগ্রহী, যে সব ধার্ম্মিকেরা, দেশের জনগণের প্রতি যারা অত্যাচারকারী, তাদের হাত থেকে দাক্ষিণ্যের দুইটী টুকরো আহরণ কর্ব্বার জন্য লালায়িত, যেই সব ধার্ম্মিকেরা অন্যকে রাজনীতি থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য জোরদার উপদেশ

দেন, আর নিজেরা তলে তলে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের লোকের কাছ থেকে সুযোগ ও সাহায্য সংগ্রহে সর্ব্বদা তৎপর, জান্‌বে, আমি তাদের দলের নই। সদুদ্দেশ্যে যারা রাজনীতি করে, হোক্ না তাদের পথ দুর্গম, আমি তাদের মনে মনে প্রশংসা করি। তাদের পথ আমারও পথ না হ'তে পারে কিন্তু রাজনীতির নাম শুনলেই নাক সিট্‌কাব, সেই উন্নাসিকতা আমার নেই।

(৫৪)

ধর্ম্ম দিবে বল, রাজনীতি দিবে সংহতি। মহম্মদের ধর্ম্ম রাজনৈতিক ধর্ম্ম, যে দেশেই যাক্, আরব্য স্বাদেশিকতার ছাপ এতে থাক্‌বেই। এই আরব্য ভাব তার রাজনীতি। এজন্যই মহম্মদীয় ধর্ম্মে এত সংহতি। সকলে একত্র মিলিত হ'য়ে ঈশ্বরোপাসনা বা নামাজ এই সংহতিকে ব্যাপকতর ও গভীরতর করেছে। সবাই মিলে এক রকমের বেশভূষা পর্‌লে, এক রকমের দাড়ি রাখলে বা একত্র ভোজন কর্ল্লে একপ্রকারের ঐক্য আসে বটে কিন্তু সে ঐক্য এত গভীর হয় না। সবাই মিলে একত্র উপাসনা কর্ল্লে যে ঐক্য হয়, তা' হয় গভীরতর এবং স্থায়ী। কিন্তু এই সংহতিকে বিপ্লাবক আয়তন দেওয়া সম্ভব হয় তখন, যখন রাজনীতি এসে এর মধ্যে সংযোজিত করে দিগ্বিজয়ের উল্লাসকে। এক জাতি দ্বারা অন্য জাতির উপরে নিজেদের ভাব, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করার অন্যায় আকাঙ্ক্ষা যখন ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তা' সৃষ্টি করে এমন এক ধর্ম্মোন্মাদনাকে, যা সত্যিই ত্রিলোক-ত্রাসকর বিকট ও বিকৃতাকার।

(৫৫)

ধর্ম্ম আর রাজনীতি এই দুটাকে একত্রে মিশিয়ে ফেল্‌লে এমন সব মুহূর্ত্তের সৃষ্টি ঘটতে পারে, যখন ধর্ম্মের নাম ক'রে একদল হয়ত কাপুরুষতাকেই জীবনের চরম সার্থকতার রাস্তা ব'লে ধ'রে নিল এবং চলতে লাগ্‌ল বহুশতাব্দীব্যাপী দাসত্বের দিকে, আর একদল হয়ত চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা, বর্ব্বরতা ও পৈশাচিকতাকেই ধর্ম্ম ব'লে আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন কত্তে লাগ্‌ল। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা রোমক সম্রাটদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন, টুঁ শব্দটীও করেন নি। মধ্যযুগের খ্রীষ্টানরা ধর্ম্মের নাম ক'রে এক দেশ থেকে আরেক দেশে এসে যুদ্ধ ক'রেছেন, নরহত্যা করেছেন, তাঁদের বিবেকে কিছুমাত্র বাধে নি। ধর্ম্মের নাম ক'রে নারীধর্ষণ ও গৃহদাহ ত' স্পেন থেকে শুরু ক'রে সুমাত্রাযাবা পর্য্যন্ত এক স্বীকৃত ইতিহাস।

(৫৬)

আমি রাজনীতি কর্ব্ব না, এর মানে এই নয় যে আমি রাজনীতি পথের শঠ, প্রবঞ্চক, ভণ্ড ও পাষণ্ডগুলিকেও নর-দেবতা ব'লে অর্চ্চনা কর্ব্ব। নিজেদের সুখ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য অন্যকে বিপন্ন হ'তে যারা উৎসাহ দেয় এবং নানা ভাবে আশ্বাস দেয় আর তার পরে কাজ ফতে হ'য়ে গেলে যারা ভদ্রলোকের প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যায়, তেমন জুয়াচোরদিগকে রাজনীতিবর্জ্জনকারী উদাসীন সাধুরাও দেবতা ব'লে কদাচ পূজা কর্ব্বে না। আমরা ধর্ম্মের পথে থেকে নিজ নিজ আদর্শানুযায়ী কাজ কর্ব্ব, কিন্তু পেট ভ'রে খাওয়াও ত' একটা রাজনীতি,

জলের কলে প্রচুর জল পাওয়ার দাবীও ত' একটা রাজনীতি, ইতিহাসে সত্য কথাই লিখিত হবে এবং আমাদের ভবিষ্যদ্ বংশীয়েরা মিথ্যা ইতিহাস, বিকৃত ইতিহাস, প্রকৃত সত্যকে গোপন ক'রে রাখা ইতিহাস পাঠের থেকে বাঁচবে, এই আগ্রহ অন্তরে রাখাও ত' একটা রাজনীতি। সোয়া সেরের দাম দিয়ে একসের জিনিষ কিনব না, গব্য ঘৃতের নাম ক'রে সাপের চর্ব্বি খাব না, এই জিদও ত' একটা রাজনীতি। রাজনীতির থেকে তোমরা রক্ষা পাবে কি ক'রে? পরাধীন জাতির প্রত্যেকটী কাজেই রাজনীতি। আর, দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখনো যে রাজনীতির প্রয়োজন হবে না, একথা এখন অনুমান কচ্ছ কি ক'রে?

(৫৭)

যে নেতা অন্ধ, তাকেও মানতে হবে? আজ থেকে দশ বৎসর পরের ভবিষ্যৎ দেখবার যার ক্ষমতা নেই, তারও জয়-জয়কার দিতে হবে? আসল লক্ষ্যকে সাময়িক সুযোগের কাছে বলি দিয়ে নিত্য নূতন জটিলতার গ্রন্থি যারা সৃষ্টি কচ্ছে, অন্ধের মতন তাদেরও অনুসরণ কত্তে হবে? তোমার একশত বৎসরের পরে কি, সেইটী না জেনে, না বুঝে, না স্থির সিদ্ধান্ত ধারণ ক'রে কোন্ সাহসে তুমি প্রার্থিত জাতীয় তরণীর কর্ণধার হবার দুঃসাহস কর? নেতার চরিত্র চাই, নেতার দূরদৃষ্টিও চাই।

(৫৮)

ভেবে দেখেছ, কোথায় তোমাদের আন্দোলনের ত্রুটী? চরিত্র সাধনার ব্যাপক প্রয়োজনকে তোমরা আমল দাও নি, যার ফলে প্রথম সুযোগে সুযোগ-সন্ধানীরা মাৎস্যন্যায় অবলম্বন করবে

এবং দেশপূজ্য দেবতার দল দরিদ্রের রক্ষক না হ'য়ে হবে "দুর্ব্বলঘাতকাঃ"। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বক্তা সমগ্র দেশব্যাপী অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে সর্ব্বসাধারণের মাথায় জনসাধারণের নাম ক'রে কাঁঠাল ভাঙ্গবে, এর প্রতিকারের পন্থা তোমরা চিন্তা করেছ কি? সর্ব্বসাধারণের ভিতরে মানুষ-হিসাবে কোনও মহত্ত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘট্‌ল না, চোরগুলি চোরই রইল, মাতালগুলি মাতালই রইল, পরনারীলোলুপ লম্পটেরা আগেও যা ছিল পরেও তাই রইল, কুলটা নারীরা এক জনেও নিজের স্বভাব পরিবর্ত্তন কর্‌ল না বরং আগের চেয়ে বেশী বেপরোয়া হ'য়ে মানুষের পূজা সংগ্রহে লেগে গেল,—তারপরেও তুমি তোমার আন্দোলন থেকে মহৎ কিছুর প্রত্যাশা কর?

(৫৯)

কত কত ভাল ভাল কথা তুমি বলেছ বা লিখেছ, তা' দিয়ে তোমার চরিত্রের মহত্ত্ব নির্দ্ধারিত হবে না। কত কত ভাল কাজ কর্ব্বার জন্য তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছ, সেইটুকুই মাত্র হিসাবে আসবে, তাই দিয়েই হবে তোমার বিচার। কূটকৌশলে নিজেকে মহৎ ব'লে চালু কর্ব্বার চেষ্টা সফল হ'লেই তুমি মহৎ হবে না, তোমার মহত্ত্ব বিজ্ঞাপনের বলেও সিদ্ধ হবে না। তোমার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব বা তোমার কোনও স্বার্থবুদ্ধি যদি মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি-সাধন ক'রে থাকে, তাহ'লে মহৎ হ'য়েও তুমি দুরাত্মা, তা-হ'লে তুমি উচ্চাসীন হ'য়েও নীচাত্মা। দূরদৃষ্টি কিসে তীক্ষ্ণ হয়, তার দিকে লক্ষ্য দাও। আদর্শবাদের বুলি দিয়ে লোকের মন ভুলান যায় কিন্তু সুদৃঢ় চরিত্রবল ছাড়া কেউ অপক্ষপাত

জনসেবক হ'তে পারে না। চরিত্র বা তোমার আচরণকেই তুমি প্রধান ব'লে জেনো।

(৬০)

ধর্ম্ম কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য মতবাদের সমষ্টি নয়, ধর্ম্ম আচরণের বস্তু। যা মননে সুস্পষ্ট ভাবে আসে না, তাকে আচরণে সুপরিস্ফুট করা বড় শক্ত। রাজনীতি সম্পর্কেও ঐ একই কথা। চিন্তাকে স্বচ্ছ কর, আচরণ আপনিই সরল হ'য়ে যাবে। কপটতাই রাজনীতির উপজীব্য, একথা সত্য মাত্র আপদ্ধর্ম্ম-হিসাবে। দুষ্ট শত্রুর সঙ্গে সরলতা আত্মহত্যার তুল্য হয়। কিন্তু আপদ্ধর্ম কদাচ সনাতন নয়। সরলতাই সনাতন ধর্ম্ম। চিন্তার জগতে ধোঁয়াটে ভাব থাকলে আচরণে সরলতা, স্বচ্ছন্দতা, সাবলীলতা আসে না। চিন্তায় ধূম্রালুতা বর্জ্জন কর, চিন্তায় স্পষ্ট হও, চিন্তায় জমা-খরচ তীক্ষ্ণ লক্ষ্যে দেখে নাও। কেবল উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনা সকল সময়েই বাস্তব সুখের হেতু হয় না।

(৬১)

ধর্ম্মহীন রাষ্ট্র হয় না, রাষ্ট্রহীন ধর্ম্মও যাযাবর মাত্র। নির্দ্দিষ্ট কোনও উপধর্ম্ম নয়, মানুষমাত্রেরই মধ্যে যা সামান্য বা Common, যে জিনিষটুকু মানুষের ভিতরে না থাকলে সে কোনও ধর্ম্ম-মতানুযায়ী ধার্ম্মিক ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, সেই চরিত্রবল, সেই সর্ব্বজনে প্রেমবোধ, সেই সুবিচারের সৎসাহস না থাকলে রাষ্ট্র থাকে না, টুকুরো টুকুরো হ'য়ে ভেঙ্গে শতখণ্ড হ'য়ে যায়। ধর্ম্মকে ধ'রে রেখেই রাষ্ট্র দাঁড়াবে, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে নয়। ধর্ম্মের নামে অনেক কু-লোক সাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গেছে,

এই যুক্তিতে তুমি ধর্ম্মকে সমাজ-জীবন থেকে, রাষ্ট্র-জীবন থেকে দূর ক'রে দিতে পার না। কিন্তু গোঁড়ামি ক'রে, জিদ্ ক'রে তাই যদি কত্তে চাও, তাহ'লে ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নাম ক'রে অধিকতর দুষ্ট লোকেরা অধিকসংখ্যক জনগণের অধিকতম অহিত সম্পাদন কর্ব্বে। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে যার আশ্রয় নেই, সে সাম্যের নাম ক'রে জগতে অসাম্য, সাধুতার নাম ক'রে জগতে অসাধুতা, সন্নীতির নাম ক'রে জগতে দুর্নীতি, সদাচারের নাম ক'রে জগতে কদাচারকে কেবল সম্বর্দ্ধনা ক'রে বেড়াবে। ভণ্ডামিই বাড়বে, মানুষের দুঃখ এক কণাও ঘুচবে না।

(৬২)

মনুষ্যজন্মকে দুর্লভ ব'লে স্বীকার কর। এই দুর্লভ জন্মকে দুর্লভতম কৃতিত্বের সঞ্চয়ে নিয়োগ কর। ত্যাগকে তোমরা লক্ষ্য কর। সংযমকে তোমরা ব্রত কর। আত্মসুখের চাইতেও সর্ব্বজনের সুখকে অধিকতর কৌলীন্য দাও।

(৬৩)

মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার সৃষ্টি করা, সেই ভালবাসাকে নিত্য সত্য ক'রে তোলা, সেই ভালবাসাকে পঙ্কিলতা ও অস্থায়িত্বের অপবাদ থেকে উর্দ্ধে টেনে তোলা ধর্ম্মের কাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য, সমত্ব, অঙ্গাঙ্গিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা রাজনীতির কাজ। উপায় বা প্রকরণ যাই হোক, ধর্ম্ম বা রাজনীতির উদ্দেশ্যের মধ্যে এই ক্ষেত্রে বেশ একটু সাদৃশ্য রয়েছে, যা অস্বীকার কর্লে ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম থাকে না, রাজনীতিও

রাজনীতি থাকে না। এমতাবস্থায় কেন যে তোমরা ধার্ম্মিক হ'য়েও রাজনীতি কত্তে পার্ব্বে না, রাজনীতিক হ'য়েও ধর্ম্ম কত্তে পার্ব্বে না, আমি তার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। রাজনীতি হচ্ছে রুটি নিয়ে লড়াই, কিন্তু সকলের রুটী তুমি কেড়ে নিয়ে একা খাবে বা ভাগাড়ে ফেলে দিবে, তার লড়াই নয়। যাতে পৃথিবীর সমস্ত উৎপাদিত অন্ন জগতের প্রতিটী প্রাণীর মুখের কাছে সমান ভাবে পরিবেশিত হয়, তাই হচ্ছে রাজনীতির লড়াই এর লক্ষ্য। ধর্ম্ম দেয় শান্তি। জগতের প্রত্যেকটী প্রাণী যাতে অন্তরে অনবদ্য শান্তির আস্বাদন লাভ কত্তে পারে, ধর্ম্মের প্রয়াস হচ্ছে সেইখানে। কেন যে রাজনীতি কত্তে হ'লেই ধর্ম্মকে গর্হন কত্তে হবে, আর, ধর্ম্ম কত্তে হ'লে রাজনীতিকে বর্জ্জন কত্তে হবে, এর কোনো সঙ্গত যুক্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। রাজনীতি রাজসিক ব্যাপার, স্বার্থ-সংঘাতের ব্যাপার, এ জন্য রাজনীতি সাত্ত্বিকতার পরিপূর্ণ পরিপোষক সকল সময়ে নাও হ'তে পারে কিন্তু অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণকে যিনি ব্রত-স্বরূপ গ্রহণ করেছেন, কেন যে তিনি ধার্ম্মিক হ'তে পার্ব্বেন না, একথা আমি বুঝতে পারি না।

(৬৪)

ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরণে ন্যায়-বিচারকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয়। এই জন্যই রাজনীতি-চর্চ্চাকারীরা আস্তিকাকে নিজেদের শত্রু ব'লে মনে করে। বাইরে নীতিনিষ্ঠার ভাণ ক'রে অনায়াসে এরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ সহকর্ম্মীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ঈশ্বর মানলে এই বিশ্বাসঘাতকতা অন্তরে

দেবে বৃশ্চিকদংশন। সেটা অসহ্য। তাই ''ঈশ্বর নাই বা থাকলেও আমি বিশ্বাস করি না'' ব'লে এরা উচ্চ চীৎকার করে। এদের এই অবিবেকী আচরণ তোমাদের যেন অনুসরণের বস্তু না হয়।

(৬৫)

রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার যূপকাঠে কত জন কত প্রিয় জনকে বলি দিয়েছে, ইতিহাস তা' ধ'রে রেখেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলি দেওয়া ত' তুচ্ছ কথা। আপাত রম্য এই সকল দুঃসাহস দুদিনের করতালি পেয়েও যায় কিন্তু অনন্তকালের জন্য এদের নামে ধিক্কার সঞ্চিত হ'য়ে থাকে। তোমরা যে সব নোংরা দলাদলি কচ্ছ, তার মধ্যে আমি এ সব কুৎসিত জিনিষ দেখ্‌তে পেয়েছি। তোমাদের আচরণের এই চলচ্চিত্ত-বিকার দেখতে পেয়েছি বলেই ত' আমি তোমাদের রাজনৈতিক নেতা হ'তে অস্বীকৃত হয়েছি। খড়্গের মত শাণিত, বর্শার মত উদ্যত, বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল, পূর্ণচন্দ্রমার মত সুস্থির এবং উল্কার মত গতিসম্পন্ন চরিত্রবান্ যুবক-যুবতীর-দল চাই, যারা, দেশহিতকামী কোনও কর্ম্মী তাদের সঙ্গে ষোল আনা মিল রেখে চল্‌তে পারে নি ব'লে বিপদের জাল বিস্তার ক'রে তাদের নিয়ে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে না। তোমরা নিজেরা দেশের জন্য যতটুকু কাজ কচ্ছ, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির জন্য পরিশ্রম ও জটলা তার চেয়ে দশগুণ ক'রে যাচ্ছ। দেশের প্রতি মমত্ব তোমাদের যতটুকু, দেশহিতকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের তার দশগুণ।

(৬৬)

জীবনটাকে একটা গণ্ডীবদ্ধ জিনিষ মনে ক'রো না। একটা

জীবনের সহস্র সহস্র দিক্ আছে। প্রত্যেকটা দিকে জীবনটাকে পূর্ণতা দিতে হবে। রাজনীতিও জীবনের একটা দিক্। আমি নিজে ঐ দিক্‌টাতে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করি নি বা কর্ম্ম না ব'লে তোমাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন কত্তে কে চেয়েছে? রাজনীতির আলোচনায় জীবনের ক্ষতি হয়, এরূপ অন্ধ বিশ্বাস আমার নেই। রাজনীতির উচ্ছ্বাসে আমার বহুশতাব্দীব্যাপী সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থায় বাধা আসতে পারে। আমি মাত্র এতটুকু সম্পর্কেই সচেতন। দেশকে ভালবাসো কিন্তু রাজনীতির চর্চ্চা ক'রো না, এই উপদেশের কোনো মানে হয় না। কিন্তু অপরিপক্কবুদ্ধি বালকদের রাজনীতিতে ঢুকিয়ে দিয়ে বুদ্ধিমান্ নেতৃত্বাভিলাষীদের হস্তের ক্রীড়নক কর, এটার আমি বিরোধী।

(৬৭)

দল ছাড়া কাজ হয় না এটা যেমন সত্য দলাদলিতেও কাজ হয় না, এটাও তেমন সত্য। দলাদলিবর্জ্জিত কর্ম্মিদল কি সৃষ্টি কত্তে পার ? যদি পার, দল গড়। যদি না পার, দল গড়ার বুদ্ধি পরিহার কর ! দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচন যাদের লক্ষ্য, তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে কাজ কচ্ছে ব'লেই নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ক'রে হাস্যাস্পদ হ'তে হবে, এই পরিণতির কোন্ মহৎ পার্থক্য আছে? বৃথা দলাদলি নিত্য নূতন রেষারেষি সৃষ্টি কচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে তোমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

(৬৮)

সুনাম আর দুর্নাম, দুটীকেই সমান মূল্য দিতে হবে। লক্ষ্য

রাখ সেবা। যাঁর সেবায় জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেছ, তাঁর চরণে স্থির লক্ষ্য রাখ। পত্রিকার রিপোর্ট আর জনসাধারণের জয়ধ্বনি কারো সত্যিকার সেবার পরিচয়পত্র নয়।

(৬৯)

অধার্ম্মিক বন্ধুর চেয়ে ধার্ম্মিক শত্রু অধিকতর নির্ভরযোগ্য। চাটুকার বন্ধুর চেয়ে রুক্ষভাষী শত্রু অধিকতর কাম্য। বুদ্ধিহীন বন্ধু না বুঝে অনিষ্ট কত্তে পারে কিন্তু অধার্ম্মিক বন্ধু জেনে শুনে অনিষ্ট কর্ব্বে।

(৭০)

রাজনীতি যখন যশোলিপ্সার কবলে পড়ে, দেশনেতারা তখন দেশবাসীকে দুর্ভাগ্যের অতলে নিক্ষেপ করেন। এমন নেতাকে বিশ্বাস ক'রো না, এমন নেতার হাতে শক্তি তুলে দিও না। কামনাকে যে পদতলে চেপে রাখতে পারে নাই, তেমন দেশকর্ম্মী অধিকাংশ স্থলে দেশের প্রকাশ্য শত্রুদের চেয়েও মারাত্মক।

(৭১)

রাজনীতিও একটা নীতি। রাজনীতিকে নীতিহীন কর্লে রাজ্যের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে মানুষও তার সমাজকে পরিচালিত করে, তার নাম নীতি। অস্পষ্ট, ধূম্রালু, মিথ্যা আদর্শবাদ রাজনীতির সাফল্য-পথের দুস্তর বিঘ্ন। সুস্পষ্ট নীতি যার নাই, সে রাজনীতি চর্চ্চার যোগ্য ব্যক্তি নয়। অযোগ্যের হাতে রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্ব অর্পণ চিরদুর্ভাগ্যের কারণ হয়। কি চাও, সেইটা আগে জেনে নাও। শুধু বিদ্বেষ আর শুধু

আস্ফালনে দেশ ও জাতির কল্যাণ করা যায় না।

(৭২)

কবিরা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখেছেন। এ স্বপ্ন সার্থক তখন, যখন নিজের দেশের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ জাগ্রত হয়েছে। বিশ্বপ্রেম একটা কথার কথা নয়, স্বদেশের প্রতি যার সন্দেহাতীত প্রেম নেই, সে কদাচ বিশ্বপ্রেমিক হ'তে পারে না।

(৭৩)

যে দেশে নরনারীর বিবাহিত জীবনের সম্মান নেই, বিবাহকে মর্য্যাদাদায়ক এক প্রথা ব'লে স্বীকৃতি নেই, সে দেশে শান্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। দেশকে তোমরা স্বাধীন কর্ব্বে এবং তার ফলে প্রতিটি সংসার স্বাচ্ছল্যের আধার আর শান্তির আগার হবে। এ যদি না হয়, তবে জান্‌বে, হয় তুমি স্বাধীনতা পাও নি, নতুবা তোমার লব্ধ স্বাধীনতায় ভেজাল আছে।

(৭৪)

মরলেই তুমি আত্মত্যাগী হবে? না, তা' নয়। কি জন্য তুমি মরেছ, তার বিচার চাই। কত জনে স্বার্থের সেবা কর্ত্তে চেয়ে মরে, আর, মূর্খ লোকেরা তা'দিগকে আত্মত্যাগী মহাজন ব'লে হৈ-হৈ ক'রে হল্লা জমায়। এ সব মৃত্যু কাউকে সত্যিকারের আত্মোৎসর্গকারীর সম্মান দিতে পারে না। অনেক বুদ্ধিমান্ লোক হিসাব ক'রে মরে, এমন সব ব্যবস্থা ক'রে তারপরে মরে, যেন নিতান্ত শঠ শয়তানকেও দেবদূত ব'লে ভ্রম করা হয় এবং স্বার্থের ক্রীতদাসের মৃত্যুকে দেবদূতের মহাপ্রয়াণ ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু ইতিহাস কঠোর বিধাতা, ঘটনাবলীর

মধ্য দিয়ে নামাবলিতে আচ্ছাদিত পাষণ্ডের রূপ আপনি জগদ্বাসীর কাছে প্রকট ক'রে ধরে। পাপিষ্ঠেরাও দেবতার প্রাপ্য পূজা দুচার দিন আহরণ করে কিন্তু চিরকাল পারে না।

(৭৫)

মহৎ মৃত্যু মহৎ জীবনের উদ্দীপন করে। মৃত্যুর জন্য অনুক্ষণ প্রস্তুত হ'য়ে থাকা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। রাজনীতিকেরও এটা কর্ত্তব্য, ধার্ম্মিকেরও তাই। মৃত্যুকে যার ভয় নেই, সে-ই প্রকৃত ধার্ম্মিক। মৃত্যুকে যার ভয় নেই, সেই প্রকৃত রাজনীতিক। এই একটী লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধার্ম্মিক ও রাজনীতিক ব্যক্তি সমত্বের দাবী কর্ত্তে পারে। কিন্তু রাজনীতির লক্ষ্য দেহের ক্ষুধা নির্ব্বাপণ, ধর্ম্মের লক্ষ্য অন্তরের শান্তি আস্বাদন। একই ব্যক্তি যুগপৎ রাজনীতিক এবং ধার্ম্মিক হ'তে পারে।

(৭৬)

অপরের চোখে ধূলো দিয়ে নিজের প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই যার লক্ষ্য, সে ধর্ম্মই করুক আর রাজনীতিই করুক, আমার দৃষ্টিতে সে বড়ই হেয় পুরুষ। সেবাকে জীবনের পরম লক্ষ্য জেনে যে যা করবার কর, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার প্রবৃত্তি পরিহার কর।

(৭৭)

বিরুদ্ধ অবস্থাকে ভয় পাবে কেন? সকল বিরুদ্ধতাকে আনুকূল্যবিধায়িনী মহাশক্তিতে পরিণত করাই হচ্ছে নেতৃত্বের সফলতা। যে তা' পারে না, তাকে নেতার আসন থেকে নামিয়ে

সর্ব্বসাধারণের সমান ক'রে দাও।

(৭৮)

প্রতিকূল অবস্থাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা নেতার এক সুমহৎ কৃতিত্ব। কেবল বক্তৃতাবাজি দিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জ্জন করা যায় না। দামী কাজ, স্থায়ী কাজ, লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্যবর্দ্ধক কাজই এই কৃতিত্ব প্রদর্শন সুযোগ ক'রে দিতে পারে। অমুকের ছেলে তমুকের নাতি ব'লে এক্ষেত্রে খাতিরের কোনো প্রয়োজন নেই।

(৭৯)

দেশটা কি কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বংশের ছেলেদের মৌরসী পাট্টার তালুক যে অমুক গোষ্ঠীতে যারা জন্মেছে, তারাই শুধু দেশের নেতা হবে, অন্যেরা পাত্তা পাবে না? দেশের কাজে নিজ হাতে নিজের মস্তক ছেদন ক'রে উৎসর্গ দিতে যে সমর্থ নয়, তার মুখখানা গোলাপ ফুলের মত সুন্দর আর তার লেখা বইগুলি পড়তে বেশ সুপাঠ্য, এই যুক্তিতেই তাকে দেশের উদ্ধারকর্ত্তা ব'লে ভুল কত্তে হবে?

(৮০)

রাজনীতিকেরা আত্মকলহ কচ্ছেন? কি নিয়ে কচ্ছেন? কর্ত্তৃত্ব নিয়ে, না, দেশের সেবা নিয়ে? দেশসেবা যার লক্ষ্য, সে বিরুদ্ধ মতের লোকদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেন না, লক্ষ্য স্থির রেখে যারা কাজ ক'রে যায়, একদা তাদের জয় হয়ই হয়। সুযোগ বা কৌশলকে আশ্রয় ক'রে যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা মানুষের দণ্ডমুণ্ডের অধিকার পায়, দুর্য্যোগ এবং স্বার্থপরতা

একদা তাদের ধ্বংসে সাধন করে। এইটী নিবারণের কোনও উপায় নেই। আজকের উদ্ধত শিরগুলি কাল ধূলায় লুণ্ঠিত হবে,—বিধাতার এই বিধানকে পরিবর্ত্তিত কত্তে কেউ পার্ব্বে না। ধার্ম্মিকেরা অন্যান্য ধার্ম্মিকদের সঙ্গে ধর্ম্ম নিয়ে কলহ সৃষ্টি করেছেন? বেশ করেছেন। ধর্ম্মের যে ভাণটুকু তাদের মনে এত দর্পদম্ভের সৃষ্টি করেছে, তাদের দর্পদম্ভই তার মূলটুকু সহ সব উৎখাত ক'রে দেবে। তোমরা নিজেদিগকে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে দিও না। তোমরা সকল মত ও সকল পথের প্রতি সমান নির্ব্বিকার হ'য়ে নিজেদের কাজ একনিষ্ঠ প্রযত্নে ক'রে যাও। পরিণামে সত্যেরই জয় হবে, ভাণের নয়।

(৮১)

জনে জনে জনতাকে যদি নানা পরামর্শ দাও, এরা ভুল বুঝে এক কাজ কত্তে গিয়ে আর এক কাজ ক'রে বসবে। উপদেশ-দাতারা সব সাবধান হও। তোমাদের লোকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, তোমরা জনে জনে মানুষের বুদ্ধিভেদ ক'রে তাদের বিপথে চালিও না। যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁচ জন সেনাপতি যদি একই সঙ্গে পাঁচ রকমের আদেশ ঘোষণা করেন, সৈন্যরা কার হুকুম তামিল কর্ব্বে? ফলটা হবে কি যুদ্ধজয়, না, পরাজয়? বহুশাস্ত্র, বহু গুরু, বহু টীকা, বহু ভাষ্য মানুষকে বিপন্ন করে তুলেছে।

(৮২)

দেশ যখন বিপন্ন, জাতি যখন মুমূর্ষু, ভিন্নদেশীয় ক্ষতিকর আদর্শবাদ যখন জাতির বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট ক'রে

রেখেছে, কিম্বা স্বদেশবাসীদেরই মূঢ়তা ও বিভ্রান্তি যখন দেশকে দিনের পর দিন সর্ব্বনাশ ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সময়ে পরমধার্ম্মিক পুরুষেরা কেবল মালাজপা আর যাগ-যজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌বেন, রাজনীতির ধার ধারবেন না, রাজনীতিয় পথকে নোংরা মনে ক'রে নিজেরাও বর্জ্জন কর্ব্বেন, অন্যদেরও বর্জ্জন ক'রে চলতে প্ররোচনা দেবেন, এরূপ ঔদাসীন্যের মধ্যে ধর্ম্ম তার পূর্ণ সত্তায় পূর্ণ প্রতিকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ব'লে অন্ততঃ আমি ত' বিশ্বাস করি না। পরাধীন দেশে অদ্বৈত বেদান্তের চর্চ্চাও রাজনীতিরই চর্চ্চা, প্রকৃত বৈদান্তিক উৎপীড়নমুখী শক্তিমানের দম্ভকে চুপ ক'রে ব'সে সহ্য কত্তে পারেন না। উৎপীড়ত দেশে পরম ভক্তিবাদীর ঈশ্বর-বিশ্বাসও একপ্রকারের রাজনীতিরই চর্চ্চা। প্রকৃত ভক্তের অটুট ঈশ্বর-বিশ্বাস তাঁকে উৎপীড়কের উৎপীড়ন প্রতিহত কর্ব্বার জন্য অফুরন্ত সাহস যোগায়। যারা রাজনীতি করে, তারা যদি ধর্ম্মবুদ্ধিতে করে, তবে কোনও উপায় নেই তাদের প্রতি কটাক্ষ করার।

(৮৩)

রাজনীতির চর্চ্চা করতে চাও? বেশ ত', তা' কর। কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, তোমার প্রকৃত লক্ষ্য কি? কোন্ সুদূরের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যকে স্থির রেখে তুমি তোমার পথ-পরিক্রমা শুরু করেছ? লক্ষ্যকে যদি না জেনে থাক, চুপ ক'রে যাও, তোমার কিছুই করণীয় নেই। আর, লক্ষ্যকে যদি জেনে থাক, তাহ'লে তার পথে কোথায় কোন্ বাধা, কোথায় কোন্ কণ্টক,

তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নাও। শত্রু তোমার কে, বিঘ্ন তোমার কি, তাদের কার কোন্ সময়ে কতটুকু শক্তি হ'লে হ'তে পারে, কারা তাদের বান্ধব, কারা তাদের সহায়ক সব জেনে নাও। এই বিষয়ে এক কণা অজ্ঞানতা থাক্‌লে তোমার চলবে না। তারপরে আবিষ্কার কর নির্ভরযোগ্য উপায়, যা' অবলম্বন কর্‌লে শত্রুর শত্রুতা নির্ম্মূল হবে, বাধাবিঘ্নের মূলোৎপাটন হবে, পথকণ্টক সমূলে বিনাশ পাবে। সর্ব্বশেষে চাই, সর্ব্বশক্তি একাজে নিয়োগ করা। রাজনীতি সস্তায় বাহবা কুড়াবার জিনিষ নয়, রাজনীতি ধর্ম্মনীতিরই ন্যায় সাধনার বস্তু। যে অবহেলে এবং সুকৌশলে প্রাণ দিতে পারে এবং প্রাণকে যত অধিকতর সম্ভব মহার্ঘ্যভাবে বলি দিতে পারে, সে-ই প্রকৃত রাজনীতিক।

(৮৪)

তোমার কি অনুচরের সংখ্যা কম? এই অল্পতার ক্ষতিপূরণ তুমি সহজেই ক'রে নিতে পার। তোমার কর্ম্মের গতিবেগ বর্দ্ধিত কর, তোমার কর্ম্মীদের মধ্যে মহত্তর যোগ্যতার সমাবেশ কর।

(৮৫)

সমস্ত জীবনটাই একটা সংগ্রাম। এমন স্থানে দাঁড়াও, যেখানে দাঁড়ালে অল্প শক্তি নিয়ে তুমি বেশী কাজ আদায় কত্তে পার, অল্প সহায় নিয়ে তুমি বেশী সাফল্য আহরণ কত্তে পার।

(৮৬)

নিজের যোগ্যতা বাড়াও। দৈহিক ও মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিক,—সর্ব্ববিধ যোগ্যতা তোমাকে কেবল বাড়িয়েই চলতে হবে। শরীরে ভীমবল ধারণই যথেষ্ট নয়, মস্তিষ্কে ভীষ্মের প্রজ্ঞা,

অনুশীলনে অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রতা, কর্ম্মসম্পাদনে দ্রোণাচার্য্যের নৈপুণ্য চাই। তবেই তুমি ক্ষুদ্র একটা মানুষ হয়েও বৃহৎ কিছু করার আশা ক'রো।

(৮৭)

কারো সঙ্গে কেউ কোনো যোগাযোগ রাখবে না। আর ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত শৌর্য্য মহাশক্তিধর বিশাল শত্রুচমূকে বিধ্বস্ত কর্ব্বে, এসব বাজে কল্পনা ছেড়ে দাও। সহকর্ম্মিসমাজের প্রত্যেকটী স্তরের সঙ্গে তোমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা চাই। পায়ে কাঁটা ফুটলে মস্তিষ্ক তা' জানতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতকে ব'লে দেয়,—"কাঁটা খোলো।" চ'খে কাঁকর পড়লে মস্তিষ্ক তা' জানতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতকে ব'লে দেয়, —"জলের ছিটা দাও।" এর নাম যোগাযোগ, এর নাম সহযোগ। এই জিনিষটী যেখানে নেই, সেখানে আশার অসার স্বপ্ন যথেষ্টই থাকতে পারে, কিন্তু বিরাট্ উদ্যমে সাফল্যের সম্ভাবনা নামমাত্র নেই।

কুমিল্লা
চৈত্র * ১৩৩৯

বাংলা ১৩৩৯ সালের চৈত্র মাসে মৌনাবস্থায় শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েকটী দিন কুমিল্লা শহরে নানুয়া-দীঘির পাড়ে উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির উপস্থিতিকালে প্রত্যহ শত শত বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে এবং উপদেশ

* সঠিক তারিখ নির্দ্ধারণ করা যায় নাই।

লাভার্থ আসিতেন। একদিন তিনি সকলের অনুরোধে "গুরুবাদ" সম্বন্ধে একটী লিখিত উপদেশ প্রদান করেন। ভ্রাতা শ্রীমান্ নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহা পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতে থাকেন। পূজনীয় ক্ষীরোদ বাবু তাহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ভারতীয় জীবনে গুরু

ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুর স্থান একটা অবিসংবাদিত কৌলীন্যের স্থান। এমন কোনও ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথ ভারতে প্রায় নাই, যাহার গোড়ায় গুরুর প্রয়োজনীয়তা খুব দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত হয় নাই। অতএব গুরুতত্ত্বের আলোচনা খুবই একটা অত্যাবশ্যকীয় আলোচনা, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু কি? —এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন প্রকার হইবে। এক এক জনে গুরুকে এক এক প্রকারে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদুচিতভাবে সদ্‌গুরুতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

সহজভাবে আমরা দেখিতে পাই, একজন আর একজনকে না শিক্ষা দিলে যে-কোনও বিষয় আয়ত্ত করা কঠিন। ক, খ, শিখিতে পণ্ডিত লাগে, কামারের কাজ, কুমারের কাজ শিখিতে শিক্ষাদাতার প্রয়োজন হয়। সেতার শিখিতে, এস্রাজ শিখিতে, তবলা শিখিতে ওস্তাদের আবশ্যকতা পড়ে।

কিন্তু এমন দুই চারিজন আশ্চর্য্য ভাগ্যধর প্রতিভাবান্ পুরুষ জগতে সকল সময়ে জন্মিয়াছেন, যাঁরা বিনা ওস্তাদে আশ্চর্য্য তবলা বাজান, সেতার বাজান। একটী বোবাকে আমি দেখিয়াছি,

শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত নিজ কৌতূহল প্রেরিত হইয়াই বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তি দুর্লভ। ইঁহাদিগকে prodigy (অতিমানুষ-প্রতিভা-সম্পন্ন) বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কৃতিত্বের বৈভব ইঁহারা ভোগ করিতেছেন বলিয়া উক্ত হয়।

এইরূপ অসামান্য অতি দুর্লভ দুই একজন ছাড়া সবাইকেই শিক্ষালাভের জন্য অপরের নিকট সাহায্য লইতে হয়,—ইহাই গুরুবাদের বাহিরের মোটা ভিত্তি।

সুতরাং সাধারণ বিচারে সাদা চোখে গুরু একজন শিক্ষক ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। তিনি যাহা শিখিয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে শিখাইতেছেন, তিনি যে সব কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাই অপরকে কল্যাণহেতু ধরাইয়া দিতেছেন, তিনি নিজে যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথটা দেখাইয়া দিতেছেন। কারণ, যে যে পথে চলে নাই, সেই পথ সম্পর্কে উপদেশ দিতে অধিকারী নহে। কলেজে ইতিহাসের এম, এ, ''ইতিহাস'' পড়ান, ফিজিক্স এর এম, এ, ''ফিজিক্স'' পড়ান। এই দৃষ্টিতে যখন গুরুকে দেখি, তখন তাঁর প্রণামের মন্ত্র—

''অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই অবস্থাতেই তাঁর বন্দনা হয়,

''তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥''

তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলেন, পথ দেখাইয়া দিলেন, তারপর তাঁর ছুটী।

পথ দিয়া আমি চলিয়াছি। গভীর অন্ধকার। পথও চিনি না, চিনিলেও বিপদের অন্ত নাই, আলো নাই, হাতে লাঠি নাই। কোন্ সময়ে খাদে পড়িয়া মরিব,—ঠিক নাই। বাস্তবিক কিছুকাল পরে খাদে পড়িলামও। তারস্বরে চীৎকার করিতেছি উদ্ধারের জন্য,—'যদি কেউ দয়াল থাক, তুলিয়া দাও।' দয়াল একজন মিলিল। তিনি বলিলেন,—''টানিয়া তোমায় তুলিব, কিন্তু বাছা, আমাকে 'বাপ্,' বলিয়া ডাকিতে হইবে।'' ইচ্ছা নাই ''বাপ্'' ডাকিব, কিন্তু ঠেকিলে বাঘেও ধান খায়। অগত্যা স্বীকার করিলাম, অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া বাপই ডাকিব। তিনি হাতে টানিয়া তুলিলেন, একটী লাঠি দিলেন, আর একটী বাতি দিলেন,—সুদূরে এক জ্যোতিঃ দেখাইয়া দিলেন,—লক্ষ্য। বাতি পাইলাম—নাম, লাঠি পাইলাম—প্রণালী,—পথ চলিলাম—সেই সুদূর লক্ষ্যে তাকাইয়া—এই লক্ষ্য ''শ্রীভগবান্।'' গুরু কোথায় গেলেন, আর কি করিলেন, তাহা আমার খুঁজিবার প্রয়োজন বা অবসর রহিল না। এই অবস্থা—কর্ম্মযোগীর,—তিনি ব্রহ্মদত্ত সাধনটাকেই প্রধান মনে করিয়া গুরুকে মাত্র পথ-প্রদর্শক বলিয়া গণনা করেন। ইঁহাদেরই প্রণামের মন্ত্র,—'তৎপদং দর্শিতং যেন' ইত্যাদি।

কর্ম্মী গুরুদত্ত সাধনাটাকেই বেশী আদর করেন। কারণ, গুরুর খোঁজ রাখিবার তাঁর অবসর নাই, অতএব গুরু স্বভাবতঃ কতকটা দূরেই, আর পরব্রহ্ম এখনও লাভ হয় নাই, অতএব লক্ষ্যও অনেকটা দূরে। হাতের মুঠায় রহিয়াছে গুরুদত্ত সাধন,—এই সাধনাটাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে কাজে লাগাইয়া ছাড়িবেন। সাধন করিবার আগে গুরুদেবকে একবার তিনি স্মরণ করিতে

পারেন, কিন্তু সমগ্র মন ও প্রাণ তাঁর পড়িয়া থাকে 'সাধনতত্ত্বে।' তান্ত্রিক সাধকেরা কতকটা এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট। তাঁরা গুরুকে অনাদর করেন না কিন্তু সাধনকেই জীবনের চরম চরিতার্থতার পক্ষে সর্ব্বে-সর্ব্বা বলিয়া মনে করেন।

একই গুরু বিভিন্ন শিষ্যের নিকট বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইতেছেন। একজন গুরুকে পথপ্রদর্শক মাত্র মনে করিয়া, পথটী জানিবার ও পথটী চলিবার দিকেই সমগ্র মন দিলেন। ইহার ভিতরে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য এবং নিজ ভবিষ্যৎ নিজে গড়িবার আগ্রহ অত্যধিক। তাই ইনি গুরুসেবা বলিতে সাধারণ আমরা যাহা বুঝি, তাহার প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও, পথটা কি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইতে তাঁর আগ্রহ অফুরন্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন পরিবেশন করিলে যেমন সে আহারে বিলম্ব করে না, তদ্রূপ গুরুদত্ত পথ বুঝিয়া লইবার পরে এই পথের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে তাঁর আলস্য নাই, ভয় নাই, অবসাদ নাই। তিনি তাঁর পরম প্রিয়ের স্পর্শ নিজের মধ্য দিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র, গুরুর মধ্যে নিজেকে বিকাইয়া দিবার রুচি তাঁর নাই। ধনী পিতার উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের মেজাজটা তিনি প্রাপ্ত হন। তাঁর বিচার প্রণালী নিম্নরূপ।

গুরু কে?—না যিনি অন্ধকার দূর করেন। আমার সম্মুখে একটা হ্যারিকেন ল্যাম্প আছে। ইহাই কি অন্ধকার দূর করিতেছে ? প্রথমতঃ তাহাই মনে হইবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এই হ্যারিকেনের ভিতরে যে অগ্নি রহিয়াছেন, অন্ধকার দূর করেন তিনি। হ্যারিকেন—গুরুর দেহ,

ভিতরের অগ্নি—পরমাত্মা। পরমাত্মার প্রভাব এক একটা নির্দ্দিষ্ট দেহের মধ্য দিয়া অত্যন্ত ভাস্বরভাবে প্রকাশিত হয়, তাই দেহটার আদর। যে লণ্ঠন অর্থাৎ দেহ ভাঙ্গা, যার চিম্নি (অর্থাৎ মন) অনুজ্জ্বল, সেই লণ্ঠনের ভিতরে অগ্নি থাকিলেও আলো বিকিরিত হয় না। তাই দেখা যায় শাস্ত্রে অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ, কুষ্ঠী, বাচাল, অস্থির-চিত্ত ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ নিষেধ। ইহার কারণ এই যে, দেহের অপূর্ণতা, লণ্ঠনের ভগ্নতা, তন্মধ্যস্থ অগ্নির জ্যোতি-বিকিরণী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে।

মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমরের উপদেশ ইহার জন্য। যে পথে চলিলে প্রকৃতই নির্ব্বিঘ্ন যাত্রা হইবে,—সেই পথ যদি না পান, তাহা হইলে এই শ্রেণীর শিষ্য নিরাপদ পথ পাইবার জন্য গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করিবেন। যেখানে সহজচক্ষে গুরুকে সামান্য মানব বলিয়া মনে হইতেছে, যেখানে সাধন করিবার পরেও সত্যের আভাস মিলিতেছে না, যেখানে গুরুমুখ-নিঃসৃত অভয়বাণী মনকে একনিষ্ঠ করিতে পারিতেছে না, সেখানে মধুহীন পুষ্প ছাড়িয়া মধুগর্ভ পুষ্পের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে এই শ্রেণীর শিষ্যকেই এবং এই অবস্থাতেই শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিতেছেন। অবশ্য, এইরূপ একস্থান হইতে অপরস্থান ভ্রমিতে ভ্রমিতে জীবন কাটিয়া যাইতে পারে, সেই বিপদ আছে। কিন্তু এখানে শিষ্যের যুক্তি এই যে, বিপথে চলিয়া পরমাত্মাকে না পাওয়ার চাইতে দুই চারি জন্ম সত্যপথ লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান ভাল এবং এই যুক্তির ভিতরে গভীর সত্য যে নিহিত নাই, তাহা নহে।

প্রথমেই ঝোঁকের মুখে বা খেয়ালের বশে গুরুকরণ করিলে, এই বিপদ অনেকের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী। চিত্তাপহারক শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য যেখানে আত্মপ্রস্তুতির অভাব এবং শ্রদ্ধিত চিত্তে সাত্বিক মনে প্রতীক্ষমান হইয়া রহিবার শক্তির যেখানে অভাব, সেখানে এইরূপ বিপদ অপরিহার্য্য। তাই সদ্‌গুরু (অর্থাৎ যিনি সত্য এবং যিনি গুরু), যাঁর ভিতরে সত্য জাগ্রত হইয়াছেন, এমন গুরুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং তিনি যেদিন আসিবেন, সেদিন যাতে তাঁর জন্য হৃদয়-আসন যোগ্যভাবে পাতিয়া দিতে পার,—সেজন্য নিজের সরল, সহজ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়। ইহাই সদ্‌গুরু লাভের কৌশল।

সদ্‌গুরু বহুপুণ্যে বা তাঁর অহেতুকী কৃপায় লব্ধ হয়। যে ভূমিতে হল কর্ষিত হইয়া আছে, তাহাতে কৃপার বারি ও বীজ পতিত হইলে দেখিতে না দেখিতে রমণীয় শ্যাম-শোভায় পূর্ণ হয়।

দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু লইয়া যে এক দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে বৈষ্ণবসমাজে চলিয়াছে, তার মূল উৎস এই অপেক্ষা করিবার শক্তির অভাবে, নিজেকে সদ্‌গুরুর কৃপার জন্য উন্মুখ করিয়া শবরীর ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিবার ধৈর্য্যের অভাবে এবং আত্মপ্রস্তুতির রুচির অভাবে।

শাস্ত্রে কুলগুরু হইতে দীক্ষা লইবার নির্দ্দেশ আছে এবং পৈতৃক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া সকলেই কুলগুরু গ্রহণ করিলাম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু পিতার গুরুর যিনি পুত্র বা কন্যা, তিনি বাস্তবিক প্রস্তাবে হয়ত নিজ জীবনে সত্যের

জাগরণ অনুভব নাও করিয়া থাকিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে দীক্ষা লইলে প্রকৃত পথ জানিবার জন্য বেচারী শিষ্যের "মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায়" পর্য্যটন করিয়া বেড়ান ছাড়া আর গতি কি থাকিতে পারে?

কিন্তু কুলগুরু শব্দের মানে-ই যে, আমরা বুঝি না। কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তেমন গুরু কুলগুরু। তিনি আমার পূর্ব্বপুরুষের গুরু নাও হইতে পারেন, এমন কি হয়ত আমার পৈতৃক দাস-বংশে তাঁহার জন্ম হইতে পারে। কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তিনিই কুলগুরু। তাঁকে গ্রহণই কুলগুরু গ্রহণ। তাঁকে বর্জ্জনই কুলগুরু বর্জ্জন।

কুলকুণ্ডলিনী নীচ বংশেও জাগিতে পারে,—যথা, কবীর, দাদূ, রুহিদাস,—স্ত্রীলোকেও জাগিতে পারে,—যথা, মীরাবাই, যমুনাবাই রামকৃষ্ণসহধর্ম্মিণী ইত্যাদি। কুলগুরুই গ্রহণীয়, অতএব স্ত্রীলোকের ভিতরে সত্যের জাগরণ ঘটিলে, এই যুক্তির বলেই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করা যায়। তথাপি স্ত্রীগুরু গ্রহণ নিষেধ আছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সংক্ষেপে বলিলে এইটুকুই বলিতে হয় যে,—গুরু শিষ্যের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য দায়ী এবং সর্ব্ব বিষয়ের উপদেশ দিতে বাধ্য ও অধিকারী। সাধক-জীবনের এমন বহু সমস্যা আছে, যাহা পুরুষ-শিষ্যকে সমাধান করিয়া দিতে স্ত্রীগুরুর পক্ষে অসুবিধা হইবে। কারণ, যে ক্ষেত্রে স্ত্রীশিষ্যেরা একমাত্র ভক্তিমার্গানুগামিনী হইয়া সকল চিত্ত-বিপ্লব প্রশান্ত করেন, ঠিক সেই ক্ষেত্রে পুরুষ-শিষ্যের স্বাভাবিক পুরুষোচিত

প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করিয়া দেয়। পৃথিবীর ইতিহাস বহুবার দেখাইয়াছে যে, একটী পুরুষের কামনা-বাসনার ইন্ধন যোগাইতে জগতের কত প্রাণ-হনন হইয়াছে, কত দেশ ধ্বংস হইয়াছে। কোনও নারীর কামনার যজ্ঞে জগৎ এমনভাবে নিজেকে আহুতি দেয় নাই।

সাধক মাত্রেরই পরম শত্রু দুর্ব্বার কাম। নারী-শিষ্যারও কাম থাকে,—এমন কি শাস্ত্র ত' নারীর কাম পুরুষের অষ্টগুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু নারীর সংযম-সামর্থ্যও অষ্টগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষের কাম পুরুষজাতির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার সুযোগ পাইয়া তার মনকে নিয়ত বিভ্রান্ত করিতেছে। এই বিভ্রম দূর করিবার দায়িত্ব গুরুর। স্ত্রীগুরু এই দায়িত্ব অতি অল্পক্ষেত্রে নিঃসঙ্কোচে পালন করিতে পারিবেন। এই আশঙ্কাতেই শাস্ত্র স্ত্রীগুরু নিষেধ করিয়াছেন। নতুবা স্ত্রীগুরুতে গুরুশক্তির বিকাশ হয় না,—তার মধ্যে ব্রহ্মজাগরণ ঘটে না,—ইহা নহে।

কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তাঁর পরীক্ষা লওয়া আর এক জন জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষেই সম্যক্ সম্ভব। সুতরাং শিষ্যের পক্ষে গুরুর কুলকুণ্ডলিনী জাগিল, কি না জাগিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু একটী দুইটী সরল সোজা পরীক্ষার উপায়ও আছে। যাঁর সংস্পর্শমাত্র স্বভাবতঃ বিনা উপদেশে চিত্তের নিম্নগামিনী বৃত্তিগুলি থমকিয়া দাঁড়ায়, আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বান অন্তর জুড়িয়া বহিতে আরম্ভ করে, বুঝিতে হইবে, তাঁর কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। যাঁর

সংস্পর্শমাত্র বিনা প্রশ্নে মনের দীর্ঘপোষিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইয়া যায়, বুঝিতে হইবে তাঁর কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। যাঁর বাহিরের উপদেশ অপেক্ষা ভিতরের শক্তি আমার মধ্যে অধিক ক্রিয়াশীলা, সত্ত্বভাবের প্রেরয়িত্রী, বুঝিতে হইবে, তিনি কুলগুরু।

কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগ্রত হইয়াছে, তেমন সিদ্ধ গুরুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিই প্রকৃত দীক্ষা;—কাণে মন্ত্র শুনার নামই সকল স্থলে দীক্ষা নহে। গুরুর কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণ হইল কিনা,—তার পরীক্ষা এইখানে।

যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মহাশক্তি, তাহাই আমার এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে যখন অনুভূত হয়, তখন তার নাম কুলকুণ্ডলিনী। অর্থাৎ পরমাত্মা আর কুলকুণ্ডলিনী একার্থবাচক দুইটী শব্দ। ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে আসিয়া তিনি দেহের প্রভাব মান্য করিতেছেন, যেমন একজন অরণ্যচারী পরমযোগী গৃহস্থ-গৃহে আসিলে গৃহস্থের পারিবারিক শৃঙ্খলাগুলি কতকটা মানিয়া চলেন।

"পঞ্চ ভূতের ফাঁদে
ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"

(রামকৃষ্ণ)

দেহ-মধ্যে ব্রহ্মশক্তি যেন শত-শৃঙ্খল বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি দেহের মনের প্রভু হইয়াও দেহের অভ্যাস ও মনের সংস্কারের কাছে হাত জোড় করিয়া নতজানু হইয়া ভৃত্যের ন্যায় বসিয়া আছেন। ইহাকেই বলে ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনী।

"ঘুম পাড়াতে মন্দ ছেলে
মা আমার ঘুমিয়ে গেলি।"

(সতীশচন্দ্র)

ঘুমন্ত জননী আদ্যাশক্তি-জগন্মাতা কি ভাবে জাগেন, তাহা একমাত্র সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য। কিন্তু যখন জাগেন, তখন দেহের প্রত্যেকটী অণুপরমাণুকে চুম্বকের শক্তি প্রদান করেন। যিনি দেখিতে কদাকার হইয়াও অব্যক্ত আকর্ষণে আমাকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টানিয়া নিতে পারেন, তিনিই কুলগুরু। কুলগুরু মন্ত্রদান করিতে পারেন, নাও পারেন,—মন্ত্রই প্রধান নহে, তাঁর অন্তরের তপপূতঃ ইচ্ছাশক্তিই প্রধান। তাঁর অভয়প্রেরণা বিনা উপদেশে শিষ্যের ভিতরে যাবতীয় অনুভূতি, যাবতীয় অতীন্দ্রিয় আস্বাদনকে স্ফুরিত করিয়া দিতে পারে। শিষ্যের আধার কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে দর্শন-মাত্রেই সে তার গুরুকে চিনিতে পারে। এস্থলে শিষ্যের গুরুবিচার কর্ণ্মী-শিষ্যের মত নহে। তাহা পরে বলিতেছি।

যেখানে গুরুর শুভ্র ইচ্ছা শিষ্যের ভিতরের ব্রহ্মচেতনা জাগাইয়া দিতেছে, সেখানে শিষ্যের চ'খে দেহটা পড়েই নাই। শিষ্যের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি গুরুর পাঞ্চভৌতিক দেহকে অতিক্রম করিয়া ভিতরের স্বরূপ দর্শন করে।

এই স্বরূপ-দর্শনের দুইটা স্তর আছে। এক স্তরে শিষ্য নিজের ভিতরে গুরুশক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াকে দর্শন করিতেছে। ইহাকে সগুণ স্তর বলিব। অপর স্তরে শিষ্য নিজের ভিতরে গুরুশক্তির বিকাশকে দর্শন করিতে করিতে গুরুতে ডুবিয়াছে, তাঁর শক্তিকে তাঁর স্বরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে

না। ইহাকে বলিব নির্গুণ স্তর।

সগুণ স্তরে শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে, "গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুরেব মহেশ্বরঃ" বলিয়া। নির্গুণস্তরে শিষ্য গুরুপ্রণাম করে "গুরুরেব পরব্রহ্ম" বলিয়া।

সগুণস্তরে শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে, "যস্মাৎ জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে, যেনেদং ধার্য্যতে চৈব"—বলিয়া।

নির্গুণস্তরে শিষ্য গুরুকে বন্দনা করে,—"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, দ্বন্দ্বাতীতং"—প্রভৃতি বলিয়া।

সগুণ স্তরে শিষ্য কতকটা ভক্তিপন্থী, শান্ত দাস্যাদি ভাবক্রমে। নির্গুণস্তরে শিষ্য চরম জ্ঞানযোগী, দ্বৈতভাবে বা অদ্বৈতভাবে। গুরুতত্ত্বের কঠিন স্থানটায় আসিয়াছি। ইহা সঠিক বুঝা কতকটা সাধন-শক্তির উপরে নির্ভর করিবেই।

সগুণ স্তরে শিষ্যের নিকটে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর। ব্রহ্মা কেন বলা হইল ? যেহেতু গুরুর সূক্ষ্ম কৃপাশক্তি শিষ্যের ভিতরে এক মস্ত বড় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। শিষ্য গুরুর শক্তিকে আধ্যাত্মিক চেতনার স্রষ্টারূপেই প্রথম সময়ে উপলব্ধি করে। ব্রহ্মা বলিয়া একজন রক্তবর্ণ দেবতা আনিয়া দাঁড় করাইবার প্রয়োজন নাই গুরুর শক্তি শিষ্যের অন্তরে নব নব সৃষ্টির উন্মেষ ঘটাইতেছে,—কত দিব্য অনুভূতির বীজ পড়িতেছে, কত অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন অঙ্কুর মেলিতেছে, কত অপূর্ব্ব সুষমা-মণ্ডিত বিচিত্রতা মাথা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে। গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, তারকা সৃষ্টি পাইয়া নিজ নিজ কক্ষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, গুরু-কৃপায় অন্তরের

অনুভূতি-রাজ্য শূন্যময় অন্ধকারের পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টিতে পরিণত হইল। সৃষ্টির অনুভূতি চরমে পৌছিলে, এই অনুভূতিগুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য গুরুশক্তি ক্রিয়া আরম্ভ করিল। এখানে গুরু পোষক, বর্দ্ধক, পালক। চিত্তের প্রত্যেকটী মঙ্গলময়ী বৃত্তি এখানে গুরুশক্তিতে সুপরিপুষ্ট হইতেছে, প্রবর্দ্ধমান হইতেছে, বিস্তার-লাভ করিতেছে। এতক্ষণ গিয়াছে Creation, এইবা আরম্ভ হইল Consolidation,—এখন গুরুশক্তি পোষণী-শক্তিরূপে প্রতিভাত ও অনুভূত হইতেছে। অতএব, এইক্ষেত্রে গুরু বিষ্ণু।

সৃষ্টি থাকিলেই ধ্বংসের প্রয়োজন। ধ্বংস ছাড়া জগতে কোনও সৃষ্টিই হয় নাই। চিত্তবৃত্তির প্রকাশশীল সাত্ত্বিক স্বভাবের যখন সৃষ্টি হইতেছে, ঠিক্ সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তের তমঃ-স্বভাবের প্রস্পুরিকা বৃত্তিগুলি গুরুশক্তিতে বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী তীক্ষ্ণাগ্র-বিশিষ্ট ত্রিশূল নিজ হস্তে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়া গুরুশক্তি ধ্বংসের তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিল। সৃষ্টি-লীলায় চিত্তে সাত্ত্বিক প্রেরণা জাগিয়াছে, ধ্বংস-তাণ্ডবে-অসাত্ত্বিক কামনা, বাসনা, লালসা, ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিল; সুতরাং "গুরুরেব মহেশ্বরঃ।"

এতক্ষণ শিষ্য সগুণস্তরে ছিলেন। কিন্তু গুরুশক্তির সৃষ্টি-স্থিতিসংহার-লীলা যখন যুগপৎ প্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিল, যখন একযোগে ত্রিধারা আসিয়া সংযুক্ত হইল, ত্রিবেণীর দুয়ার যখন খুলিল, তখন সৃষ্টির ধারা আর ধারা রহিল না, স্থিতির ধারাও আর ধারা রহিল না, সংহারের ধারাও আর ধারা রহিল

না,—হইল দুস্তর মহাসমুদ্র। যেদিকে তাকাও অফুরন্ত জলরাশি, —গুরুশক্তির মহিমার পারাপার নাই, সীমা নাই, ইয়ত্তা নাই। বাক্য তখন মূক, বুদ্ধি তখন স্তব্ধ, অনুভূতি তখন অনির্ব্বচনীয়। তখনই শিষ্য জানিলেন,—"গুরুরেব পরব্রহ্ম।" শিষ্যের জীবনে নির্গুণস্তর আরম্ভ হইল।

নির্গুণস্তরের প্রথম অবস্থায় দ্বৈত প্রকাশমান। শিষ্য নিজেকে গুরু হইতে পৃথক্ দেখিতেছেন। তাঁকে পরব্রহ্ম জানিয়াও ডুব দিয়া তাঁর সঙ্গে এক হইতেছেন না।

নির্গুণস্তরের দ্বিতীয় অবস্থায় অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত। শিষ্য গুরুকে পরব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, নিজে সেই মহাসমুদ্রে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হইয়াছেন এবং নিজেতে ও গুরুতে অভেদ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই শিষ্যকে পরমহংস বলা হইয়া থাকে। আধারই আধেয় কিন্তু চরম অবস্থায় ভেদজ্ঞানরহিত। যাহা বলিতে একযুগ লাগে, তাহা পরমাত্মার কৃপায় সংক্ষেপে এইখানেই আপাততঃ শেষ হউক।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

ফেণী, নোয়াখালী
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪০ *

প্রকৃত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য

অদ্য চট্টগ্রাম জিলা-নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় শর্ম্মা নামক

* ১৩৪০ এবং ১৩৪১ এই দুই সালের উপদেশাবলী ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায় নাই, কতক পাণ্ডুলিপি উইপোকার উদরে, কতক নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে যাহা আপাততঃ হস্তগত হইয়াছে, তাহাই প্রথম সংস্করণে সঙ্কলিত হইল।

জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীচরণে দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু হইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, একথা মনে রাখিবে যে, ধর্ম্মের গোপন-গহন তত্ত্ব সর্ব্ববর্ণে প্রচার ক'রে দেওয়াই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভিতরে তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখা নয়। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সম্পদ সর্ব্বজীবে বিলাতে হবে। শ্রেষ্ঠ সাধনের আস্বাদ সকলকে লাভ করাতে হবে। এই কর্ত্তব্য যে সম্পাদন কত্তে পারে, সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য করল।

চট্টলের ভাবী কর্ম্মিগণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চট্টগ্রাম জেলার ভিতরে আমাদের ভাব, আমাদের আদর্শ অতি অল্প-পরিমাণ প্রচারিত হয়েছে। আমি দু-চার বার চট্টগ্রামে গিয়েছি সত্য, কিন্তু তা শুধু বন্ধুপ্রবর নগেশ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে বিশ্রামের জন্য, কোনো কাজের জন্য নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাদের এই জেলা থেকেই আমাদের আদর্শের পতাকাবাহী বহু স্বার্থত্যাগী আত্মদাতা মহাকর্ম্মীর আবির্ভাব সম্ভব হবে।

বঙ্গের ভাবী কর্ম্মিগণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই ব'লে মনে ক'রোনা যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটামাত্র জেলার ত্যাগী কর্ম্মীদের দ্বারাই চলবে। এ প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা, নোয়াখালী, সিলেট থেকে শুরু ক'রে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, বরিশাল, খুলনা, যশোর থেকে শুরু ক'রে রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ পর্য্যন্ত সব

জেলার ছেলে-মেয়েরা এসে আত্মদানের প্রতিযোগিতা কর্ব্বে। কোনো জেলা কোনো জেলা থেকে নিকৃষ্ট থাকবে না। কোনো জেলা কোনো জেলাকে প্রতিযোগিতায় হঠিয়ে দিতে পারবে না। এক জেলা যদি বলে "আগে চল্," তবে অপর জেলা বলবে—"আরো আগে চল্।" তোমাদের প্রতিষ্ঠান হবে সকল জেলার প্রাণ-স্পন্দনের প্রতিষ্ঠান।

ভারতের ভাবী কর্ম্মিগণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতিষ্ঠানের বলতে গেলে গোড়া-পত্তনই হয় নাই। পুপুন্কীর আশ্রম পরিত্যক্তপ্রায়, রহিমপুর ও মোচাগড়ার আশ্রম অর্দ্ধমৃত; তবু আমি দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র ভারত জুড়ে আকাশের তারকা-নিচয়ের ন্যায় উজ্জ্বল সুন্দর শত সহস্র লোক-সেবাব্রত প্রতিষ্ঠান। এদের ভিতর দিয়ে শুধু বাঙ্গালী যুবকেরা নয়, সমগ্র ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যুবকেরা যুবতীরা ত্যাগের সাধনাকেই অমৃতের সাধনা ব'লে গ্রহণ ক'রে নিরভিমান চিত্তে আত্মোৎসর্গের অনুশীলন কচ্ছে। আমি সুস্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, পাঞ্জাবী ছেলেরা বাংলায় আসছে, বাঙ্গালীর ছেলেরা পাঞ্জাবে যাচ্ছে। মাদ্রাজের ছেলেরা বাংলায় আসছে, বাঙ্গালীর ছেলেরা মাদ্রাজে যাচ্ছে। বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাটী, অন্ধ্র, বিহারী একে অপরের সাথে সুতীব্র প্রতিযোগিতায় সাধনা কচ্ছে এই ব'লে—

"এস কার বক্ষে আছে কত রক্তরাশি,
কে ঢালিতে পারে কত জীবের সেবায় ?"

নিখিল জগদ্বাসীর মিলন-ক্ষেত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শুধু ভারতবাসীর বুকের রক্ত পান ক'রেই এ প্রতিষ্ঠান পরিতৃপ্ত হবে না। এই পরাধীন পদানত দেশের সর্ব্বত্যাগ-ব্রতীদের সঙ্গলাভের লোভে ইংরেজের, জার্ম্মেণীর, ফরাসীর, ইটালিয়ানের, স্পেনিশের, রাশিয়ানের, ইয়াঙ্কির ও অষ্ট্রেলিয়ানের ছেলে-মেয়েরাও ছুটে আসবে, চীনাদের, জাপানীদের ছেলেমেয়েরাও ছুটে আসবে। এই ভাবে আত্মাভিমান-বর্জ্জিত সর্ব্বত্যাগ-ব্রতের সাধনার মধ্য দিয়ে নিখিল জগদ্বাসীর মিলন-ক্ষেত্র রচিত হবে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য

অপরাহ্ণে জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে আসিয়াছেন। সঙ্গে জনৈক সাধুবেশধারীকে আনিয়াছেন। ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার এই বন্ধুটী স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। এদিকে স্ত্রীটী স্বামীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পেতে চায়, পায় না। এই সমস্যার সমাধান কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধকে ঘৃত ও অগ্নির সম্বন্ধ, ভক্ষ্য আর ভক্ষকের সম্বন্ধ ব'লে মনে করা উচিত নয়। বিবাহ যখন করা হয়েছে, স্ত্রীকে ভালবাসা উচিত, স্ত্রীকে সঙ্গ দান করা উচিত, তাকে নিজের প্রভাব-শক্তিতে ক্রমোন্নতির দিকে টেনে আনার চেষ্টা করা উচিত। এর ফলে স্ত্রী আবার স্বামীর পক্ষে এক মহাশক্তির উৎস হ'য়ে দাঁড়াবে। একটা গল্প শুনবে ?

গবানন্দ বাবাজী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—নাম তাঁর গবানন্দ বাবাজী। প্রেমানন্দ, নামানন্দ, জ্ঞানানন্দ এই সব সুন্দর সুন্দর নাম ছেড়ে তিনি গবানন্দ নাম নিলেন কেন ? গরুকে ভালবাসেন কিনা, তাই। গাভী দেখলে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলেন,—মাগো, সন্তানের প্রতি কৃপা রাখিস্। ষাঁড় দেখলে পরে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম করেন আর ধুতুরা ফুলের মালা দিয়ে তাকে সাজান। দু-একটা শিংয়ের গুঁতা' মাঝে মাঝে খান না, তা' নয় কিন্তু তাতে তাঁর উৎসাহ একটুও কমে না। স্তুতি ক'রে বলেন,—মাগো, তোরা আছিস্ ব'লেই ঘরে ঘরে শিশুরা বাঁচে, বাবা হে, তোমরা আছ ব'লেই অবাধে গোকুলের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে আর ঘৃত-ব্যবসায়ীরা সস্তায় ভেজাল ঘী বেচতে পারছে। নইলে কি হায়, ভারত-জোড়া হাজার হাজার ধর্ম্মশালার পত্তন হ'ত সংসারী মানুষের পাপক্ষয়ের রাস্তা রূপে ? জয় গোমাতাকী জয়, জয় গোবাবাকী জয়। উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনিটী দিয়েই তার মনে হ'ত, 'জয় গবানন্দকী জয়' কথাটা কি কেউ কখনো চীৎকার ক'রে বল্‌বে না ? বল্‌বে, তবে একটু সময় নেবে। এই ফাঁকে ফোঁটাতিলকগুলি একটু ভাল ক'রে রপ্ত ক'রে নিই।

শুধু গোমাতাকী জয় ব'লেই গবানন্দ ক্ষান্ত হন না। নারীমাত্রকেই তিনি ভালবাসেন। বলেন, ভালবাসাই ত' ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম দিয়ে জগতে কি প্রয়োজন ? যে যত পার, কেবল ভালবাস আর ভালবাস। যাকে মন চায়, তাকেই ভালবাস।

ভালবাসার আবার বাছ-বিচার কি ? ভালবাসার চোখে জাতিভেদ নেই, আশ্রমভেদ নেই, দ্বন্দ্ব-তর্ক নেই। ভালবাসাই ঈশ্বরের স্বরূপ, যে ভালবাসে সে ভগবানকে পায়।

কেউ গবানন্দের এসব উপদেশ মন দিয়ে কাণ পেতে শোনে, কেউ বলে লোকটা আসলে লম্পট। কেউ কেউ বলে প্রেমতত্ত্বের আলোচনার মধ্য দিয়ে ইনি মানুষের সঙ্গে খাতির করেন, পরে যা' করেন, তা' অশ্লীল, কদর্য্য এবং সমাজ-বিরোধী। এমন সাধুর সঙ্গ কত্তে নেই। কেউ বা বলে, বলিস্ কি, এমন সাধু সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিতে আর কেউ কখনো আবির্ভূত হয়েছেন ? ইনি থাকেন সাধারণ লোকের মত কিন্তু এঁর যোগবল জানিস ? ইনি তালাবদ্ধ ঘরের মধ্যে ব'সে থেকেও সূক্ষ্মদেহে দেয়ালের ভিতর দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে রিক্সায় চেপে তিন মাইল বেড়িয়ে আস্তে পারেন, সাত হাজার মাইল দূরে গিয়ে ভক্তদের দেখা দিয়ে এক নিমেষের মধ্যে স্বস্থানে ফিরে আসতে পারেন। এর তুল্য লোক কি কোথাও হবে ?

মোট কথা, যশও আছে, অপযশও আছে। অপযশকারীরা দুদিন দুকথা ব'লেই থেমে যায়, যশোচ্চারণকারীরা কে কত বেশী পাকা খবর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কত্তে পারে, ধারাবাহিকভাবে তার প্রতিযোগিতা ক'রে যেতে থাকে। ফলে দিনের পর দিন নূতন নূতন মহিমার প্রচার হ'তে থাকে আর অপযশকারীদের অস্পষ্ট ধ্বনি এই কল-কল্লোলের নীচে চাপা পড়ে যায়।

সেই দেশে ছিল এক দম্পতি, এক নারী আর এক পুরুষ। নাম তাদের ধর্ম্মদাস আর সুরঙ্গিকা। ধর্ম্মদাসের ধর্ম্মে মন, সুরঙ্গিকা রাঁধে ভাল। ধর্ম্মদাস আজ করে ব্রত, কাল করে উপবাস, পরশু তীর্থযাত্রা,—সুরঙ্গিকা আজ রাঁধে পায়েস, কাল রাঁধে পিঠে, পরশু রাঁধে পলান্ন। কিন্তু হায়, ধর্ম্মদাস সুরঙ্গিকাকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যায় না, সব ধর্ম্ম সে একা কর্ব্বে। আর সুরঙ্গিকার অমন ভাল ভাল রান্না-করা খাবার ধর্ম্মদাসের রসনায় রোচে না, সে খাবে বেগুন-পোড়া, নিমপাতা ভাজা আর বিল্বপত্রের শুক্ত। ফলে সুরঙ্গিকাকে অত-যত্ন-ক'রে রান্না করা ভাল ভাল খাবার একা একাই খেতে হয় আর ওকে তাকে ডেকে খাওয়াতে হয়। ধর্ম্মদাস ভাবে, মেয়েমানুষ আবার একটা মানুষ ? ওরা সব সাক্ষাৎ নরক, সাক্ষাৎ যমের বাড়ীর রাস্তা। ওদের যত বর্জ্জন করা যায়, ততই ভাল। সুরঙ্গিকা ভাবে, ভাল ক'রে খাও, দাও, ঘুমাও, আরাম কর, বিলাস কর, ভোগ কর। ভোগ ছাড়া কি কখনো ত্যাগ হয় ? বৃথা বৃথা উপবাস ক'রে বাপূ শরীরকে কেন কষ্ট দেওয়া ? পেট ভ'রে খাও, মজা করে ঘুমাও, বিছানা-পত্র রাখ ছিমছাম পরিষ্কার। শরীরে যাতে সুখানুভব হয়, তারই জন্য না জীবন।

একদিন এক বন্ধু এসে ধর্ম্মদাসের বাড়ী হাজির হ'ল। বল্লে, —ও ভাই ধর্ম্মদাস, ধর্ম্ম কত্তে হয় ত' গবানন্দ বাবাজীর শিষ্য হও। এমন উপদেশ দেবেন যে স্বর্গের দুয়ার ফক্ ক'রে একদিন হঠাৎ খুলে যাবে। ধর্ম্মদাস বল্লে, তাই নাকি ? বেশ ত' তাঁকে একদিন এই বাড়ীতে ডাকো, সাধুসেবা ক'রে আমরা কৃতার্থ

হই। সুরঙ্কিকা বল্লে,—কাজ নেই ডেকে এমন সাধুকে। দূর থেকেই তাঁর খুরে প্রণাম। কেবল ব্রত, কেবল উপোস, খাবার নাম নেই, শোবার নাম নেই, সারারাত জেগে কেবল কর জপ আর তপ, এমন সাধু দিয়ে আমার বাড়ীতে কোনো কাজ নেই।

গবানন্দের শিষ্য সুরঙ্কিকার কাণে কাণে বল্লে,—না বৌদি, সে ভাবনা ক'রো না। গুরু আমাদের কল্পতরু। যে যেমনটী চান, তাকে তেমনটী উপদেশ দেন, তাকে তেমন পথের নির্দ্দেশ দেন। নইলে কি আর তিন লক্ষ লোক ঐ কমল-চরণে মাথা-কপাল খুঁড়ত। ধর্ম্মদাসকে তিনি তার রুচিমত পথ বাৎলে দেবেন, আবার তোমাকে দেবেন তোমার মনোমত পথ। যখন স্বচক্ষে সব দেখবে, তখন বুঝবে। এখন বুঝবে কি ?

গবানন্দ বাবাজী ধর্ম্মদাসের বাড়ীতে এলেন। ধর্ম্মদাস ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলতে লাগল,—হে প্রভো, আমার চোখের আঁধার কেটে দাও, আমাকে সত্য পথ দেখাও, আমাকে উদ্ধার কর।

গবানন্দ বল্লেন,—করব বৈ কি? তোমাদের উদ্ধারের জন্যই ত' আমার গোলোক-বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এই নচ্ছার ধরাধামে আসা। কি নোংরা, কি নোংরা। কেউ চায় না ঈশ্বরকে, সবাই চায় কেবল ভোগ, কেবল পূতিগন্ধময় হেয় সুখ। তুমি বড় উত্তম আধার, তুমি কি চাও, আমাকে খুলে বল, আমি সব তোমাকে দিব।

সুরঙ্কিকা বলিল,—প্রভো, দয়া ক'রে যদি এসেছ, আমার হাতের রান্না একবারটী খাও। এমন সুভোগ্য খাদ্য বর্জ্জন ক'রে

স্বামীটা আমার উপোসে উপোসে কৃশ হ'য়ে গেল। যাতে ওঁর এই দিকে মন আসে, তার একটু ব্যবস্থা কর প্রভো।

গবানন্দ বল্লে,—করব বৈ কি। নিশ্চয় কর্ব্ব। ওকেও ওর পরমপ্রাপ্য দেব, তোমাকেও তোমার অভীষ্ট দান কর্ব্ব। ভয় পেয়ো না, অধীর হ'য়ো না। কথায় বলে, সবুরে মেওয়া ফলে। ধৈর্য্য চাই, সহিষ্ণুতা চাই, আর চাই আমার বাক্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন অকুণ্ঠ বিশ্বাস।

এখন গবানন্দ প্রায়ই এখানে আসেন। আগে আসতেন দুই একজন শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে, এখন আসেন প্রায়ই একাকী। আগে আসতেন দিনের বেলায়, এখন আসেন নিশাগমে। আগে এসে দুচার মিনিট বসে উপদেশ দিয়েই চ'লে যেতেন, এখন নৈশ আহারটী এখানেই সারেন। ধর্ম্মদাসের যখন দুয়ার বন্ধ করার প্রয়োজন হ'ত, তার আগ পর্য্যন্ত এখানেই থাকেন, কেবল ধর্ম্মকথা বলেন আর সুরঙ্কিকার হাতের নানা রকমের খাদ্য খেয়ে কেবল প্রশংসা করেন,—সুরঙ্কিকা গো, আগের জন্মে তুমি দ্রৌপদী ছিলে। সুরঙ্কিকা বলে, আমি দ্রৌপদী হ'তে যাব কেন, তার যে পঞ্চস্বামী ছিল। আমি ছিলাম শিবের ঘরণী অন্নপূর্ণা। গবানন্দ বলেন,—তাও তুমি মিছে বলনি, আর আমি ছিলাম শিব। আমাকে রান্না ক'রে খাওয়াবার জন্যই ত' তুমি এমন অপূর্ব্ব রন্ধন-বিদ্যা শিখেছিলে। সুরঙ্কিকার এই কথাটা আদৌ ভাল লাগে না। কিন্তু সে কথাটার কোনো প্রতিবাদ সে করে না, চুপ মেরে যায়।

এসব কথা লক্ষ্য ক'রে শোনবার মত অবসর নেই ধর্ম্মদাসের।

সে সব সময়ে ব্যস্ত থাকে তার জপ, তপ আর আরাধনা নিয়ে। চোখের সামনেই চোখের আড়ালে কে কি বল্‌ছে আর কে কি করছে, সে ভাবনা তার নেই। সে কেবল ভাবে, পরমেশ্বর, কবে আমাকে কৃপা করবে, কবে আমাকে দেখা দেবে।

গবানন্দ একদিন বল্লে,—ওহে ধর্ম্মদাস, ঘরে ব'সে ব'সে অত সহজে ভগবানকে পাওয়া যায় না। এখান থেকে সাতক্রোশ দূরে দূরে এক একটী ক'রে সাতটী অরণ্য আছে। তার প্রত্যেকটার মাঝে কাছাকাছি সাতটী ক'রে মন্দির আছে। একমাস ক'রে এক একটী অরণ্যে তোমাকে ষোল ঘণ্টা ক'রে থাকতে হবে। এক এক মন্দিরে এক এক ঘণ্টা ক'রে স্তোত্রপাঠ আর দুঘণ্টা কাল এই মন্দিরগুলি মৌনভাবে প্রদক্ষিণ,—এই কাজ তোমাকে কত্তে হবে। এই আঠারো ঘণ্টার মধ্যে নিদ্রা গেলে চলবে না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার গৃহে ফিরে আসতে পার, ইচ্ছা হ'লে ওখানেই থেকেও যেতে পার, এই ভাবে কর আত্মশুদ্ধি। তারপরে বল্‌ব আসল পথ।

সুরঙ্গিকা বল্লে,—সে কি প্রভো, এ রকম পরিশ্রম কত্তে গেলে উনি বাঁচবেন কত দিন? আর সারারাত্রি উনি বাইরে থাক্‌লে আমার যে একা থাক্‌তে ভয় কর্ব্বে।

গবানন্দ বল্লেন,—ভয়? কেন ভয়? রাত নটা পর্য্যন্ত ত' আমিই থাকি, বাকী রাতটুকু লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। ভয় আবার ঢুকবে কি ক'রে? আচ্ছা, বল যদি, আমি রাত বারোটা পর্য্যন্ত ব'সেও খাওয়া দাওয়া কত্তে পারি। তোমার হাতের রান্নার লোভ আমি ত' আর সামলাতে পারব না।

কথাটা সুরঙ্গিকার ভাল লাগে না। তবু চুপ ক'রে সে থাকে।

ঊনপঞ্চাশ দিনের কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে ধর্ম্মদাস ঘরে ফিরে এল। মনে তার দুর্জ্জয় সাহস। বল্লে—কি গবানন্দ বাবাজী, এর পরে কোন্ পথ, বলে দিন। কঠিন ব'লে আমি পশ্চাৎ-পদ হব না।

সুরঙ্গিকা বল্লে,—না না, আর তোমার ধর্ম্ম ক'রে কাজ নেই। এখন তুমি ঘরেই থাক। ঘরে ব'সে ধর্ম্ম হয় হোক, না হয় না হোক।

গবানন্দ বল্লেন,—সে কি কথা? এতদূর এগিয়ে গিয়ে মাঝপথে ধর্ম্মদাস থেমে যাবে? তা' কখ্‌খনো হয় না। শোনো ধর্ম্মদাস, এবার সোজা হিমালয়ে। এই আমি পরিচয়-পত্র লিখে দিচ্ছি। বাবা কালী কম্বলীওয়ালার অন্নছত্রে রুদ্রপ্রয়াগে প্রত্যহ ঠিক সময় মতন আহারীয় পাবে। সেখানে দৈনিক চার ঘণ্টা কর্ব্বে শীর্ষাসন, ছয় ঘণ্টা কর্ব্বে ময়ূরাসন, আট ঘণ্টা করবে গালবাদ্য, আর ছয় ঘণ্টা কর্ব্বে প্রাণায়াম। তিন বৎসরকাল এভাবে ক'রে ঘরে ফিরে এস। দেখো কেবল ঈশ্বর দর্শনই কর্ব্বে না, স্বয়ং ভগবান্ হ'য়ে যাবে। তোমার দিব্য লীলায় ধরণী পবিত্র হবে। সূক্ষ্মদেহে চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক ব্রহ্মলোক বিচরণ কর্ব্বে। সূক্ষ্মদেহে এই গৃহে এসে তোমার স্ত্রীকে দেখা দিয়ে যাবে। কখন যাবে, কখন আস্‌বে, কেউ বুঝতেও পারবে না। তোমার অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি দেখে চারদিকে রোমাঞ্চের সৃষ্টি হবে।

ধর্ম্মদাস হিমালয়ে গেল। রুদ্র-প্রয়াগে অলকানন্দার তীরে তপস্যায় বস্‌ল।

একদিন গভীর রাত্রে সুরঞ্জিকা চীৎকার ক'রে উঠল,—কে, কে, কে এসেছে এখানে আমার শয্যার উপর। শীঘ্র দূর হও, নইলে চীৎকার ক'রে পাড়ার লোক একত্র ক'রে ফেলব।

সুরঞ্জিকা বাতি জ্বালল। দেখল, ঘরে কেউ নেই। কিন্তু দুয়ার খোলা। দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে সে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সারারাত ঘরে বাতি জ্বালাই রইল, ভয়ে আর তার ঘুম হ'ল না।

পরদিন গবানন্দ আসতেই সে প্রশ্ন কল্ল,—বলতে পারো, কাল আমার ঘরে কে এসেছিল?

গবানন্দ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বল্লেন,—এসেছিল? সত্যি এসেছিল? আসা ত' বিচিত্র নয়। তপস্যা কত্তে কত্তে তার অণিমা-লঘিমা সিদ্ধি হয়েছে। এখন সে রেল ছাড়া পায়ে হাটা ছাড়া দূর-দূরান্তে সূক্ষ্মদেহে চ'লে আসতে পারে। ধর্ম্মদাস এখন সিদ্ধপুরুষ। সে এখন কোন্ কাজ না কত্তে পারে।

—কিন্তু দুয়ার খোলা ছিল কেন?

—হয়ত ধর্ম্মদাসই খুলে নিয়েছিল।

—প্রয়োজন? সূক্ষ্মদেহে ত' তিনি বন্ধ ঘরেও আসতে পারেন।

—মহাযোগীদের আচরণের উদ্দেশ্য কে বুঝতে পারে?

—তুমিও পার না? তুমি ত' ঠাকুর মহাপুরুষ।

—মহাপুরুষ ব'লে কি আর ধর্ম্মদাসের মত মহাপুরুষ। আমরা সামান্য মহাপুরুষ, ধর্ম্মদাস অসামান্য মহাপুরুষ।

—তবে তোমার শিষ্যরা তোমাকে অবতার ব'লে প্রচার করে কেন?

—করে ওদের খেয়াল-খুশীতে। আমি কি আর ওদের ঐরূপ প্রচার কত্তে কখনো বলেছি? তবে এসব এখন থাক্, আজ আর তোমার এখানে খাব না, পেটটা তেমন ভাল নেই। কাল আবার আসব। তুমি বিন্দুমাত্র ভয় পেয়ো না। সিদ্ধপুরুষদের সিদ্ধলীলা দেখে সাধারণ লোক ভয় পেতে পারে, কিন্তু তুমি নিজেকে অসাধারণ ব'লে জানবে সুরঞ্জিকা। নিজেকে সাধারণ ব'লে ভাব বলেই ত' ভয়।

এখন থেকে গবানন্দ রোজই আর সন্ধ্যার সময়ে সুরঞ্জিকার সুরঞ্জিত খাদ্য-সামগ্রী খেতে আসে না। যে দিন সুরঞ্জিকা রেঁধে বেড়ে আয়োজন ক'রে আসন সাজিয়ে ব'সে থাকে, সেদিন হয়ত গবানন্দ রাত বারটা পর্য্যন্ত এলই না। তখন সুরঞ্জিকা খাবারগুলো ঢেকে রেখে না খেয়েই দরজা ভেজিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর হঠাৎ ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে। তাইতো, ঘরে কেউ ত' নেই! তবে কে এতক্ষণ স্নেহভরে তার মুখে বুকে, পেটে, পিঠে হাত বুলোচ্ছিলো? এদিকে দরজাও দেখি খোলা! নিশ্চয়ই এ সব গবানন্দের কাজ। দরজায় জানলায় কোথায় জানি কি এক কৌশল খাটিয়েছে। এই দুষ্ট লোকটা ঘরের ভিতরে আচ্ছা ক'রে আগল বন্ধ ক'রে দেওয়ার পরেও কেমন ক'রে যে ঢোকে আবার কেমন করে যে বেরিয়ে যায়, সুরঞ্জিকা কিছুই যে টের পায় না। এমন গভীর ঘুম সুরঞ্জিকার আসে কি ক'রে? তবে কি গবানন্দের শিষ্যেরা যে সব প্রসাদ নিয়ে আসে, তার ভিতর নিদ্রাকারক কোনও কিছু আছে?

সকাল বেলা বিষণ্ণ মনে সুরঞ্জিকা দাওয়ায় বসে এ-সব

দুশ্চিন্তা করছে, এমন সময় এক গুরুভগিনী, মানে গবানন্দের এক চেলী, এসে প্রতিদিনকার নিয়মমাফিক সুরঙ্কিকার হাতে তুলে দিলে প্রসাদ আর নির্ম্মাল্য আর বলল,—শোন দিদি, মজার কথা, আজতো আমাদের গবানন্দ ঠাকুরের এখানে এসে থাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সন্ধ্যের সময় চোর-বাহাদুর মাড়োয়ারীর বাড়ী থেকে একে একে তিন তিনখানা মোটরগাড়ী এল। ঠাকুরকে চোর-বাহাদুরের বাড়ী যেতেই হবে, নইলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। সেখানে গিয়ে সারারাত্রি যা কাণ্ড হ'ল দিদি, কি আর বল্‌ব। যেন একেবারে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। ঠাকুর গবানন্দ সারারাত সেখানেই রইলেন, কত ক'রে নাচলেন, আর কত বাঁশী বাজালেন। এই নাও দিদি উৎসবের প্রসাদ, এমন প্রসাদ আর পাবে না।

সুরঙ্কিকা কোনো কথা বল্ল না। তবে প্রসাদ হাত পেতে নিল কিন্তু অন্য দিনের মত ভক্তিভরে আর মাথায় ছোঁয়াল না।

গবানন্দের চেলী যখন চলে গেল, তখন সুরঙ্কিকা সেই প্রসাদ আর নির্ম্মাল্য ঘরের বাইরে ফেলে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল সেই প্রসাদ আর নির্ম্মাল্যের গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে একটা ভ্রমর সেখানে বসতে না বসতেই ঘুমিয়ে পড়ল। দেখে সুরঙ্কিকা আশ্চার্য্যান্বিত হ'ল। কিছুক্ষণ পরে দেখে, কোথা থেকে এক জাঙ্গাল পিঁপড়ে এসে হাজির হয়েছে। যেটি কাছে আসে, সেটিই ঘুমিয়ে পড়ে। সুরঙ্কিকার মনে হ'ল, তবে রোজ রোজ যে প্রসাদ আর নির্ম্মাল্য সকাল বেলা আমাকে দিয়ে যায়, তার মধ্যে ঘুমের ঔষধ আছে! একটা পিঁপড়ে বা ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে, মানুষের হয়ত একটু বেশী সময় লাগে। আমাকেও

কি তবে এভাবেই রোজ ঘুম পাড়ান হয় আর আমার স্বামী আমার কাছে এসেছিলেন ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়? আজ আমি ঘুমের ভাণ কর্ব্ব, কিন্তু ঘুমুব না। দেখি আজ কি হয়।

সন্ধ্যার সময়ে গবানন্দের চেলী এসে খবর দিয়ে গেল, আজ প্রভু রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ দেবেন, অন্ন-ব্যঞ্জন তৈরী রেখো। সুরঙ্কিকার ইচ্ছা হ'ল বলে, "না, আর ওসব এখানে চল্‌বে না" কিন্তু সুরঙ্কিকা তা' বল্‌তে পারল না। মনের আতঙ্ক মনেই চেপে রেখে মুখে বল্লে,—আচ্ছা বেশ! তোমরাও আসবে ত'? কজন আসবে?

চেলী বল্ল,—আমাদের আর আসা হবে না। তোমাদের ভাব-সাবের মাঝে আমাদের থাকা উচিত নয়।

—মানে?

—তুমি ত' ঠাকুর গবানন্দের প্রধান ভক্ত। তিনি তোমার কথায় ওঠেন বসেন, তুমিই ত' তার সবচেয়ে প্রিয়। একথা আজ আর এই শহরে কে না জানে?

—এসব তুমি কি বলছ?

—আমি বলব কেন, সহরশুদ্ধ সবাই বল্‌ছে যে, সুরঙ্কিকার মত ভাগ্যবতী আর কেউ হয় না, একেবারে স্বয়ং প্রভুর পাটরাণী।

—ছিঃ ছিঃ, এসব তুমি কি বলছ?

—সত্যি ভাই, আমার ভুল হ'য়েছে। পাটরাণী বলাটা ঠিক হয়নি। বলা উচিত ছিল প্রাণেশ্বরী। তুমি আমাদের পরমদয়াল গবানন্দ ঠাকুরের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

এবার সুরঙ্কিকা ক্রুদ্ধ হ'ল। বলল,—এসব ইতর কথা যখন

মুখে উচ্চারণ কত্তে তোমাদের বাধল না, তখন বুঝতে পাচ্ছি, তোমরা অতি অসৎ। বলে দিও গবানন্দ ঠাকুরকে, আমার এখানে প্রসাদ দিতে তাঁকে আসতে হবে না। আমি রাঁধব না।

—"যতই মান-অভিমানের পালা কর না কেন গো রাধে, পরিণামে ঐ ছি-চরণেই তোমার গতি,"—এই কথা ব'লে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চেলী চলে গেল।

সত্যই সুরঙ্কিকা আর রাঁধল না। সত্যই গবানন্দ আর এল না। দরজা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে সুরঙ্কিকা বিছানার কোণে চুপ ক'রে ব'সে রইল। স্বামী ধর্ম্মদাস কেবল জপতপ নিয়ে ব্যস্ত ব'লে সে বিরক্ত হ'ত কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা দেবার নাম ক'রে একি এক পাষণ্ড এসে তার ঘাড়ে চেপেছে!

গভীর রাত্রে হঠাৎ বাইরে যেন কাদের ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলার আওয়াজ শুনা গেল।

—নাঃ, মেয়েটা নেহাৎ জানোয়ার। এত দিনেও সে বুঝল না যে, আমি কি চাই।

—খুব বুঝেছে, বুঝতে কি আর বাকী আছে? নইলে কি আর তার শরীরে পোয়াতির লক্ষণ ফুটে উঠেছে? তুমি ত' ভাবছ, সে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমোয় নি সে এক দিনও, ঘুমের ভাণ ক'রে রয়েছে। নইলে এমন অবস্থায় পড়লে কি কোনো সতী নারী চুপ ক'রে থাকে? সে চীৎকার ক'রে কাঁদে। কিন্তু তুমি ঘরে ঢুকেছ কি ক'রে?

—ঢুকেছি? ঐ দেখ, ঘর মেরামতের সময়ে কারিকর দিয়ে কৌশলে ছাদের পাশেই একটা দরজা করিয়ে রেখেছি। এটার

খবর সুরঙ্কিকা জানে না। সেই গুপ্ত-পথে আসি, আর সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই। সুরঙ্কিকাকে সব সময়েই বলি, দেখ তোমার স্বামী ধর্ম্মদাসের অলৌকিক ক্ষমতা জন্মেছে। সে অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি সিদ্ধি লাভ করেছে। সূক্ষ্মশরীরে-সর্ব্বত্র ধর্ম্মদাস যাতায়াত কত্তে পারে। সে তোমার কাছেও আসে। শত হ'লেও স্বামী ত! যতই যোগতপস্যা করুক, স্ত্রীকে কি কখনো হেলা কত্তে পারে? কখখনো না।

শুনতে শুনতে সুরঙ্কিকার শরীর হিম হ'য়ে উঠল। সে ভাবল, তাই ত' এতদিন খেয়ালই করিনি যে, শরীরের কতকগুলি লক্ষণ খুবই সন্দেহজনক। কিন্তু তার ত' কোনো কারণ নেই। ভেবেছি হয়ত এসব নিতান্তই অসুস্থতা। আজ ত' দেখা যাচ্ছে, গবানন্দ আমার ঘুমের ঘোরে সর্ব্বনাশ করেছে। ভাবতে ভাবতে তার দেহ-মন হঠাৎ ক্রোধে থরথরে কাঁপতে লাগল। সে ঠিক করল, আজ গবানন্দকে হত্যা কত্তে হবে। স্বামীর পরিত্যক্ত অসিখানা সে আস্তে আস্তে দেওয়াল থেকে নামাল। কোষমুক্ত ক'রে অসি-হস্তে সে নৃমুণ্ডমালিনীর মত খাটের এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু গবানন্দের চেলী বললে,—ঠাকুর হে, আমাকে ত' তিব্বতী যোগ শিখানোর নাম ক'রে ভজিয়েছিলে। সুরঙ্কিকাকে সেই পথে কাবু কত্তে পারলে না। তাকে দিলে নিদ্রার ঔষধ। কিন্তু আজ সে নিশ্চয়ই ঘুমোয় নি। লক্ষ্য কর, ঘুমন্ত লোকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সুরঙ্কিকা জাগ্রত। এখন গেলে তোমার বিপদ হবে। আমাদের তুমি সর্ব্বনাশ করেছ, কিন্তু

তোমার অপমৃত্যু আমরা চাই না ঠাকুর।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় সুরক্ষিকার সমস্ত রাত্রি গেল। ভোর হ'তেই ঘরে দরজায় কুলুপ মেরে সে ছুট্‌ল তার স্বামীর সন্ধানে।

এদিকে রুদ্র-প্রয়াগে সুদীর্ঘ তপস্যার পরে ধর্ম্মদাস এক দৈববাণী শুন্‌ল। গভীর রজনীর নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে এক গম্ভীর কণ্ঠ বজ্র-নিনাদে ধর্ম্মদাসকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগল, —হে ধর্ম্মদাস, বিবাহ করেছ ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে, অগ্নি সাক্ষী ক'রে, পবিত্র মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ ক'রে, কিন্তু ধর্ম্মপত্নীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেশে পরিত্যাগ ক'রে এখানে করছ শৈলকন্দরে বাস আর পালন করছ ব্রত-উপবাস। তোমার স্ত্রীর অসহায়তার সুযোগে যদি কোনও পাপিষ্ঠ তার সর্ব্বনাশ করে, সেজন্য দায়ী হবে কে?

ধর্ম্মদাস ভেবে দেখল, কথা ত' মিথ্যা নয়। একথাটা অনেক দিন সে নিজেও ভেবেছে কিন্তু কোনও সমাধান করতে পারেনি। দৈববাণীর উত্তরে সে প্রশ্ন করল,—হে প্রভু অন্তর্য্যামী, স্ত্রীকে যদি ধর্ম্মপথে টেনে আনা না যায়, তবে তাকে পরিত্যাগই কি শ্রেয়ঃ নয়?

দৈববাণী বজ্রকণ্ঠে উত্তর করলেন,—একথা অন্যের পক্ষে খাটতে পারে, তোমার পক্ষে নয়।

পরদিন প্রত্যূষে ধর্ম্মদাস ছুট্‌ল গৃহের পানে। হৃষীকেশ অবধি নামতেই পথিমধ্যে দেখতে পেল রোরুদ্যমানা সুরক্ষিকাকে। স্ত্রীকে দেখেই ধর্ম্মদাস সাদরে বক্ষে টেনে নিল। বলল,—হে সুরক্ষিকা, তোমাকেই এখন আমার প্রয়োজন। কিন্তু ঘর ছাড়লে

কবে এবং কেন?

সুরক্ষিকা কেঁদে ধর্ম্মদাসের চরণতলে লুটিয়ে পড়্‌ল। বলল, —স্বামি, আমার কথা শুনে আর তোমার কোনও কাজ নেই, আমাকে দিয়ে তোমার আর কোনও প্রয়োজনও নেই। আমাকে শুধু এই অনুমতিটুকু দাও, আমি এই গঙ্গার স্রোতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেই।

—সে কি কথা বলছ সুরক্ষিকা। আমি ত' তোমার কথার কোনও মানে বুঝতে পারছি না।

—মানে বুঝে তোমার কোনও কাজ নেই। তুমি শুধু মৃত্যুর অনুমতিটুকু দাও। আমি অপবিত্রা, আমি কলঙ্কিনী।

ধর্ম্মদাস চিন্তিত হ'ল। ক্ষণকাল পরেই সে আত্মস্থ হ'য়ে বলল,—তপস্যার ফল ক্রোধ নয়,—ক্ষমা। সাধনার ফল রোষ নয়,—স্নেহ! যতদিন সত্যিকারের তপস্যা করিনি, ততদিন তোমার ধর্ম্মে অরুচি ক্ষমা করতে পারিনি; যতদিন সত্যিকারের সাধনা করিনি, ততদিন তোমাকে স্নেহও করিনি। ভুল যতই করো, ক্ষমা করতে পারব।

সুরক্ষিকা কেঁদে কেঁদে সমস্ত ঘটনা বলল। সর্ব্বশেষে বলল, —না, প্রভু, আমাকে বর্জ্জন করা উচিত। লোকের মুখে মিথ্যা কলঙ্ক রটেছিল ব'লে রামচন্দ্র সীতাকে দিয়েছিলেন বনবাস, আর আমি সত্যি সত্যি পতিতা হ'য়েও তোমার ক্ষমা পাব? না, ক্ষমা আমি চাই না।

ধর্ম্মদাস বল্লে,—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। ক্ষমাই আমি তোমাকে দেব।

সুরক্ষিকা কাঁদতে কাঁদতে বলল,—তোমার মত মহান্ পুণ্যপুরুষের জীবনকে আমি আমার অপবিত্র স্পর্শ দিয়ে কলুষিত করব না।

বলতে বলতে সুরক্ষিকার চক্ষু বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে লাগল। সমস্ত বক্ষ চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল। হঠাৎ নিদারুণ হিক্কা এল, সমস্ত শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সুরক্ষিকা ধর্ম্মদাসের পদতলে লুণ্ঠিত হ'ল।

"কি হ'ল, কি হ'ল" বলতে বলতে ধর্ম্মদাস সুরক্ষিকার চোখে মুখে জল ছিটাতে লাগল। কিন্তু নিমীলিত চক্ষু আর উন্মীলিত হ'ল না।

চোখের জল ফেলে ধর্ম্মদাস কাতর কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠল,—ঠিক যেই সময়টায় তোমাকে আমি সত্যি ক'রে গ্রহণ করেছিলাম, ঠিক সেই সময়টায়ই তুমি চ'লে গেলে ?

শ্মশান-সংস্কারের কাজ সমাপ্ত ক'রে ধর্ম্মদাস আবার রুদ্র-প্রয়াগ ফিরে গেল।

পত্নী তোমার যেমনই হউক, তাকে ধর্ম্মপথে তোমার সঙ্গে রাখার চূড়ান্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নইলে গবানন্দের পাল্লায় প'ড়ে অনেক রমণীর চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে।

চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

গতকল্য শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুরে আসিয়াছেন। জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিলেন,—ভবিষ্যতে আমরা কি একটা "সম্প্রদায়" হ'য়ে পড়ব ?

একক সাধনে সম্প্রদায় নিষ্প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একক সাধনে সম্প্রদায়ের প্রয়োজন নেই, শুধু গুরুপরম্পরা মেনে চল্‌লেই হ'ল। অর্থাৎ কোন্ গুরুর পর কোন্ গুরু এবং সর্ব্বশেষে কোন্ গুরুর তুমি শিষ্য, এই কথাটী তোমার খেয়াল থাক্‌লে তোমার পক্ষে তাঁদের অনভিপ্রেত কোনও আচরণ বা পন্থাবলম্বন সম্ভব হয় না। একজন যদি বলে যে, আচার্য্য শঙ্কর আমার আদিগুরু এবং তাঁর শিষ্যানুশিষ্যক্রমে আচার্য্য জয়েন্দ্র-পুরী আমার প্রত্যক্ষ গুরু, তাহ'লে তাঁর পক্ষে শঙ্কর-মতের বিরুদ্ধ-জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু প্রভৃতি-ক্রমে সমগ্র গুরু পরম্পরার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখলে, ঐ লক্ষ্যের গুণেই একক সাধকের জীবন থেকে বহু অবাঞ্ছনীয় সাধন-বিঘ্ন দূর হ'য়ে যায়।

সমাজ-বদ্ধ সাধকের সম্প্রদায় আবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যেখানে বহুব্যক্তি সম্মিলিত হ'য়ে পরস্পর পরস্পরের সাধন-জীবনে সমুন্নতি সাধন কত্তে ইচ্ছুক বা বাধ্য, সেখানে একক সাধনের কথা উঠে না। সমাজবদ্ধ জীব সমাজ ছেড়ে বনে গিয়ে তপস্যা কত্তে পারে না। সমাজের প্রতি আসক্তি এবং কর্ত্তব্য দুইটীই তাকে বহুজনের সংসর্গে থাকতে বাধ্য করে। এমন ব্যক্তির পক্ষে শুধু গুরুপরম্পরা স্মরণের দ্বারা সাধননিষ্ঠা রক্ষা করা সুকঠিন ব্যাপার। সেজন্য সেখানে তাকে সমভাবের ভাবুকদের নিয়ে একটা সাধন-গোষ্ঠী

সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়। সেই সাধনগোষ্ঠীই ক্রমশঃ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তোমরা যদি একা একা বন-গুহায় বা কানন-কান্তারে গমন ক'রে সাধন কর্ত্তে লেগে যাও, তাহ'লে তোমাদের দ্বারা সম্প্রদায়-সৃষ্টি হবে না। আর, তোমরা যদি সামাজিক জীবনের সংস্পর্শ ত্যাগ না কর এবং বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সমাজের বুকে বাস ক'রেই নিজের ইষ্টনিষ্ঠা ও সাধনানুরাগকে অবিচলিত রাখতে ইচ্ছা কর, তাহ'লে তোমাদের ইচ্ছার অজ্ঞাতসারে তোমরা আপনা-আপনি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হবে।

অখণ্ড-দীক্ষায় লব্ধ তিনটী সত্যানুভূতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি ত' আমার এখানে সাধন নিয়ে কয়েকটী সত্য স্পষ্ট অনুভব কচ্ছ। প্রথমতঃ অনুভব কচ্ছ এই যে, ভগবৎ-সাধন-বর্জ্জিত ব্যক্তি পশু-তুল্য। দ্বিতীয়টী অনুভব কচ্ছ এই যে, তুমি যে সাধনের সাধক, সেই সাধনে সর্ব্ববর্ণের সমান অধিকার রয়েছে। তৃতীয়তঃ অনুভব কচ্ছ যে, তোমার সাধনরুচি ও ইষ্টানুরাগ যাতে তোমার ভবিষ্যদ্‌বংশীয়ের ভিতরে সুষ্ঠুরূপে সংক্রামিত হ'তে পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চেষ্টা ক'রে যেতে তুমি বাধ্য। কিন্তু এই তিনটী সত্য তোমাকে বাধ্য করবে একটা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠায় এবং পরিপুষ্টি-সাধনে।

সম্প্রদায় কিভাবে সৃষ্ট হয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই তিনটী সত্যের অনুভূতি যত তোমার তীব্রতর গভীর হবে, এই তিনটী সত্যকে কায়-মনঃ-প্রাণ দিয়ে পূজা কর্ব্বার দিকে তত তোমার ঝোঁক হবে। অন্তরে

বাহিরে এই তিনটী সত্যকে জয়যুক্ত দেখ্‌বার জন্য তোমার চিত্তে ব্যাকুল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে। তখন প্রথমতঃ তুমি নিজে হবে একান্তভাবে সাধনে ব্রতী। কিন্তু যারা অসাধক, তারা বাধা দেবে, ফলে সেই বাধা অপসারণের জন্য অসাধকদের দল-হানি ঘটাবার পক্ষে তোমার চেষ্টা করা স্বাভাবিক হবে। কারণ, আজ যে বিরোধী, কাল যদি সে তোমার পক্ষভুক্ত হয়, তাহ'লে বিরোধী দলের শক্তি হ্রাস এবং তোমার তপস্যার আনুকূল্য বৃদ্ধি হবে। এভাবে গণ্ডী সৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেল। কিন্তু তুমি জানো, মানুষ মাত্রেরই মরণ আছে, আজ যাঁরা প্রেমমাখা কণ্ঠে শ্রীভগবানের মধুময় নামের গুণগান কচ্ছেন, মৃত্যু তাঁদের প্রাণকে হরণ কর্ব্বে, শ্মশানাগ্নি তাঁদের দেহকে গ্রহণ কর্ব্বে, সেই মধুমাখা হরিনাম-ধ্বনি আর ত' এ জগতে মন্দ্রিত হবে না! সুতরাং মানুষ গেছে যাক্, তার কণ্ঠের মধুর কাকলী থামতে না থাম্‌তে যাতে অপর মানবের কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি উঠে, সেজন্য তুমি বাধ্য হবে নিজের সন্তানগণের মধ্যে এবং এক পন্থাবলম্বী সম-সাধকগণের পুত্রকন্যাগণের ভিতরে সৎশিক্ষার, সদাচারের সৎসংস্কারের ও সন্নীতির এমন এক আবেষ্টন সৃষ্টি কর্ত্তে, সেই আবেষ্টন ভেঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে চপল প্রবৃত্তির তাড়নায় এরা উচ্ছৃঙ্খল হ'তে পার্ব্বে না। সুতরাং দেখ্‌তে না দেখ্‌তে পদ্ধতিবদ্ধ নিয়মে শাসিত একটী সম্প্রদায় অবশ্যম্ভাবী ভাবে সৃষ্ট হ'য়ে যাবে। এ'কে প্রতিরুদ্ধ কর্ব্বার কোনও উপায় নেই। সুতরাং সমাজবদ্ধ-জীবনযাপনকারী রূপে তোমরা যদি শত সহস্র ব্যক্তি সমসাধক হও, তাহ'লে তোমরা যে একটা সম্প্রদায়ে পরিণত

হ'য়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?

অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতা একটা মস্ত আদর্শ। এজন্য সম্প্রদায়ই যদি তোমরা হও, তাহ'লে তোমাদের হ'তে হবে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। অর্থাৎ আত্ম-কল্যাণের জন্য সংহত, সংগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত হও, কিন্তু অপর-মতাবলম্বী, অপর পথাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ বা নিন্দা-ভাব পোষণ ক'রো না। ভারতবর্ষের মাটি অসাম্প্রদায়িকতার জন্মভূমি কিন্তু এই দেশেরই আকাশ আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পে আচ্ছন্ন, এই দেশেরই বাতাস আজ সাম্প্রদায়িকতার পূতিগন্ধে দূষিত। অসাম্প্রদায়িকতাই ভারতবর্ষের জন্মগত প্রতিভা সাম্প্রদায়িকতা নয়। এই কথা মনে রেখে কাজ তোমাদের কর্ত্তে হবে। আদর্শ রাখ উচ্চ এবং মহান্। এই আদর্শের আকর্ষণে নিখিল জগতের সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত নর-নারীকে আপন ব'লে ভাবতে শিক্ষা কর।

অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের সকল সম্প্রদায় কি কখনো একটা সম্প্রদায়ে পরিণত হবে, না হ'তে পারে ? যারা সেরূপ কল্পনা করে, তারা দুঃসাহসী ব্যক্তি। জগৎ থেকে বৈচিত্র্য যে উঠে যাবে, জগতেরই ধর্ম্মে তা' অসম্ভব। আত্মার ধর্ম্ম একত্ব, সৃষ্টির ধর্ম্ম বহুত্ব। যার সৃষ্টি নেই, নিধন নেই, সেই আত্মাই চিরকাল এক থাকবে। যার সৃষ্টি আছে, লয় আছে, সেই জগৎ'

চিরকাল নিতি নব বৈচিত্র্যের খেলা খেলবে। দার্শনিকেরা বলেন,—পুরুষের পরিবর্ত্তন নেই, প্রকৃতি নিয়ত লীলা-চঞ্চলা বৈচিত্র্যময়ী। প্রকৃতিকে হত্যা ক'রে এই জগতে বাস করা যায় না। কিন্তু সম্প্রদায়ে যাদের প্রয়োজন, তারা সব প্রকৃতির অধীন। সুতরাং জগতে চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় থাকবে। কেউ যদি মোহন-মন্ত্রে সবাইকে নিয়ে একটা সম্প্রদায় করে, তাহ'লেও সেটা ভেঙ্গে চুরে আবার দশটা হবেই। কেউ যদি অসি-লাঞ্ছনে সবাইকে নিয়ে একটা সম্প্রদায় করে, তাহ'লেও দু'দিন পরে সেটা ভেঙ্গে চুরে আবার শতধা হবে। সুতরাং আত্মার ধর্ম্মে সবাইকে এক জেনে দেহের ধর্ম্মে নিজ নিজ পৃথক্ অনুশাসন প্রতিপালন করাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। একেই বল্‌ব অসাম্প্রদায়িকতা। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝখানে দেওয়াল ভেঙ্গে চূর্ণ করা অসম্ভব, নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব, কিন্তু প্রাচীরের উচ্চতার স্পর্দ্ধা হ্রাস ক'রে এক সম্প্রদায়ীর সাথে অপর সম্প্রদায়ীর প্রেমালিঙ্গনের পথ উন্মুক্ত করা যায়। তারই নাম অসাম্প্রদায়িকতা। যে যার নিজের গণ্ডীতে থাকো, কিন্তু অপরকে শত্রু না ভেবে অপরকে আত্মীয় জ্ঞান করো। এরই নাম অসাম্প্রদায়িকতা।

সম্প্রদায়ের পরিরক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্প্রদায় এলেই সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি এবং পরিরক্ষণের প্রশ্ন থাকে। পরিরক্ষণের প্রশ্নই

সর্ব্বাগ্রে। যে আছে, সে মানুষের মতই থাকুক। মনুষ্যত্বের চরম উৎকর্ষ তার ভিতরে ফুটে উঠুক, বিকাশের পরিপন্থী সকল বৃত্তি তার বিনষ্ট হোক, রক্ত-মাংসের দেহে সে রক্ত-মাংসাতীত পরম সত্যকে স্থাপিত কত্তে সমর্থ হোক। এই হ'ল পরিরক্ষণের কথা।

সম্প্রদায়ে নূতন রক্তের প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু পরিপোষণের কথাও উপেক্ষা করার নয়। বাইরে থেকে নিয়ে এসে সম্প্রদায়ের ভিতরে নূতন রক্তের সঞ্চার করা প্রয়োজন। তাতে সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বাড়ে। কিন্তু নূতন রক্তের সঞ্চার প্রয়োজন ব'লেই তুমি বিষাক্ত রক্ত নিয়ে আস্‌তে পার না। নূতন ব'লেই শোণিতের কোন মূল্য হয় না, দোষ-বর্জ্জিত হ'লেই তা' জীবনীশক্তির উদ্দীপক হয়। যাকে তোমার পবিত্র পরিবেষ্টনীর ভিতরে নিয়ে আস্‌ছ, যদি তাকে সর্ব্বতোভাবে পরিশোধিত ক'রে আন্‌তে পার, তাহ'লেই বাইরে থেকে নিয়ে আসার সার্থকতা হবে।

সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্টতা কিসের উপর নির্ভর করে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাথা গুণলেই কোনও সম্প্রদায়ের প্রকৃত শক্তি বা মূল্য নির্দ্ধারিত হ'তে পারে না। প্রকৃত শক্তি, প্রকৃত মূল্য, প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে, সেই মাথাগুলির ভিতরে কি আছে, তার উপরে। হাত গুণ্‌তিতেই কোনও সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্ব নির্ণীত হ'তে পারে না। এই হাতগুলি কেমন

অস্থি আর কেমন পেশী দিয়ে তৈরী, এই হাতগুলি কেমন কাজে নিপুণ, কোন্ কাজে নিরত, তার উপরেই সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা নির্ভর করে।

আদর্শ সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আদর্শ সম্প্রদায়ে একটী নরনারীও চরিত্রহীন হবে না, ধর্ম্মহীন হবে না, উৎপীড়ক হবে না, অন্নহীন হবে না। এই রকম সম্প্রদায় গড়তে চাও কি? তাহ'লে আমি তোমাদের সাথেই আছি। গোড়ায় কর সততার পথে অন্নের ব্যবস্থা। ক্ষুধিত উদরে ধর্ম্ম হয় না। প্রথমেই কর ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের ব্যবস্থা। এই নিশ্চিন্ত নিশ্চিত অন্নগ্রাসের সাথে কর চরিত্র আর ধর্ম্মের পরিবেশন। চরিত্রের অনুশীলন ও ধর্ম্মের সাধন মেরুদণ্ডকে একটু শক্ত ক'রে তুল্‌লে তার সমক্ষে ধর ত্যাগের আদর্শ। সেই আদর্শের অনুধ্যান ক'রে সে নিজেই নিজের মনে অনুভব কত্তে সমর্থ হোক যে, দশজনকে বঞ্চিত ক'রে একজনের উদর প্রয়োজনের অতিরিক্ত পূর্ণ করা এক নিদারুণ বর্ব্বরতা। এভাবে যদি সম্প্রদায় গড়্‌তে চাও, এস, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

চাঁদপুর, ত্রিপুরা
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

অদ্য রবিবার। স্কুলের ছেলেরা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছেন। একজন গান গাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

সঙ্গীত স্বর্গীয় বস্তু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সঙ্গীত যে স্বর্গীয় বস্তু, এতে কোনো ভুল নেই। সুখের সময়ে সুখ-বর্দ্ধনে, দুঃখের সময়ে দুঃখ-নিবারণে সঙ্গীতের তুল্য শক্তিশালী বস্তু জগতে অতি অল্পই আছে। পুত্রশোকাতুরা জননীর কাছে সান্ত্বনা-ভাষী মধুর গান গাও, ক্ষণকালের মধ্যে তার শোকের জ্বালা নিভে যাবে। অপ্রেমিকের হৃদয়ে প্রেম-সঞ্চার কত্তে, নিষ্ঠুরের প্রাণে দয়ার উৎপত্তি ঘটাতে, কাপুরুষের প্রাণে সাহস সঞ্জীবিত কত্তে, স্বার্থপরের হৃদয়ে নিঃস্বার্থপরতার উদ্বোধন কত্তে গানের মত শক্তি আর কার আছে? শত শত ভক্তিতত্ত্বের বক্তৃতায় যা' হয় না একটী ভক্তিমূলক গান গাইলে তা' সাধন করা যায়। দুগ্ধপোষ্য বালক আর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, সিংহ-বিক্রম যোদ্ধা আর নিরাশ্রয়া নারী, সকলের উপরে সঙ্গীতের অবাধ অধিকার, অবাধ প্রভুত্ব; সকলের হৃদয়ে গানের লহরী আলোড়ন সৃষ্টি করে। গানের ভিতর দিয়ে ভারতের অধিকাংশ ধর্ম্মতত্ত্ব গৃহে গৃহে প্রচারিত হয়েছে এবং জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা গানের ভিতর দিয়ে, কাণের ভিতরে প্রবেশ ক'রে শ্রোতার প্রাণ-মন মথিত করেছে। লবকুশ যে অমৃতময়ী রামায়ণী কথা শুনিয়ে বাল্মীকির যশোগাথাকে চিরস্থায়ী কর্‌লেন, সে ত' গান। গানের জন্ম আগে, সাহিত্যের জন্ম পরে, ব্যাকরণের জন্ম তারও পরে। দর্শনশাস্ত্রের জন্ম তারও পরে। গান মানুষের আদিম শিল্প। অন্ন, বস্ত্র আর আশ্রয় নিরাপদ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই সে গান গাইল। সে গান

তোমার বেদশাস্ত্রের জন্ম দিল, সে গান ডেবিড্ এবং অপরাপর ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কণ্ঠে নিঃসারিত হ'য়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্ম দিল, সেই গান চণ্ডীদাসের আর রামপ্রসাদের কণ্ঠে কাকলিত হ'য়ে বর্ত্তমান বাংলা গ'ড়ে তুল্‌ল। সুতরাং গান যে স্বর্গীয় বস্তু, এ কথা কে অস্বীকার কত্তে পারে?

জননী-জঠরে গর্ভ-শয়নে প্রণব-গীতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যখন মাতৃজঠরে ভ্রূণরূপে গর্ভশয়নে শুয়ে ছিলে, তখন তোমার কণ্ঠ ছিল না। কিন্তু প্রাণভরা মনভরা প্রণব-মন্ত্রের গানের লহরী ছিল তোমার নিত্যসঙ্গী। মাতৃবক্ষের হৃদ্‌পিণ্ড-স্পন্দনের সাথে সাথে তালে তালে তুমি মধু অপেক্ষাও মধুর ওঙ্কার-মন্ত্রের গান গেয়েছিলে। সেই গানের সুর, সেই গানের তাল, সেই গানের প্রাণ-মাতান অনুভূতি তোমাকে একটী ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে পূর্ণাবয়ব শিশুতে পরিণত ক'রে এই সুন্দর ধরণীর স্নেহময় বুকে নিক্ষেপ করেছে, সেই সঙ্গীত তোমার হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দনে অবিরাম অনুক্ষণ চলেছে, সেই সঙ্গীত তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস-বায়ুর সাথে অবিরল অবিশ্রাম চলেছে, দেহ ছাড়বার সময় পর্য্যন্ত সে সঙ্গীত তোমায় পরিত্যাগ কর্ব্বে না। সেই সঙ্গীত-লহরীর মাঝে আনন্দে নৃত্য কত্তে কত্তে তুমি নিজ কর্ম্মফল সম্পূর্ণ কর্ব্বার জন্য পুনরায় অন্য এ জননীর জঠরে গিয়ে অস্থায়ী বাসস্থান নির্ণয় কর্ব্বে। মধুর প্রণব-গীতি যে মুহূর্ত্তকালও তোমাকে পরিত্যাগ করে না, এই কথাটা তোমার মনে জাগিয়ে রাখ্‌বার জন্যেই শ্মশানগামী বান্ধবেরা "হরি ওঁ,

হরি ওঁ'' ব'লে গান গাইবেন। তারই অপভ্রংশে আজ ''হরিবোল, হরিবোল''এ পরিণত হয়েছে। সঙ্গীতে তোমার জন্ম, সঙ্গীত নিয়ে তোমার লয়, সঙ্গীতে তোমার পুষ্টি, শ্রীবৃদ্ধি ও পরমা পরিতৃপ্তি। এমন জিনিষকেও স্বর্গীয় বস্তু বল্‌ব না ?

সঙ্গীতের স্বর্গীয় ব্যবহার চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সঙ্গীত স্বর্গীয় বস্তু হ'লে কি হবে, এর চরম নারকীয় ব্যবহারও জগতের মানব করেছে। যেই সঙ্গীত মানবকে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবার অন্যতম উপায়, সেই সঙ্গীতকে মানুষ মানুষের অধঃপতন-বিধানের জন্যও ব্যবহার করেছে। গানই নারদাদি ঋষির মনকে ইন্দ্রিয়-সেবা-বিমুখ ক'রে ভগবানের দিকে উন্মুখ করেছে, আবার গানই কত কত জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাকে নরকের গভীরতম প্রদেশে প্রেরণ করেছে। সুতরাং সঙ্গীত জিনিষটী নিজে স্বর্গীয় হ'লে কি হবে, তাকে স্বর্গীয়ভাবে ব্যবহার কর্‌বার জন্য তোমার চেষ্টা থাকা চাই। মার্টিন লুথার সঙ্গীতকে ধর্ম্মতত্ত্বের পরেই স্থান দিয়েছেন। আমাদের দেশের সাধকেরা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'গানাৎ পরতরং নহি,' অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনের পথে গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সহায় আর কিছু নেই। কিন্তু আমি যদি গানকে ধর্ম্মসাধনের সহায়রূপে ব্যবহার করি, তবে ত' তা' স্বর্গীয় হবে। আমি যদি গানকে ইন্দ্রিয়ের চপলতা বর্দ্ধনে প্রয়োগ করি, তবে কি তা' স্বর্গীয় হবে ? পল্লীর সুন্দরী রমণীদিগকে আকৃষ্ট ক'রে তা'দিগকে প্রলোভনের জালে ধর্‌বার উদ্দেশ্যে যদি কেউ গীতাপাঠ কত্তে

থাকে, তবে তার সেই গীতা-পাঠ কি সাত্ত্বিক হবে ? ঠিক তেমনি সঙ্গীতের মত জিনিষ যদি জগতে মায়াজাল বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে তা'ও সাত্ত্বিক হবে না। সে ক্ষেত্রে গান হবে তামসিক ব্যসন ও আত্মনাশের উপকরণ। সঙ্গীত স্বর্গীয় বস্তু, কিন্তু তার স্বর্গীয় ব্যবহার চাই।

গান দেশের মনের দর্পণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে সকল গান তোমরা প্রতিদিন গাও, সেগুলি হচ্ছে তোমাদের জাতীয় মনের প্রতিচ্ছবি। প্রত্যেকটী বহুপ্রচলিত গানের পদগুলির ভিতরে প্রবেশ কর, তার অর্থ অনুসরণ কর, এই ভাবগুলি এই জাতিটার প্রিয় হবার কারণ কি, তার খোঁজ নাও,—তাহ'লেই বুঝতে পারবে যে, তোমার জাতি, তোমার দেশ উন্নতি বা অবনতির কোন্ স্তরে বাস কচ্ছে। তোমার দেশ বা জাতি যে সামাজিক উত্তরাধিকার লাভ করেছে, তোমাদের বহু প্রচলিত গানগুলি তাদের মানদণ্ড। এক একটী গানের ভিতর দিয়ে তার প্রত্যেকটী পদ তোমাদের অপ্রকাশিত চরিত্রকে সন্ধানী লোকের চোখে ধরিয়ে দিচ্ছে। ''মন তুমি কৃষি কাজ জান না,—এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ কর্‌লে ফলত সোণা''—এই একটী গানের পদ থেকে ধরা যাবে যে, বহু পুরুষ ধ'রে কেমন ক'রে তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা মানব-জমিনের আবাদ কর্ব্বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে এসেছেন। ''শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, ইহার উপরে নাই''—এই একটী গানের পদ থেকে বুঝা যায় যে, বহু পুরুষ

ধ'রে কেমন ক'রে তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা মানুষের ভিতরে নিখিল জগতের শ্রেষ্ঠ সত্তাকে উপলব্ধি কর্ত্তে প্রয়াস পেয়েছেন। সৎ সঙ্গীত সম্বন্ধে যেমন, অসৎ সঙ্গীতের তেমনই জান্‌বে। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যবর্দ্ধক, মনের মত্ততাজনক, ঐহিক সুখের প্রলোভন-প্ররোচক বহু-প্রচলিত কোনো সঙ্গীতের পদ আমি তোমাদের শুনাতে চাই না। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বেকার দেশ বর্ত্তমান সময়ের দেশ অপেক্ষা উন্নত ছিল, কি অবনত ছিল, তার অন্তর্নিহিত প্রমাণ পূর্ব্বেকার বহু-প্রচলিত গান আর এখনকার বহু-প্রচলিত গানের মধ্যে পারস্পরিক তুলনায় জান্‌তে পারবে। দেশের গানগুলি দেশের মনের দর্পণ, দেশের মনের ভাব এই গানগুলির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হ'য়ে দেখা যায়।

গানে ভবিষ্যতের ভাগ্য-নির্দ্ধারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একদিকে যেমন গানগুলি দেশের মনোভাবের ব্যঞ্জক, তেমন আবার অপরদিকে এগুলি দেশের ভবিষ্যৎ মনোভাবের সঞ্জনক। স্কটল্যাণ্ডের একজন রাজনৈতিক, আন্‌ড্রু ফ্লেচার বলেছিলেন,—"Let me write the ballads of a nation, and I care not who may make its laws," —একটা জাতির সবগুলি পল্লীগীতি আমাকে রচনা কর্ত্তে দাও, তা' হ'লে আমার আর গ্রাহ্য কর্‌বারও প্রয়োজন হবে না, এ জাতির আইনগুলি কে প্রণয়ন কর্‌ল ? এর মানে হচ্ছে এই যে, আইনের শাসনে তুমি একটা জাতিকে আর কতখানি নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তে পার ? সঙ্গীতের আকর্ষণে আমি তার শরীরের

প্রত্যেকটী রক্ত-কণিকাকে আমার নিজের খুশীমত নাচাব। আইনের বেড়া-জাল দিয়ে জাতিটাকে আর কতখানি শৃঙ্খলিত কর্ত্তে পার ? সঙ্গীতের মোহন তানে আমি সকলের মন-প্রাণ উজাড় ক'রে তাদের সবাইকে শিকল-ভাঙ্গার সাধনায় রত ক'রে দিব। আইন-রচয়িতার কূটবুদ্ধি একটা জাতির গণ-মনের উপরে আর কোন্ ভীতির ছায়াপাত কর্ব্বে ? আমি আমার সঙ্গীতের মাদকতায় সকলের প্রাণ থেকে ভীতি দূর ক'রে দেব, ক্ষয়-ক্ষতির প্রতি দৃক্‌পাতহীন ক'রে সবাইকে জীবনদানের নিদারুণ খেলায় প্রমত্ত ক'রে তুলব। তুমি যে বাবা গানটী গাও, সেই গানটী যে তোমার শুধু অবসরের চিত্ত-বিনোদন মাত্র, তোমার শ্রান্তির তৃপ্তি-সাধন মাত্র, তা' কখনো মনে কর্‌বেনা। সেই গানটী তোমার ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ কচ্ছে, সেই গানটী তোমার শ্রোতার ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ কচ্ছে, সেই গানটী তোমার দেশেরও ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্দ্ধারিত কচ্ছে। তাই বল্‌ছি, গান গাও ভাল কথা, সে গান গাও, যে গান স্বর্গীয়।

সরলতা ও প্রীতি-ভাব

আগামী কল্য শ্রীশ্রীবাবামণি বরিশাল যাইবেন। অদ্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি কতগুলি পত্র লিখিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সরল-স্বভাব হও। সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। সকলের সহিত প্রীতি-মধুর বচন বল। জগতে একজনও

তোমার পর থাকিবে না। জগৎকে আপন করাতেই প্রকৃত আনন্দ, পর করাতে লাভ মাত্র চিত্তদাহ, অন্তর্জ্জ্বালা। যে কটূকথা কহিয়াছে, তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে তাহার ভিতরে দেখিতে চেষ্টা কর। তাহার সহিত কথা কহিবার কালে মনে মনে ভাবিতে চেষ্টা কর যে, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন কটুভাষী ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধরিয়া তোমার প্রেমের গভীরতা পরীক্ষার জন্য আসিয়াছেন। নিন্দার বিনিময়ে তাহাকে প্রশংসা প্রদান কর, অসঙ্গত ব্যবহারের বিনিময়ে তাহাকে সুশীল-সঙ্গত সাধু-সম্মত ভদ্রজন-প্রাপ্য সৌজন্য প্রদর্শন কর। ইহাতে যদি ঐহিক লাভ তোমার কিছুমাত্রও না হয়, তাহা হইলেও আধ্যাত্মিক লাভ হইবে প্রত্যাশার অতীত সুপ্রচুর। বিদ্বেষ দ্বারা বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি কিছুই হয় না, বিদ্বেষকারীরই অন্তঃস্থল বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হয়। প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াও যে ব্যক্তি শত্রুবৎ ব্যবহার করিবে, তাহার সম্পর্কেও তুমি তোমার চিত্তকে নিরুদ্বেগ রাখ। তোমার অনিষ্ট কেহই করিতে পারিবে না। অপরের অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজের অনিষ্টই মানুষ নিজে সাধন করে। তোমার জীবনারাধ্য দেবতা ব্যতীত ত্রিজগতে আর দ্বিতীয় কর্ত্তা কেহই নাই। সকলেই তাঁর ইচ্ছায় চলে। মানুষের নিজের ইচ্ছা নিতান্ত সসীম, নিতান্ত ক্ষুদ্র। ইচ্ছা করিলেই একজন মানুষ আর একজন মানুষের ক্ষতি করিতে পারে না। তোমার জন্য এই ক্ষতি সেই সর্ব্বকারণ-কারণ নিজে যখন নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, তখনই তোমার ক্ষতি হওয়া সম্ভব জানিও। তিনি তোমাকে কর্ম্মশক্তি দিয়াছেন, প্রজ্ঞা

প্রদান করিয়াছেন। তাঁর প্রদত্ত শক্তি এবং তাঁর প্রদত্ত প্রজ্ঞার প্রকৃষ্ট ব্যবহার করিয়াই তুমি দায়িত্বমুক্ত। তোমার শক্তি ও তোমার বুদ্ধিকে তুমি তোমার জিনিষ বলিয়া মনে করিও না, তাঁরই জিনিষ বলিয়া মনে করিও এবং তিনি যখন যেরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞান অন্তরে জাগাইয়া দেন, তদনুযায়ী তাহার সম্যক্ ব্যবহার করিও। কিন্তু তাঁর যন্ত্র হইতে হইলে সরলতা আর প্রীতিপূর্ণ মনোভাব একান্ত আবশ্যক। তাই তোমাকে বলিতেছি, সরল হও এবং সকলের প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ কর।"

কিরূপ সুখভোগ বাঞ্ছনীয়

শ্রীহট্ট-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেইরূপ সুখভোগে নিরত হইলে ধর্ম্মনাশ ঘটে না, নিজেকে মাত্র তদ্রূপ স্থলেই আসক্ত রাখ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সর্ব্ববিধ সুখই নানা প্রলোভন ও মায়া বিস্তারপূর্ব্বক তোমাকে আকর্ষণ করিতে চাহিবে। তুমি কিন্তু বিচার হারাইও না যে, কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টী বর্জ্জনীয়। উৎকৃষ্ট সুখের জন্য নিকৃষ্ট সুখকে পরিহার করিবে, স্থায়ী সুখের জন্য অস্থায়ী সুখ-ভোগেচ্ছাকে বলি দিবে। যেরূপ সুখভোগে ন্যায় এবং ধর্ম্ম লঙ্ঘিত হয় না, যেরূপ সুখভোগে সমাজে ক্ষতিকর দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না, যেরূপ সুখভোগ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে চিত্ত-প্রশান্তির বর্দ্ধক মাত্র, সেইরূপ সুখকেই বহু-মানন করিবে। জীবমাত্রেই সুখলোভী, কিন্তু তুমি যে জীব হইয়াই শিব, ইহা তুমি ভুলিতে পার না। দেহ, মন,

আত্মার উৎকর্ষের দিকে তাকাইয়া সঙ্গত সুখে আসক্ত ও অসঙ্গত সুখে অনাসক্ত হইবে।"

পরনারী-সেবা সর্ব্বাবস্থায় গর্হিত

মালদহ-জিলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মদ্-গঞ্জিকাদিতে আসক্তি এবং পরনারী-নিরতি সমাজ-মধ্যে প্রবল হইলে সেই সমাজের আর বাঁচিবার আশা থাকে না। এই সকল ব্যসনে আসক্ত ব্যক্তিরা নিজেরাই নিরয়গামী হইয়া সন্তুষ্ট হয় না, ইহারা অপরকেও নানাভাবে এই সকল পাপে প্ররোচিত করে। অকার্য্যকে সুকার্য্য মনে করিয়া ইহারা অবাধে শত সহস্র অন্যায়ের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, ইহাদের এক এক জনের পাপে শত শত জন দূষিত, নষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হয়। সুতরাং ইহাদের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কি হইবে, তাহা নির্ণয়ে প্রকৃত দৃঢ়তার আবশ্যকতা জানিও। ভগবদ্দত্ত বুদ্ধির বলেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, ইহারা মানব-সমাজের অনিষ্টকারী, সুতরাং ভগবদ্দত্ত বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াই ইহাদের সম্পর্কে তোমার সাধ্যমত কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। স্বাস্থ্যের জন্য কেহ গঞ্জিকা সেবন করে, রোগ নিরাময়ের জন্য কেহ মদ্য পান করে, এরূপ কথা শোনা গিয়া থাকে। যথার্থই স্বাস্থ্যের অনুরোধে কে কে এই সকল কদভ্যাসে আসক্ত হইতেছে, তাহার বিচার বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা করিবেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য পরনারী-রমণ এক অতীব অসম্ভব কথা। এরূপ অসম্ভব কথা যাহারা

বিশ্বাস করিবে, তাহারাও বিকৃত-মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছুই নহে। মানব-স্বাস্থ্যের এমন উৎকট অবস্থা আছে, যে সময়ে বিজ্ঞ চিকিৎসক পরিমিত ভাবে স্ত্রী-সঙ্গের উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু সেই স্ত্রী স্বকীয়া স্ত্রী, বিবাহ দ্বারা অঙ্গীকৃতা স্ত্রী, পরস্ত্রী নহেন। স্বাস্থ্যের নামেই হউক, ধর্ম্মের নামেই হউক অথবা গায়ের জোরেই হউক, কোনও পুরুষকেই কোনও ক্রমে পরনারী-নিরত হইবার অধিকার প্রদান করা চলে না। যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচারের বহু-সহস্র-বর্ষব্যাপী অনুশীলনের পরে ভারতীয় আর্য্যজাতি সতীত্বের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অতীতের বিষময় তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকেই স্বকীয়া পত্নী ব্যতীত অপর নারীতে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-চেষ্টাকে নিতান্ত নিন্দিত ও গর্হিত বলিয়া চিনিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অতীত অভিজ্ঞতার ফল-লব্ধ উপদেশবাণী আজ তোমরা নিজেরাও লঙ্ঘন করিতে পার না, অপরকেও লঙ্ঘন করিতে দিতে পার না। পরনারীতে আসক্তি যদি কাহারও এতই প্রবল হইয়া থাকে যে, প্রাণ-বিনিময়েও সেই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ নহে, তাহা হইলে তাহাকে সেই নারীকে বৈধ ভাবে বিবাহ করিয়া স্বকীয়া করিয়া লইতে বাধ্য কর। মানব-সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ সৎসাহসের সম্মান করিতে সম্মত আছে। হিন্দু বা অহিন্দু, আর্য্য বা ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল যে-কাহারও কন্যাকে তুমি বিবাহের দ্বারা আপন করিয়া, লইবে, আগামী যুগের ভারতীয় সমাজ তাহাকেই মানিয়া লইবে, যদি সে অপরের বিবাহিতা পত্নী না হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য আশ্রমে রমণী-সঙ্গ

পুরুষের একান্তই নিষিদ্ধ নহে কিন্তু সেই রমণী হওয়া চাই নিজের বিবাহিতা রমণী, অন্য রমণী নহে।"

সংসারী থাকিয়াই অসংসারী হও

ময়মনসিংহ সিংরৈল-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পদ্ম-পত্রে জল যেমন টলমল করে, মানবের আয়ু তেমনই অস্থির চঞ্চল,—কোন্ দিন কে মৃত্যুর করাল বিবরে প্রবেশ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। ইহা সত্য। তুমি যথার্থ কথাই বর্ণনা করিয়াছ। কিন্তু পদ্ম-পত্রে জল-বিন্দুর তুলনা দিয়াই তোমাকে বলিব যে, পদ্ম-পত্রের উপর জলবিন্দু সর্ব্বদা টলমল করিলেও যেমন ইহাতে জল লাগিয়া থাকিতে পারে না, তোমাকে তেমনি সাংসারিক কর্ত্তব্য-সমূহে ঘেরিয়া ধরিলেও তাহা যেন তোমাকে লিপ্ত করিতে না পারে,—এই ভাবে তুমি চল। হাঁস ও পানি-কাউর সর্ব্বদা জলে বিচরণ করে কিন্তু একবিন্দু জলও তাহাদের গায়ে লাগে না। তুমিও সংসারের মধ্যে বিচরণ করিয়াই এমন অসংসারী হও, যেন সংসার তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। পিতা আছেন, মাতা আছেন, তাঁহাদের প্রতি এমন চিত্ত লইয়া সেবা কর, যেন ইঁহাদের ভিতরে তোমাদের জীবনৈকারাধ্য শ্রীভগবানই বিরাজ করিতেছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের প্রতি সেবা ভগবৎ-সেবাই হইবে। তাঁহারা যদি তোমাকে ধর্ম্ম-পথে চলিতে বাধা দেন, তাহা হইলে বিচার করিবে যেন ভগবান্ তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠার পরীক্ষার জন্য পিতা-মাতার ভিতরে অবস্থান

করিয়া বাধা জন্মাইয়া দেখিতেছেন যে, তোমার ভগবৎ প্রেমোন্মুখিনী চিত্ত-নদীর গতি থামিয়া যায় কি না। এই অবস্থাতে ভগবানকেই একমাত্র কারণ জানিয়া পিতা-মাতার প্রতি রোষ-বিরক্তি-বর্জ্জিত হইতে হইবে এবং কুণ্ঠাহীন নম্রতায় তাঁহাদের সেবা করিবে। স্ত্রী রহিয়াছেন,—তাঁহার প্রতি এমন চিত্তভাব লইয়া সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার কর যেন ইঁহারও ভিতরে তোমার পরমোপাস্য শ্রীভগবানই অবস্থান করিতেছেন। এরূপ হইলে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য-পালন তোমার পক্ষে ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। স্ত্রী যদি রমণেচ্ছায় উন্মত্তা হইয়া তোমার চিত্তকে চঞ্চল করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে মনে মনে বিচার করিও যে, স্ত্রীর দেহ-মধ্যে নিত্য-উপাস্য পরম-দেবতাই অবস্থান করতঃ তোমার ইষ্ট-সাধনে সংযম-ব্রত কিরূপ দৃঢ় হইয়াছে, মাত্র তাহারই পরীক্ষা করিতেছেন। এমতস্থলে স্ত্রীর প্রতি বিদ্বিষ্ট বা বিরক্ত না হইয়া অকপট স্নেহে তার প্রতি দৃষ্টি, বাক্য ও ব্যবহার বিনিময় করিবে। এইরূপ শান্ত মনোভাব লইয়া যদি চলিতে পার, তাহা হইলে সংসার তোমার কি করিতে পারিবে? সংসার-সমুদ্রে বহু নক্র-কুম্ভীর আছে, ইহা সত্য, কিন্তু ভগবানের নামের হরিদ্রা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া লইলে আর ভয় কিসের? অথবা সংসার অরণ্য-স্বরূপ। ক্ষুধা-রূপিণী ব্যাঘ্রী, দরিদ্রতা-রূপিণী অরণ্য-কুক্কুরী, দুশ্চিন্তা-রূপিণী জম্বুকী, কুটিলতা-রূপিণী কাল-ভুজঙ্গী, পরনিন্দা-রূপিণী শৃগালী এবং চঞ্চলতা-রূপিণী হুল-ধারিণী মক্ষিকা ইহাতে নিয়ত বিচরণ করিতেছে। কিন্তু তাহাতেই বা ভয় কি? তুমি ভগবানের নামরূপী অবার্থ-

সন্ধান পাশুপত অস্ত্র লইয়া নির্ভয়ে পথ চলিতে থাক, সিংহ-গজ-গণ্ডারাদি তোমার কি করিতে পারিবে ?"

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা
হিন্দু ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের তুলনা

নোয়াখালী চৌমুহনী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জ্ঞানার্জ্জন আবশ্যক মনের বিকাশের জন্য, ব্যায়ামাভ্যাস আবশ্যক দেহের বিকাশের জন্য, সাধনার প্রয়োজন আত্মার বিকাশের জন্য। আত্মাকে চেনাই হইতেছে আত্মার বিকাশ,—এখন তুমি আত্মাকে ভগবানের নিত্যদাস বলিয়াই চিন কিম্বা পরমাত্মার সহিত অভেদ বলিয়াই চিন। আধুনিক বিদ্যালয় জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদ্যাদান করিতেছে। কিন্তু মনের বিকাশে সফলকাম হইতেছে না। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েগুলি ভাষামাত্র শিখিতেছে, পরীক্ষায় পাশ করিতেছে এবং ডিগ্রী লইতেছে, মনের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা ও নীচতা বিদূরণের কোনও ব্যবস্থা হইতেছে না। বাহির হইতে চিন্তাধারা আসিয়া তাহাদের মনের তীরে আঘাত খাইয়া পড়িতেছে এবং তাহারই প্রভাবে, অল্প হউক, অধিক হউক, তাহাদের বদ্ধ কুসংস্কার ও হীন স্বার্থপরতা একটু একটু করিয়া টুটিতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, এই হিসাবে বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ব্যায়াম অভ্যাসের ব্যবস্থা নাই। যে সকল বিদ্যালয়ে আছে, সে সকল স্থানেও বলিতে গেলে বড়-কেহ অভ্যাস করে

না। যেখানে অভ্যাস করে, সেখানেও মনের সাথে দেহের বিকাশের সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব হইতে দেখা যাইতেছে না। ফলতঃ এই হিসাবেও বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি প্রায় ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান। আত্মার বিকাশের কথা তো তোলাই চলে না। মানুষকে আত্মার ধর্ম্মে দীক্ষা দিবে ত' সঙ্গে সঙ্গে কাশীধামে আর মক্কাশরীফে লড়াই শুরু হইবে, মদিনা-শরীফে আর শ্রীবৃন্দাবনে লাঠালাঠি চলিবে। ফলে, ধর্ম্মশিক্ষার নাম দিয়া যেখানে যাহা দেওয়া যাইতেছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্কীর্ণতারই অনুশীলন বাড়াইতেছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উদার হৃদয় আলেমের মুখে আমরা ইস্‌লামের তত্ত্ব শুনিব না, অথবা উদার হৃদয় আচার্য্যের মুখে তোমরা আর্য্য ধর্ম্মের বার্ত্তা শুনিবে না। এর চাইতেও বড় মুস্কিল এই যে, দৈবাৎ যদি বা কোনও আচার্য্য পরধর্ম্মের নিন্দা না করিয়া নিজ ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ হন, কিন্তু কয়জন আলেম এই কার্য্যটি করিতে বর্ত্তমান সময়ে নিজেকে সমর্থ বোধ করিবেন ? একেশ্বর-বাদের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গেলেই যে প্রতীকোপাসকদের গালি দিতে হইবে, এমন কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই। কিন্তু অভ্যাসের দোষে ইহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই এই গুরুতর অতীব সঙ্কট সঙ্কুল পরিস্থিতি। ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম এবং আরবীয় ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রসার-পদ্ধতির ভিতরে একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আরবের এই নূতন ধর্ম্ম, অতীত ধর্ম্ম, অতীত সাহিত্য, অতীত সংস্কৃতিকে একেবারে মুছিয়া দিতে পারিয়াছিল। ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তিত আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর কতখানি

যে প্রাগৈস্লামিক আরব্য সভ্যতার দান, তাহা নির্দ্ধারণের যোগ্য সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রায় একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম আত্ম-বিকাশের পথে একটী ধর্ম্মকেও লুপ্ত করে নাই। সকল ধর্ম্মকে বুকে টানিয়া আনিয়াছে এবং যাহার ধর্ম্মমতের যতটুকু সম্ভব মানিয়া লইয়াছে বা ব্যাখ্যা দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়াছে। ভাল বা মন্দের কথা বলিতেছি না। ইহা এই দুই ধর্ম্মের বিস্তার-পদ্ধতির পার্থক্য। আবার এক আল্লা ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই কথা প্রাণপণে স্বীকার করিয়াও, তিনি সর্ব্বভূত-বিরাজিত, এই কথা স্বীকার করিতে ঐস্লামিক দার্শনিকেরা অসম্মত। ইমাম মহম্মদ গাজ্জালী তওহীদ বা একত্ব-জ্ঞানের চতুর্থ বা চরম অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,—এই অবস্থায় সাধক এক আল্লা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না, সমস্তই তিনি এক বলিয়া দেখেন ও বুঝেন। তখন আর কোনও পার্থক্য জ্ঞানের চিহ্নমাত্রও থাকে না। একত্বজ্ঞানের তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ এই চরম অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় সাধক সৃষ্ট পদার্থও দেখিতে পান, স্রষ্টাকেও দেখিতে পান, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ যে একমাত্র সেই স্রষ্টা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে, ইহাও দেখিতে পান। কিন্তু তওহীদের চতুর্থ বা চরম অবস্থায় তিনি সমস্তই এক বলিয়া দেখিতে পান। এই পর্য্যন্ত আসিয়াও তাঁহারা স্বীকার করিতে পারিতেছেন না যে, সর্ব্বভূতের মধ্যে তিনি রহিয়াছেন। পরন্তু ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম বলিতেছেন যে, সর্ব্বভূতেই তিনি আছেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। দার্শনিক সিদ্ধান্তে আরবের ধর্ম্মে ও ভারতের ধর্ম্মে

মাত্র এই স্থানে পার্থক্য। কিন্তু পার্থক্য যেমন রহিয়াছে, তেমন মত-সুসাম্যও রহিয়াছে। আত্মপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভরের শক্তি, মৃত্যু-চিন্তার হিতকারিতা, অনুতাপ ও বৈরাগ্যের মহিমা, ভগবৎ-সাধনের আবশ্যকতা, সৎকার্য্য দ্বারা পাপক্ষয় ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে একধর্ম্মবলম্বীর শাস্ত্রোপদেশ অপর ধর্ম্মাবলম্বীর শাস্ত্রোপদেশের বিন্দুমাত্রও বিরোধী নহে। বরং একধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অপর ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, এই সকল বিষয়ে একজনের শাস্ত্র যেন অপর জনের শাস্ত্রকে অনুপূরণ করিতেছে। বাল্যকালে কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্সের উপরে দাঁড়াইয়া হাটের মাঝে খৃষ্টান মিশনারীদিগকে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি যে, একমাত্র বাইবেল ছাড়া জগতের আর সকল শাস্ত্র মিথ্যা। ঠিক্ তাহাদের মত আমরা যদি ভাবিতে থাকি যে, বেদ ছাড়া আর সব মিথ্যা বা কোরাণ ছাড়া সব মিথ্যা, তাহা হইলে ভিন্নধর্ম্মীদের শাস্ত্রের ভিতরে যে কত সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা খুঁজিব কিরূপে, বুঝিব কিরূপে? কিন্তু সমাজে বা রাষ্ট্রে কোথাও এই সমস্যার সমাধান হয় নাই, তোমাদের বিদ্যালয়গুলিতেই বা তাহা কি করিয়া হইবে ? অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, বিদ্যালয়গুলির ভিতরে অনায়াসে অসাম্প্রদায়িক উদার বুদ্ধি লইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম্মের হিতকারিণী বাণী শুনিতে পারিত। কিন্তু কোথাও তাহার ব্যবস্থা হয় নাই। সুতরাং এই হিসাবেও বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান। বাধ্য হইয়াই এই সকল ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু

দেহ, মন, আত্মার পরিপূর্ণ উৎকর্ষ বিধানের জন্য তোমাদের পক্ষে যে যে চেষ্টা সঙ্গত এবং আবশ্যক, তাহা কোনও ক্রমে পরিত্যাগ করিও না। চতুর্দ্দিকে সহস্র অবস্থার মধ্যেই তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে, সহস্র বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়াই তোমাকে আত্মগঠন করিতে হইবে। ভুলিও না, মানব-জন্ম অতি দুর্লভ জন্ম।''

অদ্য রাত্রে আরও বহু পত্র লিখিত হইল কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্য সেগুলির অনুলিপি রক্ষিত হয় নাই।

বরিশালগামী ষ্টীমার
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

বেলা নয় ঘটিকায় চাঁদপুর-ঘাট হইতে ষ্টীমার ছাড়িল। শ্রীশ্রীবাবামণি মুলতুবী পত্র-সমূহের জবাব ষ্টীমারেই দিতে বসিয়া গেলেন। দোয়াত, কলম, কাগজ সব সঙ্গেই সুটকেসে ছিল।

দেহের খাদ্য ও মনের খাদ্য

রাজসাহীর অন্তর্গত গুরুদাসপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''শরীরের যেমন খাদ্য প্রয়োজন, মনেরও তদ্রূপ জানিও। শরীরকে খাদ্য দিয়া যদি মনকে তার আবশ্যকীয় পুষ্টিপ্রদ আহারীয় দিতে অসম্মত হও, তাহা হইলে মানুষ-দেহে তুমি একটী পশুমাত্র থাকিবে। সুতরাং মনের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যেখান হইতে যেরূপ উপাদেয় চিন্তা সংগ্রহ করিতে পার, তাহা আনিয়া মনকে পরিবেশন কর। কিন্তু শরীরকে যেমন খাদ্য দিলেই শরীর বাড়ে

না, খাদ্যকে যথাযথভাবে জীর্ণ করিয়া রস-রক্তাদি ধাতুতে পরিণত করিবার জন্য ব্যায়াম প্রয়োজন, ঠিক্ তেম্নি মনকে আনিয়া উপাদেয় চিন্তাসমূহ পরিবেশন করিলেই মনের বিকাশ ঘটে না, সেই সকল চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টারও প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সচ্চিন্তা লাভ করিয়া সেই চিন্তাকে কর্ম্মে পরিণত করিবার অনুশীলন করে না, তাহার মনকে কলিকাতার বড়বাজারস্থ মাড়োয়ারীদের গুদাম-ঘর তুল্য বিবেচনা করিও। গুদাম ঘরে জগতের সকল স্থানের সকল পণ্য আসিয়া মারামারি ঠেলাঠেলি করিতেছে, কত লোভনীয় বস্তু গড়াগড়ি দিতেছে, কিন্তু মালিকের সাধ্য নাই যে, এগুলিকে নিজে ব্যবহার করিয়া সার্থক করে, মনকে গড়িয়া তুলিতে লক্ষ লক্ষ উচ্চ ভাবের প্রয়োজন হয় না। একটা দুইটা উচ্চ ভাবকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে কার্য্যে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে, উহা দ্বারাই মনের গঠন, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। এই স্থলে শরীরের খাদ্য ও মনের খাদ্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। শরীরকে নিত্য নূতন খাদ্য প্রদান করিতে হয় এবং নিত্য ব্যায়ামের দ্বারা তাহাকে হজম করিতে হয়। মনকে নিত্য নূতন খাদ্য না দিলেও চলে, একদিন একটী মূল্যবান্ খাদ্য প্রদান করিয়া প্রতিদিন তাহাকে জীর্ণ করিবার জন্য সাধন করিতে হয়। একই খাদ্য বহুদিন পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিতে করিতে যাহাতে খাদ্যের প্রতি অপ্রীতি বা অরুচি না জন্মিয়া যায়, তাহার জন্য খাদ্যের অনুকূল আচার বা চাট্নি-রূপে কিছু কিছু সৎকথা প্রয়োজন হয়। মানুষ একটী-মাত্র ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াই জীবনকে কৃত-

কৃতার্থ করিতে পারে। দেহের আহারও আহার, মনের আহারও আহার। যে আহারে দেহের ক্ষতি হয়, বুদ্ধিমান্ মানুষ সে আহার করে না। যে চিন্তার আহরণে মনের ক্ষতি হয়, তুমিও তাহা সংগ্রহে পরাঙ্মুখ থাকিও।"

প্রকৃত হিন্দুত্ব

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কেশপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিখিল জগতে যত কিছু দেখিতেছ, সব কিছুর পশ্চাতে এমন এক সর্ব্ব-সামান্য সত্তা রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে এ জগৎ থাকিত না, যাহা না থাকিলে দেশে দেশে যুগে যুগে নানা নবরূপে নিত্য নূতন সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইত না। সেই মূল সত্তাটীকে ধরিয়া থাকিবারই নাম হিন্দুত্ব। সত্যভ্রষ্ট হইয়া বাহিরের আচার আর বিচার লইয়া বিতর্ক ও বিতণ্ডা করিতে পারিলেই হিন্দুত্ব বজায় থাকে না। একথা অন্তরে অন্তরে অভ্রান্ত ভাবে বুঝিয়া লইয়া প্রকৃত হিন্দু হইবার জন্য চেষ্টিত হও। শক, যবন, পারদ, পহ্লব, হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি জাতিকে কি করিয়া একদা তোমরা ক্ষত্রিয় বলিয়া ভারতীয় আর্য্যজাতির অঙ্গীভূত করিয়া রাজন্যের রাজ-সম্মান প্রদান করিয়াছিলে, কিসের বলে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা অনুধাবন কর। নিখিল বিশ্বের যিনি অন্তর্নিহিত পরম সত্তা, তাঁহার সহিত অব্যভিচারিণী নিষ্ঠার সংযোগ রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলে বলিয়াই একদা সকল পরকে আপন, সকল দূরকে নিকট করিতে পারিয়াছিলে।

আবার সেই সত্যের সহিত যোগসূত্র যখন তোমার ছিন্ন হইল, তখনই একে একে সকল আপনকে পর করিলে, সকল নিকটকে দূর করিলে। একথা স্মরণে রাখিয়া সত্যময় শ্রীভগবানের সহিত সর্ব্বাগ্রে যুক্ত হইতে প্রয়াসী হও। তাঁহার সহিত নিজেকে যোগ-যুক্ত রাখিয়া প্রত্যেকটী আচরণকে সত্যানুভূতির অনুগত কর, খোশ-খেয়ালের অনুগত করিও না, পূর্ব্ব সংস্কারেরও অনুগত করিও না। তোমার অধিকাংশ পূর্ব্বসংস্কার কতকগুলি গতানুগতিক পন্থী চিন্তাহীন লোকের পুরুষানুক্রমিক আচরণের প্রভাব হইতে সৃষ্ট। তোমার কতক কতক পূর্ব্বসংস্কার মিথ্যার সহিত আপোষ-হেতু রোগ-বীজাণুর ন্যায় পরিবর্জ্জনীয়। কিন্তু গায়ের জোরে কেহ কখনও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে না। সংস্কার ত্যাগ করার জন্য সত্যের জোর চাই। যে সত্যের জোর পাইয়া শূদ্রা দাসী উশিজের পুত্র কাক্ষীবান্ প্রভৃতি ঋষি বলিয়া পূজা পান, যে সত্যের জোর পাইয়া অনার্য্যা দাসী ইলূষের পুত্র কবষ ঋষিত্ব অর্জ্জন করেন, যে সত্যের জোর পাইয়া যৌবনে বহুচারিণী পরিচারিণী জবালার গোত্র-পরিচয়-বর্জ্জিত পুত্র সত্যকাম ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সংস্কার ত্যাগ করিতে হইলে সেই সত্যের জোর চাই। যে সত্যের জোর পাইয়া স্বর্গের অপ্সরী উর্ব্বশীর পুত্র বশিষ্ঠ জগতের ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যে সত্যের জোর পাইয়া শ্বপচ-কন্যার গর্ভজাত পরাশর গোত্র-প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ, ধীবরী-ঘরে জন্মিয়াও ব্যাসদেব বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অনার্য্যা শুকীর গর্ভে জন্মিয়াও শুকদেব ভাগবতের প্রবক্তা ব্রাহ্মণ এবং অনার্য্যা-কন্যা ওলকার গর্ভজাত

কণাদ দর্শন-শাস্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণ, সংস্কার ত্যাগ করিতে হইলে সেই সত্যের জোর চাই। সেই সত্যের জোর উচ্চকণ্ঠের বক্তৃতা হইতে আসিবে না, পর্ব্বত-প্রমাণ শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যয়ন হইতে আসিবে না, পুঞ্জীকৃত কাঞ্চন-প্রভাবে আসিবে না,—আসিবে সত্য-স্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণের চেষ্টার মধ্য দিয়া। আসিবে,—আত্মসমর্পণের বাহ্য আড়ম্বরের মধ্য দিয়া নহে,—আত্ম-সমর্পণের অকপট সাফল্যের ভিতর দিয়া। সত্য-স্বরূপের পায়ে নিজেকে সম্যক্ সমর্পণ করিয়া দিয়াই প্রকৃত সত্যের আস্বাদন পাইবে, প্রকৃত সত্যের অপরাজয় বলবিভূতি প্রাপ্ত হইবে। সেই বলকে লাভ করার নামই প্রকৃত হিন্দুত্ব, সুদীর্ঘ টিকীর আস্ফালনই হিন্দুত্ব নহে।"

তিনি তোমার সমক্ষে আছেন

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কেতুগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবৎ-সাধন করিতে বসিয়া প্রথমে এই ভাবটী অন্তরে জাগরূক করিয়া লইও যে, তিনি তোমার সম্মুখে, অতি নিকটে রহিয়াছেন। তিনি যে তোমার অতীব সান্নিধ্যে, এই কথাটীর প্রত্যয় সর্ব্বাগ্রে অন্তরে জাগরিত করিয়া লইবে। পৃথিবী-ব্যাপী দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়াও ক্ষণকালের জন্য মনে করিও না যে, তিনি তোমার কাছ হইতে দূরে রহিয়াছেন। তাঁহার স্নেহ-কোমল-চক্ষের প্রেম-মাখা দৃষ্টির অতি সমক্ষে তুমি রহিয়াছ। এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা তোমার সাধনার পরিপূর্ণ সিদ্ধিকে সহজে করায়ত্ত করিবে।

নিমেষের জন্য তিনি তোমাকে ছাড়িয়া নাই। নিমেষের তরেও তুমি তাঁহার স্নেহ-মধুর দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পার না। অথবা শুধু ভগবৎ-সাধনের কালেই কেন, সর্ব্বসময়েই এই বিশ্বাসকে জাগরূক রাখ যে, তাঁহার সহিত তোমার নিত্য-সঙ্গ চলিতেছে। তুমি জান আর না জান, তুমি বোঝ আর না বোঝ, তাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি থাকিতে পার না, তোমাকে ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারেন না। প্রত্যেকটী হৃদয়ের স্পন্দনে তাঁহার সঙ্গ অনুভব কর, প্রত্যেকটী নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁহার সঙ্গ আস্বাদন কর, প্রত্যেকটী অনাহত উপলব্ধিতে তাঁহাকে একান্তভাবে প্রত্যক্ষ বলিয়া অবগত হও। চক্ষু বুজিয়াও মনে করিতে থাক যে, তাঁহাকে দেখিতেছ। চক্ষু খুলিয়াও মনে করিতে থাক যে, তাঁহাকে দেখিতেছ। তুমি যে তাঁহাকে দেখিতেছ, ইহাই তোমার পক্ষে প্রকৃত সত্য, চক্ষু খুলিয়া বা বুজিয়া অপর যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহার সবই মিথ্যা, এই বিশ্বাস পুনঃ পুনঃ মননের বলে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। জড় জগৎকে নহে, চক্ষু একমাত্র তাঁহাকে দেখিবার জন্যই পাইয়াছ, এই সত্যকে মনে-প্রাণে স্বীকার কর। বিষয়-লালসাকে নহে, মন ও বুদ্ধি একমাত্র তাঁহাকে জানিবার জন্যই যে পাইয়াছ, এই সত্যকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর। কিন্তু তিনি যে তোমার সমক্ষে রহিয়া সর্ব্বক্ষণ তোমাকে স্নেহ-নয়নে দেখিতেছেন, তোমার এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলেই তাঁহাকে প্রেম-নয়নে দেখিবার দৃষ্টি তোমার খুলিবে। তাই অন্য সময়ে যেমন হউক, অন্ততঃ তাঁর নাম জপিবার কালে, তাঁর স্তোত্র পড়িবার কালে, তাঁর ধ্যান করিবার কালে মনের ভিতর জ্বলন্ত বিশ্বাস

জাগরিত কর যে, তিনি তোমার সমক্ষে আছেন।"

উন্নত বিশ্বাস ও উন্নত বিদ্যাবত্তা

হুগলী জেলান্তর্গত চণ্ডীতলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উন্নত বিশ্বাস ও উন্নত বিদ্যাবত্তা এই দুইটী জিনিষের ভিতরে আমি প্রথমোক্ত বস্তুকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকি। কারণ, উন্নত বিদ্যাবত্তা চরিত্র-বর্জ্জিত ব্যক্তির পক্ষেও দুর্লভ নহে কিন্তু চরিত্রের মেরুদণ্ড খুব দৃঢ় না হইলে কেহ উন্নত বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে না। উন্নত বিদ্যাবত্তা জগতে অনেক সময়ে বিবেক-বিরুদ্ধ দাসত্বের মর্য্যাদা-রক্ষণে প্রয়োজিত হইতে পারিয়াছে কিন্তু উন্নত বিশ্বাস কখনও আদর্শের তিলমাত্র অবমাননা সহ্য করে নাই। এইজন্যই তোমাদের প্রতি আমার প্রথম আশীর্ব্বাদ—বিশ্বাসী হও, দ্বিতীয় আশীর্ব্বাদ-বিদ্বান হও।"

ইংরাজী শিক্ষা ও ভারতীয়ত্ব

নদীয়া-জেলান্তর্গত খোক্‌শা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ইংরাজী না শিখিলে আমাদের কোনও ক্ষতি হইত, এই কথা আমার স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে সকল মনীষী প্রথম যুগে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের অনুকূল প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের ইংরাজীর প্রতি পক্ষপাত করিবার বিশেষ কারণ ছিল। তৎকালে নিখিল ভারতের মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশীয় ভাষাই

সর্ব্বজনীন ছিল না এবং ফারসী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যে বহু-বিস্তারের প্রতিযোগিতা ছিল, তাহার মধ্যে জগতের সকল স্থানের সকল ভাবের সম্পদে নিজেদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টার অথবা তদ্রূপ প্রয়াসের আবশ্যকতা-বোধের একান্ত অভাব ছিল। ইহার দরুণই বিদেশী বণিগ্-জাতি এখানে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সুযোগ পাইলেন এবং একদল নকল ইংরাজ সৃষ্ট করিয়া কেরাণীর কাজ চালাইবার মানস করিলেন। অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহাকে এদেশের পক্ষে এক পরম লাভ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মন তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিতে অসম্মত হইতেছে। কোন্ কুক্ষণে স্মার্ত্ত বিধানপ্রদাতারা সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ করিলেন, সেই কথা ভাবিয়াই মনের খেদ মিটাইতে পারি না। অবাধ সমুদ্র-যাত্রার বিধান থাকিলে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-রত্নসমূহ স্বদেশীয় ভাষায় বহু পূর্ব্বেই আমরা সঙ্কলন করিতে পারিতাম এবং তাহা হইলে দেশ স্বাধীন থাকা-কালেই নিজেদের মাতৃভাষার ভিতর দিয়া সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশের পটুত্ব আমাদের জন্মিত। আমরা গর্ব্ব করি, বলি-দ্বীপ প্রভৃতিতে আমরা আমাদের সভ্যতা প্রেরণ করিয়াছি এবং এভাবে বৃহত্তর ভারত সৃষ্টির চেষ্টার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছি। কিন্তু ভারতের বাহিরে যেখানে যাহা গ্রহণীয় আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য কাহাকেও আমরা প্রেরণ করি নাই। যাহাকে বাহিরে পাঠাইয়াছি, চিরতরেই পাঠাইয়াছি। সে বা তাহার বংশধর ফিরিয়া আসিয়া বৃহত্তর ভারতের আদি মাতৃ-ভূমিকে কোনও নূতন জ্ঞানে, নূতন শিল্পে, নূতন সম্পদে

মহত্তর করুক, এ কল্পনা কখনও করি নাই। পরাধীন ভারত তাহার দেশীয় সাহিত্যে কত কত বিদেশী শব্দকেই না পরম সমাদরে ঠাঁই দিল, কিন্তু স্বাধীন ভারত যদি ইহা করিয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে আজ হয়ত রাষ্ট্রভাষা লইয়া কোনও সমস্যাই উদিত হইত না। আজ আমরা মেকলের স্বপ্নকে সত্য করিয়া বাংলা, হিন্দী, মারাঠিতে ইংরাজী চিন্তা করিতেছি, কিন্তু য়ুরোপীয়নরা এদেশে আসিবার বহু পূর্ব্বে যদি আমাদের সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া না যাইত, তাহা হইলে আজ হয়ত ইংরাজ, ইটালিয়ান, ফরাসী প্রমুখ বহু জাতি নিজ নিজ ভাষায় ভারতীয় চিন্তা করিতে বাধ্য হইত। এই ভারতে বসিয়া আর্য্য-প্রতিভা বহু অনার্য্যজ্ঞানকে নিজস্ব করিতে পারিয়াছে কিন্তু সমুদ্র-যাত্রার উপরে খড়্গহস্ততার ফলে ভারতীয় আর্য্য-প্রতিভা ভারতের বাহিরে গিয়া কোনও আর্য্য বা অনার্য্য জাতির কাছ হইতে কৃষ্টির সম্পদ আহরণও করিতে পারে নাই, কোনও জাতিকে আপনও করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ইংরাজী শিক্ষা এই সর্ব্বনাশকে দূর করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে পল্লবগ্রাহী করিয়াছে, ক্ষণ-চপলই করিয়াছে। ইহা আমাদিগকে চিন্তায় গভীর বা চরিত্রে মহৎ করিয়াছে, এমন কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। ইংরাজী শিক্ষাকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া কোনও উপায়ে আমাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে কি না, এই বিষয়ে গভীর মনোযোগ প্রদান করা আমি অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। ইংরাজী বিদ্যা শিখিবার পূর্ব্বেও আমরা

যথেষ্ট পরিমাণে খলতা ও কপটতার চর্চ্চা করিয়াছি, ইহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু বাহিরের চটকে অন্তরের দৈন্য লুকাইয়া রাখিবার এমন সাবলীল কৌশল অতীতের কোনও শিক্ষা-পদ্ধতিই শিখাইয়া দিতে পারে নাই। বিদেশীয় বলিয়াই ইংরাজী শিক্ষা বর্জ্জনীয়, তাহা বলিতেছি না। ইহার মোহ-মদিরা পান করিয়া আমরা যে ভারতীয়ত্ব হারাইতে চলিয়াছিলাম, তাহারই জন্য ইহা বর্জ্জনীয়। কিন্তু ভারতীয়ত্ব সম্যক্ বজায় রাখিয়া যদি ইংরাজী শিক্ষাকে ধরিতে পার, রাখ, আপত্তির কোনও হেতু নাই। ইংরাজী বলিয়াই সে বর্জ্জনীয় নহে, তাহাকে গরলমুক্ত করিয়া যদি পান করিতে পার, তাহা হইলে আকণ্ঠ পানেও আপত্তি কি ?"

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ষ্টীমার বরিশাল পৌঁছিল।

আলেকান্দা, বরিশাল
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

শ্রীশ্রীবাবামণি আলেকান্দাতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায়ের ভবনে অবস্থান করিতেছেন। অপরাহ্ণে কয়েকটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ দর্শনার্থে আসিলেন। ইহারা স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্র।

প্রভাত-ভবন

একটী ছাত্র ১৩৩৮এ লেখা শ্রীশ্রীবাবামণির একখানা পত্র দেখাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে "প্রভাত-ভবন" জিনিষটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রহিমপুরে যখন অগ্নিভয়ে আর আশ্রমের জমিতে কিছুতেই ঘর উঠ্‌ছে না, তখন সেই গ্রামের

রসিকচন্দ্র রায় আর প্রভাতচন্দ্র রায় এই দুই ভ্রাতা তাঁদের নিজেদের বসতবাটী আমাদের বাসের জন্য ছেড়ে দেন। তদবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ গৃহেই আমি এবং আমার ব্রহ্মচারীরা বাস, বিশ্রাম, আহার ও সাধন-ভজনাদি করি। সেই কুটীরের নাম দিয়ে রেখেছি 'প্রভাত-ভবন'। একদা এই পৃথিবীতে রসিকও থাক্‌বেন না, প্রভাতও থাক্‌বেন না। কিন্তু প্রভাত-ভবনের স্মৃতি চিরকাল বেঁচে থাকবে।

রসিকচন্দ্র রায় ও প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কারো ঘর সাধুদের থাকবার জন্য ছেড়ে দিলেন ব'লেই তাঁরা অমর হ'য়ে রইবেন, এটা কোনও যুক্তি নয়। রসিক আর প্রভাত এ দুটী ভ্রাতার অন্তরের বিনয় তাঁদের দুজনকে আমার কাছে অমর ক'রে রেখেছে। রসিক ছোট ভাই, প্রভাত বড় ভাই। সেবার সঙ্গে এঁরা স্পর্দ্ধাকে যুক্ত করেন নি; সেবা ক'রে তার জন্যে দর্পিত হন নি, তাঁদের এই সেবার কথা দশজনে জানুক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করেন নি। এইখানেই তাঁদের সেবা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে। গৃহ ত' কত লোকেরই আছে। মহৎ সঙ্কল্পে তার ব্যবহার কয়টি স্থলে হয় ?

যোগাভ্যাসের উদ্দেশ্য

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানীয় যুবকদের কতকগুলি যৌগিক কৌশল শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং তৎপরে বলিলেন,

—সর্ব্বদা সর্ব্বথা নিজের প্রত্যেকটী চিত্তান্দোলনকে ভাগবতী অনুভূতি দিয়ে বিজড়িত ক'রে রাখার জন্যই যোগাভ্যাস। সার্কাস দেখাবার জন্যে নয়, লোক-মান পাবার জন্যে নয়, কিম্বা অন্য কোনও প্রকার ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্যও নয়, যোগাভ্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল মরণশীলকে অমর করা, ক্ষয়শীলকে অক্ষয় করা, জ্বরাব্যাধিগ্রস্ত নিত্যক্ষয়িষ্ণু দেহের ভিতরে বাস ক'রেও জরামরণরহিত ব্রহ্মপদে নিত্য প্রবিষ্ট থাকা।

আলেকান্দা, বরিশাল
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

প্রাতে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশবাণী শুনিতে আসিলেন। প্রাথমিক কুশল-প্রশ্নাদির পরে সমালোচনা হইতে লাগিল। আগন্তুকেরা সকলেই উচ্চ রাজকর্ম্মচারী।

সত্যানুগত জীবন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনকে সত্যাভিমুখী করার অবিরাম চেষ্টার নামই সাধনা। পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাবে সত্য-সম্পর্কিত অনুভূতি এক এক ব্যক্তির পক্ষে এক এক রকম থাকে। তাই, এই চেষ্টার মধ্যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রকারের পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যে বিশেষ কিছু যায় আসে না, যদি জীবনকে সত্যানুগত করার দিকে লক্ষ্যটা থাকে একান্ত অকপট। সত্যের সঙ্গে কপটতার কখনো কোনো আপোষ সম্ভব নয়। সত্যানুগত জীবন সর্ব্বাবস্থাতেই কাপট্যের ঊর্দ্ধে থাক্‌তে বাধ্য। আর, যে জীবনে কাপট্য নেই, সেই জীবনের সাথে অপর

সত্যানুসন্ধীর জীবনের কোনও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই স্বাভাবিক নয়।

পারুল দেবী

অপরাহ্নে ঘাটলার পাড়ে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় যুবককে যৌগিক আসন-মুদ্রাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। এই সময়ে বিক্রমপুর কাঠিয়াপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র চন্দ আসিয়া অনুরোধে করিলেন যে, নিকটেই এক ভদ্রলোকের গৃহে তাঁহাকে যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবানণি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীযুক্ত প্রমোদ বলিলেন,—"এই ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম পারুল দেবী, ইনি দূর সম্পর্কে আমার বৌদি হন, তিনি আপনাকে দেখ্‌বার জন্য বড়ই ব্যাকুল।"

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবসরই যে করা কঠিন।

প্রমোদ।—না বাবা, আপনাকে যেতেই হবে। আপনি যৌগিক আসনমুদ্রা শিক্ষা দেবেন ব'লে যে বিজ্ঞাপন কাল আপনার সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন, সেই বিজ্ঞাপনে আপনার একখানা ফটো ছাপান ছিল। কি ক'রে জানি সেই বিজ্ঞাপনের একখণ্ড এই বৌদির হাতে পড়ে। তারপর থেকেই ইনি আপনার চরণ-দর্শনের জন্য ব্যাকুলা হয়েছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি—কিন্তু অবসর কৈ ?

প্রমোদ।—অবসর কত্তেই হবে। ইনি বলছেন যে, প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আপনিই স্বপ্ন-যোগে এঁকে দর্শন দিয়ে দীক্ষা প্রদান করেছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এ ত' এক মন্দ মজা নয়। আচ্ছা যাব।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্তা পারুল দেবীর গৃহে পৌঁছিলেন।

পারুল দেবী তখন তাঁর শিশুকে দোলনায় চড়াইয়া দোল দিতে ছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার গৈরিক গেল কৈ বাবামণি ? আপনার দীর্ঘ কেশ কোথায় ? আপনার গলায় না একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা ছিল ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৈরিক আর রুদ্রাক্ষ ছেড়ে দিয়েছি। চুল কেটে ফেলেছি। কিন্তু এসব যে আমার ছিল, তা' তুমি জানলে কার কাছে ?

পারুল দেবী।—কেন বাবামণি, আপনি যেদিন স্বপ্নে আমায় দীক্ষা দেন, সেদিন যে এসব আপনার দেখেছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

শ্রীযুক্তা পারুল দেবীর কথায় সকলেই বিস্ময় অনুভব করিলেন কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি এই প্রসঙ্গ চাপা দিলেন।

স্বপ্নে দীক্ষালাভের হেতু

নিজ বিশ্রামস্থানে ফিরিয়া আসিলে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পারুলদিদির এই স্বপ্নে-দীক্ষা ব্যাপারটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পবিত্র মন, একাগ্র চিত্ত, ব্যাকুল আগ্রহ, সংসারমোহের লোপ এসব কারণ একত্র সমাবিষ্ট হ'লে

ঐশ্বরিক শক্তি যে কোনও একজন পারমার্থিক ব্যক্তির মূর্ত্তি ধ'রে এসে সাধনের সঙ্কেত ব'লে দিয়ে যান। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।

আলেকান্দা, বরিশাল
৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

ভগবানের দেওয়া দুঃখ

প্রাতে নয়টায় শ্রীশ্রীবাবামণি ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র সোমের গৃহে আসিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী শ্রীযুক্তা শ্যামলা দেবী শ্রীশ্রীবাবামণির চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শোক-দুঃখের আঘাতে বিদীর্ণ হয়নি, এমন হৃদয় জগতে কোথাও খুঁজে পাবে না। বেদনার শেল প্রত্যেকের বক্ষে দু'-একবার ক'রে বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তাঁরাই জগতে ধন্য, যাঁরা ভগবানের দেওয়া দুঃখকে তাঁরই দেওয়া জ্ঞান ক'রে নীরবে হাসিমুখে সব সহ্য ক'রে যান। দুঃখ ত' দেহ-ধারণের একটা অপরিহার্য্য সর্ত্ত। দুঃখ দেখে ভয় পেয়ো না, ব্যথা পেয়ে মুশ্‌ড়ে যেয়ো না।

গান শোনাইব নিজেকে

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর গৃহে আসিয়াছেন। একজন একটি হারমোনিয়াম্ আনিয়া দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে কয়েকটী গান

শুনাইবার জন্য আগ্রহ জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—গান ত' বাছা তোমাকে শুনাব না, শুনাব নিজেকে। তা'র মধ্যে ফাঁকতালে যদি তুমিও শুনে ফেল, তবে আপত্তি নেই।

সুমধুর স্বরলহরীতে দশদিক মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির স্বরচিত সঙ্গীত সুরু হইল।

তেম্‌নি কেবল তোমার তরেই

তেম্‌নি কেবল তোমার তরেই হই যেন পাগল,
চাতক যেমন চায় না কভু বৃষ্টি ছাড়া জল॥
প্রাণ যেন আর চায় না কিছু, ছোটে তোমার পিছু পিছু,
তোমার তরেই কেঁদে যেন ভাসাই বক্ষতল॥
নদী যেমন সাগর-পানে ছোটে সতৃষ্ণ পরাণে,
আকুল হৃদয়, অধীর নয়ন, আবেগ অবিরল॥

আমার প্রেমের মন্দাকিনী

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিতে লাগিলেন,—

আমার প্রেমের মন্দাকিনী তোমার পানেই ধায়।
তোমার বুকেই ওগো সাগর বিলয় পেতে চায়॥
তোমায় ছাড়া জানে না সে, তোমায় কেবল ভালবাসে,
সকল যে তা'র সফল, যদি তোমার পরশ পায়॥
তুমিই যে তা'র জীবন-মরণ, তুমি যে তা'র শঙ্কা-হরণ,
তাই এ' মন্দাকিনীর ধারা তোমার গানই গায়॥

ওগো তরঙ্গিনী তোর

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

ওগো তরঙ্গিনী, তোর ক্ষুধিত উল্লাস মাঝে,
আমার অন্তর ভরা সানন্দ বেদনা বাজে॥
আমারি সংঘাত-রাশি তোর বুকে উঠে হাসি',
প্রাণের জ্বলন্ত ছবি তোর উন্মাদিনী সাজে॥
গর্জ্জন-ঝঙ্কারে তোর সংশয়-সোহাগ মোর,
পাই কি না পাই প্রাণের যৌবনের অধিরাজে॥

ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও, তরণী আমার।
অভিমান-ভরা তনু কর ছারখার॥
ক্ষিপ্ত ঝটিকা দিয়া নিয়ে যাও উড়াইয়া
যাহা কিছু আছে প্রিয় ভোগ-উপচার॥
তরঙ্গ-ক্ষুধিত নীরে চারিদিকে লহ ঘিরে,
দাও ডুবাইয়া মম কামনা-আগার॥
তোমারি লাগিয়া হরি চূর্ণ করহ তরি,
কাঁদাও তোমারি তরে মোরে অনিবার॥

অনেক কিছু চাইনি প্রভো

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

অনেক কিছু চাইনি প্রভো, বৃথাই তুমি হও কৃপণ।

চাইনি আমি রাজৈশ্বর্য্য চাইনি আমি ধন রতন॥
চাইনি আমি যশের রাশি, চাইনি সুখের মধুর হাসি,
বাজলে প্রাণে তোমার বাঁশী ভুলব আমি তিনভুবন॥
জঠর-জ্বালায় হই না কাতর, সইতে পারি ব্যথার আঁচড়,
"সকল দুঃখ দূর করহে"—এই নহে মোর আকিঞ্চন।
দিন-রজনী হে গুণধাম, শুনাও কাণে তোমারি নাম,
প্রাণের পুরে তোমার সুরে রাগরাগিণীর আলাপন॥

ওগো প্রাণের হরি

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

ওগো প্রাণের হরি,
তোমার প্রেমে দাওহে আমার চিত্তটুকু ভরি'॥
চতুর্দ্দিকের আকর্ষণে বিকার যেন না হয় মনে,
হিয়ার মাঝে মোহন সাজে দাঁড়াও আলো করি'॥
মরম-জোড়া আকুল কথা তোমায় লভুক সার্থকতা,
তোমায় ছাড়া বিশ্ব-ভুবন যাই যেন বিস্মরি'॥

বিছট (খুলনা)
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

শ্রীশ্রীবাবামণি খুলনা জেলার অন্তর্গত বিছট গ্রামে আসিয়াছেন। জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীতে উঠিয়াছেন। অপরাহ্নে চতুর্দ্দিকস্থ ছয়-সাত খানা গ্রামের যুবক ও প্রৌঢ়েরা বক্তৃতা শুনিতে সমাগত হইয়াছেন।

অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান

শারীরিক ক্লান্তি হেতু শ্রীশ্রীবাবামণি দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিলেন না। বসিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষের অতীত নিয়ে যেমন গবেষণার অন্ত নেই, তা'র ভবিষ্যৎ নিয়েও তেমন গবেষণার অন্ত নেই। অতীত কি ছিল, তা' নির্দ্ধারণের জন্য বহু মনীষী ব্যক্তি তথ্যানুসন্ধান কচ্ছেন এবং ভবিষ্যৎ কি হবে, তা' নিয়েও অনেক জল্পনা হচ্ছে। সম্পূর্ণ অতীত কখনই পুনরুদ্‌ঘাটিত হতে পারে না, কিন্তু অতীতের অনেক আলোপনীয় সাক্ষ্য বর্ত্তমানের ভিতরেই লুক্কায়িত রয়েছে। ভবিষ্যৎ কি হবে, তারও অনুমান সঠিকভাবে কখনো সম্ভব হবে না, কিন্তু ভবিষ্যৎ গঠিত হবে যার জোরে, সেই উপাদানগুলি সবই আমাদের বর্ত্তমানের ভিতরে আত্মগোপন ক'রে আছে। এই কারণেই অতীতে কি ছিল, আর ভবিষ্যতে কি হবে, তার আলোচনার চেয়েও বর্ত্তমানে আমাদের কি আছে, তার আলোচনাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমানের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বর্ত্তমানকে খতিয়ে দেখ। পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ত্তমানের উপাদান-সমূহের হিসাব নিয়ে তারপরে প্রাণপণ যত্নে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, ধারাবাহিক প্রয়াসে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার কর। এর ভিতর দিয়ে ভারতের তথা জগতের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্ম্মিত হবে।

অতীতের বনিয়াদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের ভবিষ্যৎ বলতে সমগ্র জগৎকে বাদ দিয়ে বোঝ্‌বার প্রয়োজন নেই। ভারতের আবহমান কালের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা-দীক্ষা কোনও সময়েই আত্ম কেন্দ্রিক নয়। ব্যক্তির উন্নতিকে ভারত চিরকাল নিখিল বিশ্বের উন্নতির সাথে এক করে দেখেছে। ব্যক্তির কুশল ভারতীয় দৃষ্টিতে চিরকালই বিশ্ব-ভুবনের প্রত্যেকটী প্রাণীর কুশলের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, গ্রথিত, একীকৃত। ভারত নিজের চাওয়া এবং পাওয়ার সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চাওয়া এবং পাওয়াকে অভেদ জ্ঞান ক'রে নিত্যকাল তপস্যা ক'রে এসেছে। ভারতের সেই অতীত অনুশীলনের ভিত্তিতে ভারতকে আজ তার বর্ত্তমানকে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে আনতে হবে। ভবিষ্যতের সৌধচূড়া তাতেই হবে নির্ম্মিত।

দেশ-ভক্তির বন্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতে আজ দেশ-ভক্তির এক অপূর্ব্ব বন্যা চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এদেশের পক্ষে এ বন্যার আবশ্যকতা ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু বন্যার জল সবটাই কখনো স্বচ্ছ নির্ম্মল থাকে না, তাতে অনেক অবাঞ্ছিত আবর্জ্জনাও ভেসে আসে। বন্যা থেমে গেলে নীচে পলি পড়ে। সেই পলিতে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়। দেশ-ভক্তির বন্যারও পরবর্ত্তী ফল তাই হবে। দেশভক্তির প্রবল বন্যা অনাবশ্যক নয়।

বিপজ্জনক স্বদেশ-ভক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অন্যান্য দেশের দেশ-ভক্তি যে বিষময় ফলই প্রসব ক'রে থাকুক, ভারতের দেশ-ভক্তি যেন জাতি-বিদ্বেষ এবং পরহিংসা-প্রবৃত্তি সৃষ্টি কত্তে না পারে, তার দিকে আমাদের সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা দরকার হবে। কারণ, যে স্বদেশ-প্রেম বিদেশীকে বিদ্বেষ কত্তে শেখায়, সে স্বদেশ-প্রেম নিজের ভিতরে এমন এক হিংস্রতার আবাস-ভূমি রচনা করে, যার দরুণ ভবিষ্যতে আত্মহনন তার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য হ'য়ে দাঁড়ায়। এই বিপজ্জনক পরিণতি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই চাই অতীতের অনুশীলনের উপরে বর্ত্তমানের সাধনাকে দাঁড় করান। ভারতকে বড় হ'তে হবে কিন্তু জগতের কারো অনিষ্ট সাধন না ক'রে।

ব্রহ্মচর্য্য ও ভারতের অভ্যুদয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এইরূপ উদার মনোভাবের সুপ্রসার সম্ভব শুধু মস্তিষ্কের বলে নয়, শুধু যুক্তি-বিচারের শক্তিতে নয়, পরন্তু, ব্যাপক হৃদয়িকতার বলে। সেই বল আসে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা থেকে। তাই ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের ভবিষ্যতের মূল-সূত্র, তাই ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূল-মন্ত্র।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল ব্রহ্মচর্য্য ও তাহার সাধনা সম্পর্কে অতিশয় মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

পল্লী-পর্য্যটন তথা তীর্থ-পর্য্যটন

রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে ভিন্ন গ্রাম হইতে কয়েকজন লোক দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা সময়মত খবর পান নাই বলিয়া বক্তৃতা শুনিতে আসিতে পারেন নাই, তবে বিলম্বে পৌছিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ অপরের মুখে শ্রবণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন বলিলেন,—আমাদের ন্যায় পল্লীগ্রাম-বাসীদের মহাভাগ্য যে আপনার মত মহাপুরুষ এ সব অঞ্চলে পদধূলি দিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' নয় বাছারা তা' নয়। আমারই পরম ভাগ্য যে, আমি পল্লীর পর পল্লী পর্যটনের সুযোগ পেয়েছি। ভারতের মৃত্তিকা তীর্থ-রেণু। এমন কোনো স্থান নেই, এমন কোনো গ্রাম নেই, যেখানে ব'সে কোনও না কোনও যুগে কোনও না কোনও যোগী বা মহাপুরুষ জগতের কল্যাণ-চিন্তা না করেছেন। এক একটী পল্লী ভ্রমণ কচ্ছি আর এক একটী দিব্যজীবনের স্পর্শানুভূতি পাচ্ছি। কোথাও বৃক্ষতলে, কোথাও বা নদীর তীরে, কোথাও বা শ্মশানাসনে, কোথাও বা লতা-গুল্মচ্ছায়ে ব'সে মহাপুরুষেরা মহতো-মহীয়ানের স্পর্শ নিজ নিজ অন্তর দিয়ে লাভ করেছেন। ফলে, আমার এ পল্লী-পর্য্যটন ত' প্রকৃত প্রস্তাবে তীর্থ-পর্য্যটন!

ভদ্রলোকেরা ধরিলেন যে আগামী দিন শ্রীশ্রীবাবামণিকে স্বল্পকালের জন্য হইলেও তাঁহাদের গ্রামে যাইতে হবে। শ্রীশ্রীবাবামণি সম্মত হইলেন।

১৯ কার্ত্তিক, ১৩৪০

গ্রামটির নাম পাণ্ডুলিপিতে লিখিত নাই। বিহুট হইতে দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল হইবে। প্রাতঃকালীন ধ্যানোপাসনা সমাপনান্তর শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রামীণ ভদ্রলোকদের সহিত রওনা হইলেন।

অন্তরের অনন্ত সৌন্দর্য্য

তাল, খর্জ্জুর ও নারিকেলের বৃক্ষে পরিশোভিত প্রান্তর বাহিয়া যাইতে যাইতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই প্রান্তর যেমন শ্যাম-শোভায় সুষমান্বিত, তোমার হৃদয়ের প্রান্তরও প্রেম-শোভায় তেমনি সুন্দর, তেমনি মধুর। হৃদয় তোমার প্রেমেরই খনি, কিন্তু তা' তুমি নিজে জান না। বাইরের সহস্র চিন্তাকে মন থেকে দূরে স'রে যেতে ব'লে অনাসক্ত, নিঃস্পৃহ মন নিয়ে কিছুদিন স্থির হ'য়ে ব'সে থাক্‌বার চেষ্টা কর্‌লেই দেখবে, তোমার ভিতরে অফুরন্ত প্রেম তোমার কাছে ধরা দিচ্ছে। চোখকে বাইরে যেতে দাও ব'লেই তোমার নিজের ভিতরের প্রেমশোভা তুমি দেখতে পাও না। কাণকে বাইরের কথায়, বাইরের গানে প্রসক্ত কর ব'লেই তোমার নিজের ভিতরের প্রেম-সঙ্গীত শুনতে পাও না। বাইরের সহস্র সংস্রব ত্যাগ ক'রে অন্তরের পানে সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাকাও। এই তাকাবার অভ্যাস থেকেই তোমার সকল পরমার্থ সিদ্ধ হবে। কারণ, এ সৌন্দর্য্য অনন্ত।

সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যাস্ত-কালে তথা শয়ন-কালে সাধন

প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ,

তোমার একথা সত্য যে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সকল কর্ম্মের সংস্রব ছেড়ে দিয়ে দিবারাত্রি আত্ম-চিন্তনের অবসর তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সমগ্র দিন এবং সমগ্র রাত্রির ভিতরে দু'টি ঘণ্টা সময় ত' যে কোনও প্রকারে ক'রে নিতে পার্ব্বে? তা' যদি পার, তবে ক্রমশঃ তাতেই তোমার সব সাধনের সিদ্ধি হবে। অন্ততঃ সূর্য্যোদয়ে একবার আর সূর্য্যাস্তে একবার ক'রে মনকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়-চর্চ্চা থেকে টেনে এনে নিজের ভিতরে নিজেকেই শুধু দেখ্‌তে প্রয়াস পেলে তার ফলে সারাদিন আর সারারাত একটি নেশার মৌতাত জমে যায়। রাত্রিতে শয়ন-কালে এ প্রয়াস পেলে ঘুমের ভিতরেও মন এই এক অবলম্বন নিয়েই পুষ্ট হ'তে থাকে।

নানা প্রসঙ্গ হইতে হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির আগমন-প্রতীক্ষায় গ্রামবাসীরা পূর্ব্বেই মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া পৌঁছিলেই সকলে থামিলেন।

মৃদুকণ্ঠে কীর্ত্তনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম-কীর্ত্তন থামালে কেন বাছারা। এস, আমরা সবাই মিলে নামে মত্ত হই। তবে কাঠ-ফাটা উচ্চ কণ্ঠে নয়, প্রাণ-জুড়ান মৃদুকণ্ঠে হরিনাম কর্ব্ব। আমি মৃদুকণ্ঠে নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর্ব্বে সেই নাম গিয়ে নামীর কাণে পৌঁছুবে না, তা'ত নয়! আর ভগবানকে শুনাবার জন্যই ত' আমার নাম-কীর্ত্তন নয়! নিজেকে শুনাবার জন্য। বাইরের সহস্র বাজে

কথায় কাণ দিয়ে নিয়ত শ্রবণ-শক্তির অপব্যবহার কচ্ছি, নামকীর্ত্তন-শ্রবণ দ্বারা কর্ণকে সার্থক কর্ব্ব। কীর্ত্তনের ফলে বৃথা-প্রজল্পরত রসনা নাম ক'রে ক'রে সার্থক হবে, পাপ-প্রমুক্ত হবে, বৃথা-বিষয়ে অভিনিবেশ-প্রবণ মন ভগবানের পায়ে ফিরে আসবে, শান্ত হবে,—যে স্থানে ব'সে-দাঁড়িয়ে, জেগে-ঘুমিয়ে হাজার লোকে হাজারবার হাজার রকমের অনাচার করেছে, সেই স্থানটি পবিত্র হবে, পুণ্যময় পীঠস্থানে পরিণত হবে এবং প্রতিবেশীরা বিষয়াভিনিবিষ্ট মনকে হরিনামামৃত-রসে আসক্ত করার রুচি পাবে। কীর্ত্তনের এগুলিই হচ্ছে উদ্দেশ্য। সুতরাং গগন-পবন-ধরিত্রী বিদীর্ণ ক'রে প্রলয়ের মহা-ঝঞ্ঝা বহিয়ে, ফুসফুস ফাটিয়ে কীর্ত্তন করার প্রয়োজন কি? এস, আমরা মৃদুকণ্ঠে নাম-কীর্ত্তন করি, যা'তে নামের স্নিগ্ধতার পরম পবিত্র প্রভাব হৃদয়-মনকে সুশীতল করে, অথচ কোনও দৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে উদ্বেগ না বাড়ায়।

দীক্ষা ও আত্ম-পরীক্ষা

তৎপর কিছুকাল কীর্ত্তন চলিলে পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বিছট ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। কয়েকটী ব্যাকুল-হৃদয় যুবক-যুবতী শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে দীক্ষা-গ্রহণের আবেদন জানাইলেন।

কারণ-বশতঃ শ্রীশ্রীবাবামণি একজনকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন,—"আগে আত্ম-পরীক্ষা কর, দীক্ষা সময়-মত উপযুক্ত স্থানে হবে।" অবশিষ্ট কয়জন দীক্ষা পাইলেন।

প্রকৃত গুরু-দক্ষিণা

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি নব-দীক্ষিতদিগকে উপদেশ দিলেন,—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে অণু-পরমাণু সকলের নিকটেই তোমাদের অফুরন্ত ঋণ। সেই ঋণ অপরিশোধ্য। তবু তা' শোধ করার জন্য আমৃত্যু উদগ্র উদ্যম চাই। তবেই তোমাদের পক্ষে গুরু-দক্ষিণা দেওয়া হ'ল ব'লে জানবে। গুরুদেবকে একটি মাত্র হরীতকী দক্ষিণা দিয়ে আজ একটা প্রথার মাত্র মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছ। কিন্তু জানবে, প্রকৃত গুরু-দক্ষিণা টাকা দিয়ে হয় না, ভূমি দিয়ে হয় না, পরন্তু নিজের জীবন নিখিল ভুবনে উৎকৃষ্টতম মঙ্গলের জন্য অবিরত নিয়োজিত রাখার ভিতর দিয়ে হয়। তোমরা প্রকৃত গুরু-দক্ষিণা দিতে সমর্থ হও, তোমাদের প্রতি এই হচ্ছে আমার অকপট আশীর্ব্বাদ।

চিরকাল ছোট থাকিবে না

পরে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—আজকের হিসাব দেখতে হ'লে তোমাদের মধ্যে কেউ হয়ত বংশে ছোট, কেউ বা সাধনায় ছোট, কেউ বা ত্যাগে, সংযমে, ভাগবতী ভক্তিতে ছোট, কিন্তু চিরকাল তোমরা ছোট থাকবে না। অমৃতময় নামের সাধন জাতি-কুল-মানের ঊর্দ্ধে তোমাদের তুলে নেবে। নামের সেবা সকল ছোটত্ব, সকল নীচত্ব, সকল অর্ব্বাচীনত্ব দূর ক'রে তোমাদের তেজস্বী, বীর্য্যবান্, পরোপকারক্ষম, মহাশক্তিধর মহাপুরুষে পরিণত কর্ব্বে। আমার যে শিষ্য আজ যত অনাদৃত, যত অবজ্ঞাত, যত অপরিচিত, সাধন ক'রে ক'রে সে হবে

মানব-জাতির পক্ষে তত আবশ্যকীয়, তত অপরিহার্য্য, তত হিতপ্রদ, তত অভ্রভ্রংলিহ-মস্তক। আজ তুমি ছোট আছ ব'লে মনের ভিতরে দুর্ব্বলতাকে ঠাঁই দিও না। সাধনের বলে রত্নাকরই হয় বাল্মীকি, মহাদস্যুই হয় পরম-তপোধন। চিরকাল তোমরা ছোট থাক্‌বে না।

বড় হওয়ার বিপদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বড় হওয়ার বিপদ আছে। ছোট গাছ ঝড়ে পড়ে না, বড় গাছ ঝড়ে প'ড়ে যায়। বড় হ'লেই অহঙ্কার আসে, অভিমান আসে, মান-সম্মানের বোধ আসে, কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, ক্ষমতা-মদ-মত্ততা আসে, হামবড়াই আসে, গুরুগিরির উৎপাত আসে। সাধন-জীবনে এর চেয়ে বড় ভয়ের কথা আর কিছু নেই। অসাধক, অভক্ত ছোট হ'য়ে থাকার মানে হচ্ছে জীবনকে অসার্থক রাখা। কিন্তু, ভক্ত সাধক, বড় হওয়ার ভিতরেও কতকগুলি নিদারুণ বিপদ রয়েছে। সুতরাং তোমরা করবে কি ? নিজেদের ভিতর থেকে গুরু হবার সখ, গুরু হবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রে দেবে।

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪০

বিছট হইতে * শ্রীশ্রীবাবামণি বাগেরহাট যাইবেন, কিয়দ্দূর পদব্রজে যাইয়া পরে নৌকায় উঠিতে হইবে। পথেই গোয়ালমঠ (শোলারকোলা) উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়টী পড়ে। বিদ্যালয়ের

* তারিখটি ১৯ কার্ত্তিক, কি ২০ কার্ত্তিক, তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ সম্ভব হয় নাই।

প্রধান শিক্ষক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রসিকলাল চক্রবর্ত্তীর একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবামণি এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ প্রদান করিলেন। আহারান্তে এবং পদব্রজে পথ চলিবার মাঝখানে বক্তৃতা শুরু করিয়াছেন, সুতরাং বক্তৃতা একঘণ্টার বেশী হইল না। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতেই খুব মুগ্ধ হইল।

তোমার জীবন বটের বীজ

বক্তৃতাকালে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্ষুদ্র বট-বীজ কি জানে যে, একদা সে এক মহামহীরুহে পরিণত হ'তে পারে ? তোমাদের অবস্থাও তেমন। তোমরা কেউ জান না যে, একদা তোমাদের মধ্য থেকেই বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মত ত্রিলোকোদ্ধারকারী মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'তে পারে। কিন্তু বট-বীজ তার ভবিষ্যৎ জানুক আর না জানুক, মাটিতে যদি পড়ে, সে বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করবেই। তোমাদেরও আশ্রয়-মৃত্তিকা হচ্ছে—ভগবানের প্রতি প্রাণভরা অনুরাগ। এই অনুরাগের মৃত্তিকা নিয়ে যদি নিজেদিগকে উপযুক্তকাল উপযুক্তভাবে আচ্ছাদিত ক'রে রাখ্‌তে পার, তোমাদের মত সামান্য বালকেরাই কবীর, নানক, রামদাসস্বামীর সামর্থ্য নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করবে। তোমার জীবনকে জানো একটী বীজ। ভগবানের প্রতি সুগভীর অনুরাগকে জানো সেই মৃত্তিকা, যেই মৃত্তিকায় উপ্ত হ'লে তোমার জীবনের বীজ ফুটবে, জীবনের ভিতরে সঙ্গোপনে রক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ঐশী বিভূতির, দৈবী শক্তির বিকাশ ঘটবে। আর তোমার ভবিষ্যৎকে জানো সেই সব মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ, যাঁদের চরণ-

কোণার একটুখানি ছায়াতে তাপদগ্ধ, পাপক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ নরনারী পায় শান্তিময়, শ্রান্তিহর, প্রেমমাখা নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

মানব-জীবনের কৃষি

বক্তৃতান্তে কতকগুলি যৌগিক আসন ও মুদ্রা প্রদর্শিত হইল। তৎপর বিশ্রামার্থ শ্রীশ্রীবাবামণি হেড্‌মাষ্টার রসিকবাবুর কক্ষে বসিলেন।

রসিকবাবু কাহারও মুখে পুপুন্‌কী ও রহিমপুরের আশ্রমদ্বয়ের কৃষিপ্রসার সম্বন্ধীয় উদ্যমের বিষয় শুনিয়াছেন। তিনি সেই বিষয়ে আলাপ তুলিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জড় মৃত্তিকার চাষ আর মনোমৃত্তিকার চাষ, দু'টিই কৃষিকার্য্য। সাধক রামপ্রসাদ দুঃখ ক'রে গেয়েছিলেন,—"মন তুমি কৃষি-কাজ জান না, এমন মানব-জমিন রইল পতিত আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত সোণা।" মানব-জমিনের চাষই আসল চাষ। এই চাষই নিত্য চাষ। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি আগাছা সকলকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে অভ্যাস ও ঐকান্তিক প্রয়াসের হল চালনা ক'রে ক'রে দর্প দম্ভের কঠিন-কঠোর মৃত্তিকাকে চূর্ণাদপি চূর্ণ ক'রে তা'তে নিত্য জীবন, নিত্য কুশল, নিত্য প্রেম-লাভের আগ্রহরূপ বীজকে বপন করা চাই। এই চাষই সত্যিকারের চাষ, এই চাষই নিত্য লাভের চাষ।

কৃষিতে পার্থিব ও আধ্যাত্মিকের সমযোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগেকার চাষারা নিজ নিজ পার্থিব ক্ষেত্রেও লাঙ্গল চালাতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-জমিন চাষের

কথাও ভাবতেন। বৈদিক যুগের ঋষিরা মানব-জমিন চাষকেই জীবনের পরম সার্থকতা জেনে সেই ধ্যানে এবং সেই তপস্যাতেই সমগ্র জীবনকে নিয়োজিত কত্তেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে "অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্ ব্রতম্" ব'লে আশ্রম-কুটীরের বাইরে গিয়ে মাটির বুকে লাঙ্গলের ফলাও চালাতেন। এই যে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক চাষের সমযোগে পরিচালন, তা' থেকে বঞ্চিত হ'য়েই আমরা চাষাত্বও হারালাম, ঋষিত্বও হারালাম।

ঋষি-চাষা বা চাষা-ঋষি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ চাই ঋষি, যিনি আধ্যাত্মিক তপস্যার সমুদ্রমন্থনে ব্রতী থেকেও নিজের এবং পরের জন্য দু'মুঠা নীবারকণা নিজের হাতেই উৎপাদন ক'রে নেবেন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পর-প্রত্যাশা রাখ্‌বেন না। আবার আজ চাই চাষা, যিনি অন্ন উৎপাদনের চেষ্টাকে কোনও অলীক বা রহস্যময় অপার্থিব মতবাদের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ক'রে নেবেন না, পরন্তু লাঙ্গলের মুঠি শক্ত ক'রে ধরার সময়ে একই সঙ্গে পরপারের তরীখানার হালের মুঠিই ভালভাবে চেপে ধর্‌বেন। অর্থাৎ চাই ঋষি-চাষা বা চাষা-ঋষি।

অগ্রসর হও

গোয়ালমঠ হইতে নৌকাযোগে শ্রীশ্রীবাবামণি বাগেরহাট রওনা হইয়াছেন। সঙ্গে বিছট-নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও যাইতেছেন। কচুরীপানার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া অতি আস্তে আস্তে নৌকা অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিঃশ্রেয়স লাভের পথ ঠিক এইরূপ। সংসারের সহস্র জঞ্জাল চতুর্দ্দিক থেকে বারংবার এসে ঘিরে ধরছে। কিন্তু সাধক, উদ্যমে বিরত হ'য়ো না, জোরসে লগি ঠেল, প্রতি পলে, প্রতি অনুপলে জীবন-তরণী একটু একটু ক'রে সম্মুখের দিকে চলতে থাকুক। মনে হবে যেন অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, হতাশা আসবে যেন লক্ষ্যে পৌঁছা অনন্ত-কোটি-কল্প-কালেও হ'য়ে উঠবে না, কিন্তু বাহুমূল শিথিল ক'রো না, বজ্রমুষ্টি কোমল ক'রো না, কটীতটে আলস্যকে স্থান দিও না। বিন্দু-বিন্দু স্থান ক'রে ক্রমশঃ অগ্রসর হ'য়ে যাও, প্রাণপণ যত্নে শুধু এগুতেই থাক।

বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে দশরথ ও বসুদেব

ঘণ্টা খানিক কচুরীপানার ব্যূহ-বদ্ধ বিরুদ্ধতার সহিত সংগ্রামের পরে নৌকা পরিষ্কার জায়গায় আসিয়া পড়িল। এই সময়ে পণ্ডিত মহাশয় নানা শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক প্রসঙ্গ তুলিলেন।

প্রশ্ন উঠিল যে, রাজা দশরথ শ্রেষ্ঠ, না বসুদেব শ্রেষ্ঠ ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈষ্ণবেরা রাজা দশরথ এবং বসুদেব এই দু'জনকেই ভগবানের সেবক হিসাবে দেখেন। শ্রীরামচন্দ্র যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং রাজা দশরথ পিতারূপে এই পুত্ররূপী ভগবানের বাৎসল্যরসের আদর্শে সেবক মাত্র। শ্রীকৃষ্ণও যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ও বসুদেব পিতারূপে এই পুত্ররূপী ভগবানের বাৎসল্য-রসের আদর্শে সেবক মাত্র। এই দৃষ্টিতে যদি বিচার কর্ত্তে হয়, তা' হ'লে বসুদেবই শ্রেষ্ঠ, দশরথ নিকৃষ্ট। কারণ, ভক্ত বা সেবকের পক্ষে ভগবৎ-সেবার চেয়ে মহত্তর কর্ত্তব্য

আর কিছুই নেই। এই একটী কর্ত্তব্য পালনের জন্য জগতের সকলের সকল কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করা যায়, সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায়বিচার তুচ্ছ করা যায়, লৌকিক কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে বা সামাজিক কর্ত্তব্য-পালনে জলাঞ্জলি দেওয়া যায়। বসুদেব তাই করেছিলেন, কিন্তু দশরথ তা' পারেন নি। রাজদণ্ডে অবরুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে গোপনে কারাগার থেকে পলায়নকে লৌকিক নীতির উল্লঙ্ঘন বলতেই হ'বে। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণের সুখ সম্পাদন বা নির্ব্বিঘ্নতা সাধনের বৃহত্তর প্রয়োজনে বসুদেব এই লৌকিক সন্নীতিতে পদাঘাত কর্ত্তে দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রেরই সেবা ভক্ত দশরথের একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি কৈকেয়ীর নিকট প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের ভয়ে বনবাস রামচন্দ্রের অযোগ্য জেনেও বিনা দোষে তাঁকে নির্ব্বাসিত ক'রে লৌকিক কর্ত্তব্যের মর্য্যাদাকে আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যের ঊর্দ্ধে স্থান দিলেন। ভক্তরূপে একমাত্র শ্রীরামের সেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু, ব্যক্তি বা আদর্শের সেবা যাঁর কর্ত্তব্য হ'তে পারে না, সেই রাজা দশরথ সাধারণ নিম্নাধিকারী ব্যক্তিগণের ন্যায় সংসারী কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনায় সাধারণ সুনীতি-পরায়ণ ন্যায়বান্ ব্যক্তিগণেরই মত সামাজিক দৃষ্টিতে যা' সঙ্গত, জাগতিক বিধিতে যা' কর্ত্তব্য, তাই কর্লেন, নিজ আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য পালন কর্লেন না। অতএব রাজা দশরথ নিকৃষ্ট ব'লেই বিবেচিত হ'লেন।

সাধারণের চক্ষে দশরথ ও বসুদেব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু জগতের সকলেই বৈষ্ণব নন,

কিম্বা শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণের জীবনী বৈষ্ণবের চোখ, কাণ বা মন নিয়ে সকলে দেখেন না, শোনেন না বা বুঝেন না। নির্দ্দিষ্ট একজন পিতার নির্দ্দিষ্ট একজন পুত্র কেন যে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পিতার দ্বারা পূজিত হবেন, এ প্রশ্নের সহজ কোন মীমাংসা তাঁরা নিজেদের সরল বিচার-বুদ্ধি বা স্বাভাবিক সংস্কার থেকে আদৌ পান না। পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য পিতারূপেই। পুত্রকে ভগবান্ জ্ঞান ক'রে একমাত্র তাকেই ধ্যান জ্ঞান ক'রে, একমাত্র পুত্রকেই অনন্তকালের শরণ মনে ক'রে কেন তা'র সেবা কর্ত্তে হবে, সহজ যুক্তিতে, সাধারণ বুদ্ধিতে তার হদিস্ এঁরা খুঁজে পান না। সুতরাং সংসারের মধ্যে পুত্রের প্রতি পিতার যা' কর্ত্তব্য, তা' পিতা নিখুঁত ভাবে পালন করেছেন কিনা, কিম্বা নির্দ্দোষভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন কিনা, তাই দিয়ে হবে বিচার যে, দশরথ শ্রেষ্ঠ, না বসুদেব শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাম ভগবান্ কিনা, আর ভগবান্ হ'লেও দশরথ বা বসুদেবের পক্ষে নিজ পুত্রকে ভগবান্ জ্ঞান না করা অন্যায় কিনা, তাঁরা নিজ নিজ পুত্রকে ভগবান জ্ঞান ক'রেই যাবতীয় কর্ত্তব্য করেছেন, না সাধারণ ব্যক্তিদের মত পুত্রজ্ঞান ক'রেই কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা দেখেছেন, সেই সমস্ত প্রশ্নকে একেবারে উঠতে না দিয়ে দেখতে হ'বে যে, কে শ্রেষ্ঠ এবং কে নিকৃষ্ট।

সকলের সহিত সকলের তুলনা চলে না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ঘটনাবলীর সুবিস্তারিত সাদৃশ্যের অভাবে প্রকৃত প্রস্তাবে দশরথ ও বসুদেবে তুলনাও বড় কঠিন। রাজা দশরথের ভিতরে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল

যে, কৈকেয়ীর নিকটে প্রদত্ত সত্যই তিনি রক্ষা কর্ব্বেন, না নিরপরাধ ও প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যৌবরাজ্যেই অভিষিক্ত কর্ব্বেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রথমটি কর্ত্তব্য, অপর দিক থেকে দেখতে গেলে দ্বিতীয়টী কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়টীর পক্ষে যুক্তির পরিমাণ অধিক, কিন্তু প্রথমটির পক্ষে একটিমাত্র গুরুভার যুক্তি রয়েছে এই যে, সত্য থেকে স্খলিত হওয়া চল্‌বে না। দশরথের প্রাণ ব্যাকুল দ্বিতীয়টীর মান রাখতে, রামকে বন থেকে ফিরাতে, রামবিরহে তাঁর পক্ষে প্রাণরক্ষা অসম্ভব, কিন্তু তাঁর কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁকে নিজের পক্ষে যা' অপ্রীতিকর সেই কঠোর-কঠিন পন্থা গ্রহণে বাধ্য কচ্ছে। দুইটী বিরুদ্ধ কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব দশরথের সমক্ষে যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বসুদেবের সমক্ষে তা' প্রকাশ পায় নি। কংস-কারাগারে বদ্ধ থেকে কৃষ্ণের মৃত্যুর কারণই হব কিনা, অথবা পুত্রকে নিয়ে পলায়ন ক'রে কারা-বিধি ভঙ্গ করব কিনা, এই নিয়ে বসুদেবের মনে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব বা প্রবল যুক্তি-সংঘাতও কিছু উপস্থিত হয়নি। সুতরাং দশরথ ও বসুদেবের মধ্যে তুলনার সাধারণ মানদণ্ডের অভাব। এক্ষেত্রে তুলনা করার চেষ্টা অযৌক্তিক। সকলের সঙ্গেই সকলের তুলনা চলে না। মাতা মেরীর সাথে কৌশল্যার কি তুলনা সম্ভব? মেরী ঈশ্বরাবতার যীশুর মাতা, কৌশল্যা ঈশ্বরাবতার রামের মাতা,—এই দুইজনের মধ্যে মাত্র এইটুকুই সামান্য।

বাগের হাট, খুলনা
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪০

শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী রায়ের

বাড়ীতে উঠিয়াছেন। টাউন-হল না পাওয়াতে অদ্য অপরাহ্ণে তাঁহারই গৃহের প্রশস্ত বারান্দায় একটী সভার আয়োজন হইল।

আত্ম-প্রবোধন ও পর-প্রবোধন

শ্রীশ্রীবাবামণি সদ্ভাব-প্রচারের আবশ্যকতা এবং তৎকার্য্য-সাধক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

পরিশেষে বলিলেন,—বহির্ম্মুখ প্রচার-চেষ্টা কোনও প্রতিষ্ঠানের আদর্শ বা পন্থা হওয়া উচিত নয়। বহির্ম্মুখ প্রচারকেও অন্তর্ম্মুখ জাগরণের উপায়রূপে গ্রহণ করা চাই। গ্রাম্য চৌকিদার যখন রাত্রিকালে রাস্তায় রাস্তায় হেঁকে বেড়াবে,—"গৃহস্থ জাগো," তখন যেন তারও নিজের নয়ন উন্মিদ্র হয়, তখন তারও যেন নিজের ঘুমটী ভাঙ্গে। পরকে প্রবোধিত করাই উপদেশ দানের লক্ষ্য না হ'য়ে আত্ম-প্রবোধনই যেন তা'র লক্ষ্য হয়। নিজেকে জাগাতে গিয়েই জগতের সকল ঘুমন্তকে জাগাতে হবে। নিজেকে জাগান আসল লাভ, অপরকে জাগান উপরন্তু বা ফাও লাভ।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ বর্জ্জন ও স্ত্রী-ত্যাগ

সভা শেষ হইলে সকলেই নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। স্থানীয় দুইজন যুবক উকিল শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট কতকগুলি সমস্যার সমাধান চাহিলে তিনি তাঁহাদের লইয়া একান্তে বসিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—সম্প্রতি কোনও স্থান থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক এখানে এসে মহকুমার অন্তর্গত কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থানে অবিরাম প্রচার কচ্ছেন,—"স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গ ত্যাগ কর।" এর ফলে বহুলোক নিজ নিজ স্ত্রীকে

ছেড়ে চ'লে যাবার উদ্যোগ কচ্ছে। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভোগবুদ্ধিতে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তিরই নাম স্ত্রী-সঙ্গ। আসক্ত ব্যক্তিদের সংসর্গে বাস কর্লে নিজের ভিতরেও আসক্তি আসে। এইজন্য এদের সঙ্গ ত্যাগের উপদেশ মহাপুরুষ মাত্রেই দেবেন। ভোগবুদ্ধি নিয়ে পুরুষের প্রতি যে সব স্ত্রীলোক আসক্ত, তা'দের সংসর্গও বর্জ্জনীয়। নতুবা আত্মিক এবং নৈতিক ক্ষতি হয়। নারী হোক আর পুরুষ হোক, যা'রই ভিতরে ভোগাসক্তি আছে, সে-ই প্রতিবেশীদের পক্ষে বিপজ্জনক। নিজের ভিতরের সুপ্ত লালসা সে সকলের অজ্ঞাতসারে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে বেড়ায়। প্লেগ-বসন্তের বীজাণুর চেয়েও এই লালসার বীজাণু অনেক বেশী সংক্রামক। কিন্তু "স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন কর" কিম্বা "স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ ছাড়" প্রভৃতি উপদেশের ফলে বিবাহিত ব্যক্তি নিজ নিজ স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাবেন, এর যুক্তি-সঙ্গত অর্থ কিছুই হয় না। আসক্তির সেবা ক'রে ক'রে দেহে-মনে যারা জীর্ণ হ'য়ে গেছে, নূতন বল, নূতন উৎসাহ সংগ্রহ ক'রে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হবার জন্য তাদের পক্ষে সাময়িকভাবে সকল পারিবারিক সংস্রবের বাইরে সৎসঙ্গে বাস প্রয়োজন হয় কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গ বর্জ্জন আর স্ত্রী-ত্যাগ এক কথা নয়।

চাই ভগবৎ-প্রেমিক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাজার প্রচারক প্রচার করুন, জগৎ

থেকে বিবাহিত-জীবনকে তুলে দেওয়া যাবে না। কিন্তু, বিবাহিত নরনারী কামের ক্রীড়নক না হ'য়ে কর্ত্তব্য-প্রেরিত পবিত্র জীবন যাপনে চেষ্টিত হোক্, এটুকু করা চিরকালই সম্ভব হবে সব পুরুষদের সন্ন্যাসী আর সব স্ত্রীলোকদের সন্ন্যাসিনী করা কখনো সম্ভব হবে না, আর সম্ভব হ'লেও তাতে জগতে স্থায়ী ভাবে কোনও শ্লাঘ্য অবস্থার উৎপত্তি হবে না। নারীর হাত ধ'রে পুরুষ পরম-পুরুষার্থের দিকে অগ্রসর হোক্, পুরুষের হাত ধ'রে নারী পরম নিঃশ্রেয়স লাভ করুক,—এই হবে জগতের অধিকাংশ নর-নারীর লক্ষ্য এবং আদর্শ। সুতরাং নারী এবং পুরুষের বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠতা কতদূর ব্যাপক হবে এবং সেই ঘনিষ্ঠতার কোন্ সময়ে কতখানি সঙ্কোচ-সাধন কত্তে হবে, সেই বিষয়ে জোরসে প্রকাশ্য আন্দোলন না চালিয়ে ভগবচ্চরণাশ্রিত জীবন-যাপনের আবশ্যকতার দিকেই আগে সকলের দৃষ্টি, বুদ্ধি ও প্রয়াসকে আকৃষ্ট করতে হবে। ভগবদ্ভক্ত কর্দ্দম ঋষি কতবার স্ত্রী-সহবাস করেছিলেন, এটা কখনো আলোচনার বিষয় হ'তে পারে না। কিন্তু জগতের দুঃখহারী কপিল ঋষি যে তাঁরই সন্তান, এটাই জগতের পরম লাভ। মানুষের কামাতুর মন ভগবৎ-প্রেমে ব্যাকুল হোক, কাম্য হবে এই। কে স্ত্রী-সঙ্গ করে, আর কে স্ত্রী-সঙ্গ করে না, সেই বিচারে তোমার আমার লাভ কি? "স্ত্রী-সঙ্গীকে বর্জ্জন কর" এই উপদেশ না দিয়ে আমাদের উপদেশ দেওয়া উচিত,—"সংযমীদের সঙ্গ কর, ভগবৎ-প্রেমিকের সঙ্গ কর, সাধু-সজ্জনের সঙ্গ কর।" চাই ভগবৎ প্রেমিক। যিনি প্রেমিক, তাঁর আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা

আপনা থেকেই ক্রমশঃ দূর হ'য়ে যায়, বিনা চেষ্টায়ই তিনি শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ হ'য়ে যান।

ইতি-বাচক উপদেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্নেহ-কোমল-চিত্ত, ক্ষমা-সুন্দর-দৃষ্টি, অদোষদর্শী বিচার এবং মধুস্রাবী বাক্য নিয়ে উপদেষ্টাদের উপদেশ বর্ষণ প্রয়োজন। সেই উপদেশ হবে ইতি-বাচক, নেতিবাচক নয়। "নেই, নেই, নেই, তোমার কোনও উপায় নেই,"—এভাবের উপদেশের চেয়ে "আছে, আছে, আছে, তোমার উদ্ধারের সুনিশ্চিত পথ আছে"—এইভাবের উপদেশই উপদিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলদায়ক হবে। নেতিবাচক উপদেশে অনাহূতভাবে এবং নিষ্প্রয়োজনে দুনিয়ার যত পরনিন্দা এসে যায়। ইতি-বাচক উপদেশে আসে শুধু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুনির্ম্মল ছবি, নিরাশাহত-চিত্তে নবীন-আশার মলয়-হিল্লোল, নবোৎসাহের নবারুণ-সম্পাত।

বাগেরহাট
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪০

শ্রীশ্রীবাবামণি খোদাই করার যন্ত্রপাতি লইয়া একটা কাঠের ব্লক ঝড়ের বেগে কাটিয়া যাইতেছেন। অতি দ্রুত ব্লকখানা শেষ হইয়া যাওয়া প্রয়োজন বলিয়া বরিশাল হইতে ইহার খোদাই-কর্ম্ম শুরু হইয়াছে এবং দিনমানে যতটুকু সময় পাওয়া যাইতেছে, শ্রীশ্রীবাবামণি ফাঁকে ফাঁকে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

সংসারী জীবের কর্ত্তব্য

এই সময়ে বাগেরহাটের সাব-ডিপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত রাধিকা বসাক মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনে আগমন করিলেন। নানা সৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ব্লকখানা হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই এবং ব্লক কাটার কাজ অবিরাম চালাইয়া যাইতে যাইতেই শ্রীশ্রীবাবামণি কথা কহিয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রশ্ন হইল,—সংসারী জীবের কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনুক্ষণ মনকে নিত্যরস-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীভগবানের মহিমা-চিন্তনে নিয়োজিত রেখে পার্থিব সকল কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন ক'রে যাওয়া।

বহু কর্ত্তব্যে কি করণীয়

প্রশ্ন হইল,—পার্থিব কর্ত্তব্যের ঝঞ্ঝাট যদি অত্যধিক হয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহস্র কর্ত্তব্যের মধ্যে বেছে নিয়ে কতকগুলির সম্পর্কে সকল দায়িত্ব ত্যাগ করা এবং অবশিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি পালন ক'রেই ভগবৎ-স্মরণ করা।

পার্থিব কর্ত্তব্য ও ভগবৎ-স্মরণ

প্রশ্ন হইল,—পার্থিব কর্ত্তব্যগুলি যদি ভগবৎ-স্মরণের পরিপন্থী হয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তৎকালে অনুক্ষণ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করা যেন এই কর্ত্তব্য-সঙ্কট থেকে তিনি উদ্ধারের কোনও

পথ বের ক'রে দেন এবং অবসর মাত্রেই আকুল প্রাণে তাঁর নাম করা।

নামে রুচি না আসিলে কর্ত্তব্য

প্রশ্ন হইল,—নামে যদি রুচি না আসে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রুগ্ন ব্যক্তির কি কখনও ঔষধে রুচি আসে ? তৎস্থলে জোর ক'রে ঔষধ সেবন কত্তে হয়। নামে রুচি না আসে, ত' তাতে কি ? জোর ক'রে নাম জপ ক'রে যেতে হবে।

ভক্তিহীনের নাম-জপ

প্রশ্ন হইল,—ভক্তিহীনের কি নাম-জপে কোনও ফল হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই হয়। নাম-জপ কত্তে কত্তেই ভক্তিহীনের ভক্তি আসে, রুচিহীনের রুচি আসে, অবিবেকীর বিবেক জাগে, তন্দ্রালসের তন্দ্রা কাটে, মোহাবিষ্টের মোহ যায়, কামুকের কাম নাশ পায়, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস আসে, জড়বুদ্ধির জড়তা কাটে, অন্ধের নয়নে দৃষ্টি ফোটে। নাম-জপ কোনো অবস্থাতেই নিষ্ফল হয় না।

মলমূত্র ত্যাগকালে নামজপ

প্রশ্ন হইল,—মলমূত্র ত্যাগকালেও কি নাম-জপ করা যায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চিত। জীবনের কোনও অবস্থাতেই তাঁর নাম-জপ অবৈধ নয়। তবে দিবসের নির্দ্ধারিত সময়ে যে নাম-জপকে অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার করা হয়েছে,

সেই সময়ে জপকার্য্য যতটা সম্ভব শুচিভাবে, স্নাত অবস্থায়, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান ক'রে, বৃথা-লোক-সঙ্গ বর্জ্জন ক'রে, নিরালা ও নীরবে করা সঙ্গত।

অশান্তির কারণ কি

প্রশ্ন হইল,—সাংসারিক নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ে মনে অশান্তি আসে কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে অবিশ্বাসই সকল অশান্তির কারণ। তাঁর চরণে যার অটল বিশ্বাস, তার প্রাণে কোনো ঘটনা-বিপর্য্যয়েই অশান্তি আসতে পারে না।

বিশ্বাস আসে কিরূপে

প্রশ্ন হইল,—ভগবানে বিশ্বাস আসে কিরূপে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পূর্ণবিশ্বাসী মহদ্ব্যক্তির পবিত্র সংসর্গে,—বিশ্বাসী সাধুগণের চরিত্র-আলোচনায়,—যে পবিত্র জীবনযাপনের ফলে তাঁরা বিশ্বাসী, সেই জীবনের অনুসরণ করার চেষ্টায়—এবং সর্ব্বশেষে ভগবানের পবিত্র নাম অহর্নিশ স্মরণের দ্বারা।

সাবডিপুটী কালেক্টার মহাশয় পরিতৃপ্ত চিত্তে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

নামজপ ও বিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি ব্লক কাটিয়াই চলিয়াছেন। শহরের জনৈক বিশিষ্ট উকিল প্রশ্ন করিলেন,—অবিরাম ভগবানের নাম-জপ

কত্তে কত্তে তারই ফলে যদি ভগবদ্বিশ্বাস আসে, তা'হলে ত' বুঝতে হবে যে, আমার auto-suggestion-এরই এটা ফল। এক একবার নাম-জপ কচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি যে, আমার বিশ্বাস আসুক, বিশ্বাস ত' তারই ফলে এল বলতে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, তা' নয়। বিশ্বাস কোনো manufacture (তৈরী) করা জিনিষ নয়। বিশ্বাস জীবের সহজাত। জন্মমাত্রই জীব ভগবানে বিশ্বাস নিয়ে এসেছে। ভগবানের নাম-জপে তার চতুর্দ্দিকের সহস্র সংস্কারের বাঁধন কেটে যেতে থাকে এবং তখনই সে নিজের ভিতরের অন্তর্নিহিত সহজ বিশ্বাসকে স্বচ্ছন্দ-দৃষ্টিতে দেখতে পায়। নিজের ভিতরে যে বস্তু স্বতঃই বিরাজমান রয়েছে, তা'কে সৃষ্টি করার জন্য কোনও প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। তা'কে দেখার জন্য, স্পষ্টতর ক'রে, স্ফুটতর ভাবে দেখার জন্যই নাম-জপ। নামজপ বিশ্বাসের জনয়িতা নয়, সহজ বিশ্বাসের চতুর্দ্দিক ঢেকে সহস্র প্রকারের যে সব কৃত্রিম সংস্কারের আবরণ রয়েছে, নামজপ তা'রই উন্মোচক মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন নাম-জপের ফল

প্রশ্ন হইল,—ভিন্ন ভিন্ন নামজপের কি একই ফল?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, একই ফল।

ওঙ্কারের প্রাধান্য কেন

প্রশ্ন হইল,—তবে ওঙ্কারের এত প্রাধান্য কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কারের প্রাধান্য এইজন্য যে, সকল মন্ত্রের রূপ হচ্ছেন ওঙ্কার। যত মন্ত্রই জপুন, প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ পরিণতি হবে গিয়ে প্রণবে। এইজন্যই প্রণবের এত প্রাধান্য।

অন্যান্য মন্ত্রজপ ও প্রণবজপে পার্থক্য

প্রশ্ন হইল,—তা' হ'লে অন্য কোনো মন্ত্র-জপে সময় ক্ষেপণ না ক'রে শুধু প্রণব জপ্‌লেই ত' হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চিতই তা' পারে।

প্রশ্ন হইল,—তবে এত শত শত মন্ত্র আর শত শত বীজ প্রচলিত হ'ল কেন ? সব মন্ত্রগুলিকে summarily dismiss (এক কথায় বরখাস্ত) ক'রে একমাত্র ওঙ্কারকেই কেন সর্ব্বজনীন ভাবে গ্রহণ করা হ'ল না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার কারণ, ভারতের মাটির পরমত-সহিষ্ণুতা। যিনি যেখানে যেভাবে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার পেয়েছেন, তার প্রতিই আচার্য্যদের প্রাণের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের ক্ষমতা। আর এক কারণ, প্রণব সাধকদের সর্ব্বমত ও সর্ব্বপথের প্রতি স্বানুভূতিলব্ধ সমদৃষ্টি। আজকাল সাধকের অভাব, তাই বক্তৃতা দিয়ে philosophic tenets বুঝাতে হয় যে, একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। কিন্তু প্রণব-সাধকেরা কারো বক্তৃতা না শুনেই নিজ নিজ উপলব্ধির কষ্টি-পাথরে যাচাই ক'রে স্পষ্ট দেখেছেন যে, দার্শনিক মতবাদ যারই যত বিভিন্ন হোক্, যে কোনো একটা নাম যদি আপনি অবিরাম অবিশ্রাম নিরন্তর জ'পে যান, তা' হ'লে পরিশেষে ওঙ্কার আপনার অনুভূতিগম্য হবেন, হ্রীং ক্লী

শ্রীং ঐং হুং রাং প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক নাম সেই প্রণব-সমুদ্রের তরঙ্গের ভিতরে ডুবে যাবে।

নামে নিষ্ঠা ও দার্শনিক মতবাদে নিষ্ঠা

প্রশ্ন হইল,—প্রণবেতর অন্যান্য মন্ত্রের জপকারীরা ত' শেষ পর্য্যন্ত ওঙ্কারের জয় প্রচার ক'রে যান নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার কারণ হচ্ছে, নামের নিষ্ঠার চেয়ে নিজ নিজ বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের প্রতি নিষ্ঠার আধিক্য। যারা নামে ডুবেছেন, তাঁরা নামের আস্বাদনে এত বৈচিত্র্য দেখেছেন যে, দার্শনিক মত-বিস্তারের অবসর পান নি। কিন্তু সেরূপ নামানন্দী সাধক জগতে কয়েক কোটির মধ্যে দুই একটীই হন।

নামই মূল-সূত্র, দর্শন তার ব্যাখ্যা মাত্র

প্রশ্ন হইল,—দার্শনিক মতবাদ কি প্রয়োজনীয় নয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রয়োজনীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সে প্রয়োজন প্রথমতঃ নামে নিষ্ঠা আনার জন্য। নির্দ্দিষ্ট একটী নামে নিষ্ঠা আনান এবং তৎপরে নিষ্ঠার পরিপোষণকে উদ্দেশ্য ক'রে এ' দেশের এক একটা দর্শন-পন্থার উৎপত্তি ব'লে মনে ক'রে নিলে মোটামুটি ভুল হয় না। দার্শনিক বিচার এনে দিল রুচি, এনে দিল প্রবৃত্তি, তারপরে সেই মতের পরিপোষক নামটী নিয়ে আপনি মৌজে ডুবে গেলেন। সব সময় ডুবে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং নামের রুচিকে পরিপোষণের জন্য পুনঃ দার্শনিক আলোচনার প্রবৃত্তি হ'ল। নামটী হচ্ছে Text বা

মূলসূত্র, দার্শনিক মতবাদ হচ্ছে তার পরিপোষক ব্যাখ্যা মাত্র। ভারতে এক একটা নাম এক একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, দার্শনিক মতবাদ সেই বিপ্লবের ব্যাখ্যা মাত্র।

ব্যাপক প্রণব-দীক্ষার ফল

প্রশ্ন হইল,—নির্ব্বিচারে যদি দীক্ষাদাতারা একযোগে সমগ্র দেশে আপামর জনসাধারণকে ওঙ্কার-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে যেতে থাকেন, তবে তার ফলে কি দেশব্যাপী একটা সর্ব্ব-সামান্য দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হ'য়ে যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়। তবে দীক্ষা-প্রাপ্তেরা যাতে নামের সাধন অতি অবশ্যই করেন, তার জন্য বিশেষ যত্ন রাখতে হবে। অনেকেই মন্ত্র নেয় কিন্তু সাধন করে না, ফলে কতকগুলি মনগড়া কথাকে নিজ নিজ উপলব্ধি-লব্ধ সত্য ব'লে জ্ঞান ক'রে সালঙ্কারে তাই প্রচার ক'রে বেড়ায়। এরই ফলে সমমন্ত্রীদের ভিতরেও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু সত্যি সত্যি যাঁরা সাধন করেন, তাঁদের উপলব্ধির ভিতরে বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়ে নানা পার্থক্য প্রতিভাত হ'লেও মূলে কোনো ভুল থাকে না, তাই বাস্তবপক্ষে মতবাদের মধ্যে মিলনটা সহজে ধরা পড়ে।

প্রণব মহামিলনের মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—সমগ্র ভারতকে মতামতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থেকে বাঁচিয়ে এক অনাদি অনন্ত অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের মহিমাময় উপাসনায় সম্মিলিত কর্ব্বার মহামন্ত্র

হচ্ছেন ওঙ্কার। সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন কোটি কোটি লোক এক প্রণব-মন্ত্রের অনুপ্রেরণায় সকল বিভেদ, বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ ভুলে এক হবে, অখণ্ড হবে।

আহারের সময় হইয়া যাওয়াতে শ্রীশ্রীবাবামণি ব্লক কাটা বন্ধ করিলেন। সমাগত ভদ্রলোকেরা প্রণামান্তে প্রস্থান করিলেন।

বাগেরহাট

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪০

স্থানীয় দুইজন বিশিষ্ট উকিল দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণদর্শনে আসিয়াছেন। অদ্য অপরাহ্নে স্থানীয় টাউনহলে বক্তৃতা দিবার কালে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইলে জনসাধারণের বিশেষ হিত হইবে, সেই বিষয়ে তাঁহারা নিজেদের মনের ধারণা নিবেদন করিলেন।

নিজেকে বোঝাই সকলকে বোঝা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের একটি মানুষের যা' সমস্যা, সকল মানবের তাই সমস্যা। কতকগুলি সংস্কারগত পার্থক্য বাদ দিলে সকল মানুষই এক, সকল মানুষেরই ব্যাধি এক, সকল মানুষেরই চিকিৎসা এক, সকল মানুষেরই উৎপত্তি এক, সকল মানুষেরই পরিণতি এক। সুতরাং একটি মানুষকে যে বুঝেছে, সকল মানুষকেই সে বুঝেছে। সেই একটী মানুষ হচ্ছে, আমার পক্ষে আমি, আপনার পক্ষে আপনি, এঁর পক্ষে ইনি। নিজেকে বোঝাই জগতের সকল মানুষকে বোঝা, নিজেকে

রোগ-মুক্ত করাই জগতের সকলকে রোগ-মুক্ত করা।

অপরাহ্নে টাউনহলে যে বক্তৃতা হইল, তাহার কোনও স্মারক-লেখা ভ্রমক্রমে কেহ সংগ্রহ করেন নাই। এই ত্রুটিটা আমাদের অনেক স্থলেই হইয়াছে। তখন ত' কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই যে, যেখানে যাহা শুনিলাম, তাহা সঙ্গে সঙ্গে টুকিয়া রাখিলে পরবর্ত্তী-কালে উহা বিশেষ জনহিতে আসিবে। হলে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কলেজের অধ্যাপক ও স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে বোধ হয় দুই-এক ব্যক্তিও সভায় অনুপস্থিত ছিলেন না। হলের বাহিরেও বিরাট জনতা নিঃস্তব্ধভাবে উৎকর্ণ হইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি নদীতীরে আসিয়া একান্তে বসিলেন।

বাগের হাট,
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪০

অপরাহ্নে অদ্যও টাউনহলে বক্তৃতা হইল। পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও অদ্য শ্রোতাদের আগ্রহ অধিক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার শ্রীযুক্ত শুকলাল নাগ বলিলেন,—"স্বামীজীকে speaker (বক্তা) বলিলে অপমান করা হয়, he is an orator, (তিনি বাগ্মী)"।

বক্তৃতা শেষ হইতেই বাগেরহাট কলেজের ছাত্রগণ শ্রীশ্রীবাবামণিকে ধরিলেন যে, কলেজে একটী বক্তৃতা দিতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, যে, কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ আহ্বান করিলে তিনি যাইবেন।

ধ্যানের দেবতা

ইতিমধ্যে কারাপাড়া হাইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আসিয়া ধরিলেন যে, কল্যই কারাপাড়া যাইয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ-ভাষণ শুনাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি আনন্দ সহকারে বলিলেন,—যুবকেরাই ত' আমার ধ্যানের দেবতা। তাদের সেবায় আমার অসম্মতির কোনো কারণ নেই। আজকের যুবক কালকের পিতা, নেতা ও অভিভাবক। বর্ত্তমানের যুবকদের সেবা কর্ম্মে অনাগত ভবিষ্যৎকে সেবা করা হবে।

রাত্রে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী রায়ের গৃহে সমাগত হইলেন। নানা জনে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি প্রসন্ন মনে উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

ব্লককাটা ও যোগ

একজন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ' বেলা আপনার খোদাই করার কাঠখানা কোথায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ব্লকের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এল, তা'র উপর অল্পালোকে এ' কাজ ভাল হয় না। সর্ব্বোপরি কথা এই যে, আপনাদের মত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের বারবার কতবার অনাদর কর্ব্ব ?

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্লকখানাকেও একটী সজীব বস্তু জেনে সেবা-বুদ্ধি নিয়ে খোদাই-কাজ করা একটা যোগ-বিশেষ।

মৃত্তিকাকে সজীব বিগ্রহ জেনে সেবা-বুদ্ধি নিয়ে কোদালী চালান একটা যোগ-বিশেষ। জড় হোক্ আর সচেতন হোক্ যে বস্তুতে যখন আমার হাত, চোখ বা মন পড়ে, তখনি তার মধ্যে চৈতন্যময় সত্তার উপস্থিতিকে কল্পনা ক'রে তার প্রতি সেবা-বুদ্ধি আরোপ করা একটা অতি আনন্দদায়ক অভ্যাস। এইজন্যই গত দুই দিন আপনাদের প্রতি আমার একটু অমনোযোগ ছিল।

ধর্ম্মে-কর্ম্মে স্থায়ী অভ্যুদয়ের উপায়

অতঃপর নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হইতে লাগিল। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—জাতি যাতে ধর্ম্মে-কর্ম্মে স্থায়ী উন্নতি লাভ কত্তে পারে, তার জন্য কি উপায় গ্রহণীয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরোক্ষ উপায় দেশব্যাপী ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে আপামর জন-সাধারণের মনে ধর্ম্মভাব ও কর্ম্মোন্মাদনা প্রসারিত ক'রে দেওয়া। এরূপ আন্দোলনের ফলে সামাজিক জীবনধারার উপরে বিশেষ প্রভাব প্রযুক্ত হবে এবং জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ, সার্থকতা ও যাপন-প্রণালী-সম্পর্কে সমাজভুক্ত মানব-গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটবে। কিন্তু ধর্ম্ম এবং কর্ম্মকে নিজ নিজ জীবনের, জাগ্রত, জীবন্ত ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত করার জন্য যে সব বলীয়ান্ পুরুষ ও বলীয়সী নারী প্রাণান্ত যত্ন নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন সৃষ্টি দ্বারা এমন মানব-জাতির আবির্ভাব অতি সহজে সম্ভব করা যেতে পারে, যারা স্বভাব-ধর্ম্মেই ধর্ম্মিষ্ঠ, পিতৃবীর্য্য ও

মাতৃরজের প্রভাবেই কর্ম্মিষ্ঠ। এই শেষোক্ত পন্থাই স্থায়ী পন্থা এবং এই পন্থার অনুবর্ত্তনের দিকে দেশ কতটা তৈরী হচ্ছে, তারই উপরে নির্ভর কর্ব্বে যে, দেশের ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে চলেছে।

যোগ্যের সহিত যোগ্যার বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় জ্ঞানীরাজ, স্বামী বিবেকানন্দের মত তেজস্বী কর্ম্মযোগী মহাপুরুষ, বিবাহিত জীবন গ্রহণ না ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাওয়ায় দেশের যে অপার ক্ষতি হ'য়েছে,এই তর্ক জুড়ে শোরগোল কত্তে এই সেদিনও আমরা এক শ্রেণীর সমাজ-সংস্কারকদের দেখেছি। তাঁদের যুক্তি এই যে, বিবেকানন্দের ঘরে যদি পাঁচটা ছেলে জন্মাত, সেগুলিও হয়ত তাঁরই মত দিগ্‌ধর পুরুষ হ'ত এবং তাদের দ্বারাও সমাজের হিত হ'তে পাত্ত। যুক্তিটা যেন মেনেই নিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এইসব যুক্তিদাতারা নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদের মানুষ করার জন্য কি কিছু ক'রেছেন ? কে একজন বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নিজের ঔরসে সন্তান জন্মালেন না ব'লে এঁদের এত মাথাব্যথা, কিন্তু নিজ নিজ পুত্রকন্যাগুলি একেবারে নেংটী ইঁদুরের বাচ্চাই র'য়ে গেল, একবারও ঐরাবত হবার চেষ্টা করল না, এই কথা ব'লে একবারও এঁদের আফশোষ কত্তে দেখা যায় নি। এই হচ্ছে আমাদের দেশের ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন কত্তে হবে। প্রত্যেকটী বালক ও বালিকাকে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক

বল অর্জ্জনের জন্য প্রোৎসাহিত কর্ত্তে হবে এবং যৌবন-প্রাপ্তদের বিবাহকালে ধার্ম্মিক ও কর্ম্মিক সামর্থ্যের দিক বিচার ক'রে যোগ্যের সাথে যোগ্যার মিলন ঘটাতে হবে, এটি আমাদের এক অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই দায়িত্ব এড়িয়ে আমরা চল্‌তে পারি না। এই দায়িত্বকে অস্বীকার ক'রে দেশ ও সমাজের যত প্রকার উন্নতিই আমরা কর্‌বার চেষ্টা করি না কেন, তার ফল কখনো স্থায়ী হ'তে পারে না।

বর কন্যাদের মিলনে সমাজপতিদের দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হ'ল কেন? উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারে সমাজ যাতে আচ্ছন্ন হ'য়ে না যায়, তারই জন্য বিবাহরূপ একটি বদ্ধমূল প্রথার প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়েছিল। সুতরাং এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে যেরূপ বিবাহে পতি ও পত্নীর এক-পরায়ণতা অক্ষুণ্ণ থাকবে, সেইরূপ বিবাহ সংগঠন কর্ত্তে পারলেই সম্যাজপতিদের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল। অর্থাৎ বর বা ক'নের কেউ একজন রুগ্ন হোক বা দুর্ব্বল হোক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত হোক কিম্বা চপল-স্বভাব হোক, তাতে সমাজপতিদের কিছু যায় আসে না, বৈবাহিক মিলনের ফলে বর বা ক'নের মনে থেকে যৌন বহুপরায়ণতা দূর হ'য়ে গেলেই সকল দায়িত্ব চুকে গেল। মনের যৌন বহুমুখতা দূর হ'য়ে যাওয়াটা একটা মস্ত কথা সন্দেহ নেই, সুতরাং এত বড় একটা লাভকে আমি ছোট ক'রে দেখতে চাই না। কিন্তু প্রকৃত কর্ত্তব্য এখানেই শেষ হয় না; আরো কর্ত্তব্য আছে। হাজার-করা এক আধটী বাদে সকল ক্ষেত্রেই বিবাহের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে সন্তানের

আবির্ভাব। সুতরাং এই সন্তানটীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলও যাতে বৈবাহিক নির্ব্বাচনের দ্বারাই সুস্থিররূপে নির্দ্ধারিত হ'তে পারে, তার সুব্যবস্থার জন্যও সমাজপতিরাই দায়ী।

জন্মতত্ত্বের জ্ঞানকে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিরূপ বরের সাথে কিরূপ কন্যার মিলনে যে কিরূপ বংশধরের আবির্ভাব হবে, এটা একটা বিচিত্র বিজ্ঞান। পশু-পক্ষী দিয়ে মানুষ এই রহস্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা ক'রেছেন। তার ফলে জন্মতত্ত্বের কয়েকটা মূলসূত্রই ধরা পড়েছে। একজন বুদ্ধিমান্ ও আর একজন বলশালীর মিলনে যুগপৎ বুদ্ধিমান্ ও বলশালী বংশধরের আবির্ভাব সম্ভব ব'লে জানা গিয়েছে। একজন রুগ্ন ও একজন স্বাস্থ্যবানের মিলনে না-রুগ্ন না-স্বাস্থ্যবান্ অথবা স্বাস্থ্যবান্ বংশধরের আবির্ভাব সম্ভব ব'লে জানা গিয়েছে। দুইজন স্বাস্থ্যবানের মিলনে অধিকাংশ বংশধর স্বাস্থ্যবান্ হয়, তাও জানা গিয়েছে। জীবের জন্মতত্ত্বের এই জ্ঞানকে মনুষ্য-সমাজের স্থায়ী উন্নতি-বিধানের জন্য প্রয়োগ করাই হচ্ছে আমাদের সকলের কর্ত্তব্য।

জাতিভেদ ও যোগ্য-যোগ্যার মিলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু দেশে জাতিভেদ আছে। এক এক জাতির ভিতর আবার দুই দশ বা পঞ্চাশটী গণ্ডী আছে। গণ্ডী ভেদ ক'রে বৈবাহিক আদান-প্রদানের প্রথা নেই। যারা গণ্ডী উল্লঙ্ঘনে অসম্মত, তাদের সংখ্যাই বেশী। এই অবস্থায় যোগ্যের সহিত যোগ্যার মিলন একটা কম সমস্যা নয়। কারণ,

সমান যোগ্য দুইটী ব্যক্তি একই গণ্ডীর ভিতরে সকল সময়ে নাও মিলতে পারে। গণ্ডীচ্ছেদের বা জাতি-ভেদের মূলোৎপাটনের চেষ্টা যে সব উৎসাহী সম্প্রদায় করেছেন, তাঁরা নিজেরাই আবার একটী আলাদা গণ্ডীতে পরিণত হ'য়ে গিয়েছেন। আর তাঁরা জাতিভেদই ভেঙ্গেছেন, কিন্তু যোগ্যের সাথে যোগ্যারই মিলন হবে, একটী যোগ্যকেও অযোগ্যের সাথে মিলতে দেওয়া হবে না, একজন যেখানে যোগ্য, অন্য অযোগ্যকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না, যে-কোনও প্রকারে হোক্ যোগ্যের বংশধারাবর্দ্ধনে শুধু যোগ্যতরেরই সহযোগ নেওয়া হবে,—এই নিয়ম তাঁরা প্রতিষ্ঠা কত্তে পারেন নি।

স্ত্রী-স্বাধীন সমাজে যোগ্য-যোগ্যার মিলন-সমস্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ-ধ্বংসকারীরা যেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা-আন্দোলনের উপরে জোর দিয়েছেন, সেখানে যোগ্য-যোগ্যার মিলন সম্পর্কে সমাজপতিদের নির্দ্দেশ চালাবার ক্ষমতা আপনিই খর্ব্ব হ'য়ে গেছে। সুতরাং এখানেও একটা সমস্যা র'য়ে গেল। যাঁরা স্বাধীন, তাঁরা স্বেচ্ছায় যদি মেনে নেন যে, যোগ্য-যোগ্যার মিলন ছাড়া তাঁরা প্রাণের প্রবল আকর্ষণকেও আমল দেবেন না, তবে অবশ্য সমাধান হ'য়ে যায়। কিন্তু যৌবন কি কখনও যুক্তি মানে? যার গর্ভে সন্তান জন্মালে নিশ্চিত শিশুটা মনোবিকার-গ্রস্ত হবে, যৌবনের আকর্ষণ একজন বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ যুবককে তারই সাথে হয়ত বেঁধে দেবে। যার

ঔরসকে ধারণ কর্লে নিশ্চিত শিশুটা চিররুগ্ন দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হবে, একজন তেজস্বিনী, বলীয়সী, মেধাবিনী যুবতী তারই কাছে হয়ত আত্মসমর্পণ ক'রে ফেলে। মনোধর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম ক'রে কর্ত্তব্যকে প্রধান ব'লে মেনে নেওয়া অধিকাংশ যুবক বা যুবতীর পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। স্ত্রী-স্বাধীন সমাজের যৌন-নির্ব্বাচন সমাজপতিদের ভ্রূকুটির তোয়াক্কা রাখে না।

দেব-জাতি সৃষ্টির জন্য ব্যাপক আন্দোলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চল্লিশ কোটি লোকের প্রত্যেকের মনে যদি এই আকাঙ্ক্ষা জাগরিত ক'রে দেওয়া যায় যে, আমরা মানব-জাতির মধ্যে এক দেব-মানব সমাজ সৃষ্টি করাকে সম্ভব ব'লে প্রমাণিত করব, দেবোচিত ধৈর্য্য, বল, সাহস, সহিষ্ণুতা, চরিত্র, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও গুণকে বিকশিত ক'রে এক সর্ব্ব-জীব-শ্রেষ্ঠের গোষ্ঠী-পত্তন কর্ব্ব, তাহ'লে কিছুই আর অসম্ভব থাকে না। তখন দেশাচার, কুলাচার, লোকাচারকে লঙ্ঘন ক'রে যোগ্যের জন্য যোগ্যা সপ্তগিরি, শতনদী, অতিক্রম ক'রে এসে উপস্থিত হবেন।

বৈবাহিক নির্ব্বাচনে ধারাবাহিক বিচক্ষণতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিকৃষ্টরা যদি সঙ্কল্প করে যে, তারা উৎকৃষ্টদের পারস্পরিক মিলনকে সুসম্ভব করার জন্য নিজেদের স্বার্থ এবং দাবীকে পরিহার কর্ব্বে, উৎকৃষ্টরা যদি সঙ্কল্প করে যে, উৎকৃষ্টের সাথেই নিজেদের মিলনকে সম্ভব করার জন্য

প্রয়োজন-স্থলে হৃদয়ের টানকে অনায়াসে তারা উপেক্ষা করবে, তাহ'লেও একটা বিপুল আনুকূল্য সৃষ্ট হ'ল বলতে হবে। কয়েক শতাব্দী এইভাবে চলার পরে হঠাৎ একদিন দেখা যাবে, উৎকৃষ্টেরা এত উৎকৃষ্ট হয়েছে যে, তাদের ঘরের ছেলেরা উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-নির্ব্বিশেষে যে কোনও মেয়েদের বিবাহ কর্ল্লেও বংশধরেরা আর সহজে নিকৃষ্ট হ'য়ে যেতে পাচ্ছে না। অতীত ভারতের বিবাহ প্রথার এই ছিল মূল। ব্রাহ্মণ ব'লে নিজেকে যিনি পরিচিত কর্ত্তেন, তিনি প্রকৃতই উৎকৃষ্ট ছিলেন। তিনি যখন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কন্যার পাণিপীড়ন কত্তেন, তখন অধিকাংশ সময়েই সেই সন্তান পূর্ণ ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও সম্ভাবনা নিয়েই ভূমিষ্ট হ'ত। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব অনার্য্য কন্যা শুকীর গর্ভে জন্মেও ত' অনার্য্য-স্বভাব পাননি, পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণের স্বভাব। পরাশরের পুত্র ব্যাসদেব ধীবর-কন্যার গর্ভে জন্মেও ধীবর-স্বভাব পাননি, পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণের স্বভাব। এই পরাশর নিজে আবার শ্বপচের কন্যার গর্ভে জন্মেছিলেন কিন্তু তিনি শ্বপচের স্বভাব পাননি, পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণের স্বভাব। কণাদ ঋষি অনার্য্য-কন্যা উলকার গর্ভে জন্মেও ব্রাহ্মণের স্বভাবই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বংশানুক্রমিক শুদ্ধির এমন একটা অত্যুচ্চ স্তর আছে, যেখানে পৌঁছুবার পরে সেই বংশের পুরুষেরা যে-কোনও বংশের কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে ও অত্যুৎকৃষ্ট সন্তানদের জন্মদান কর্ত্তে পারেন। কিন্তু এই অবস্থাটী আনার জন্যই গোড়াতে বৈবাহিক নির্ব্বাচনে ধারাবাহিক বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

স্ত্রী-জাতি প্রসবের যন্ত্র-মাত্রই নহেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য ব্যাসদেব যে অনার্য্য কন্যা শুকী গর্ভে শুকদেবকে জন্ম দিয়েছিলেন, তার পশ্চাতেও শুকীর নিজস্ব কতকগুলি গুণ-সমাবেশ নিশ্চিতই ছিল। ধীবর-কন্যা সত্যবতীর ভিতরেও এমন কতকগুলি যোগ্যতা বা সদ্‌গুণ ছিল, যার দরুণ পরাশর তাঁকে ব্যাসের মাতা হবার যোগ্যা জ্ঞান ক'রেছিলেন। যে শ্বপচ-কন্যার গর্ভে পরাশরের জন্ম, যে অনার্য্য-কন্যার গর্ভে কণাদের জন্ম, তারা শুধু এক একটা প্রসব করার যন্ত্ররূপেই নিজ নিজ স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি পরন্তু ত্রিলোকোদ্ধারক্ষম সন্তানের মা হবার যোগ্যতাও তাদের ভিতরে নিশ্চিত কোনো অংশে ছিল। এসব জ্ঞানী ও যোগী পুরুষদের পক্ষে বিবাহার্থ ব্রাহ্মণ-কন্যা অসুলভা হবার কোন কারণ ছিল না। একমাত্র কাম-রিপুর দুর্নিবার তাড়নাতেই এরা কৈবর্ত, চণ্ডাল বা যে কোনও জাতির মেয়ে হাতের কাছে পেয়েছেন, অমনি তাদের আঁচল ধরে টান দিয়েছেন, এরূপ মনে করাও সঙ্গত হবে না। কারণ, এঁরা যদি কামোন্মত্তের লাম্পট্যবশতই নীচজাতীয়া স্ত্রীদের সংসর্গ ক'রে থাকেন, তবে ঐ একটী শুকী নিয়েই ব্যাসদেব তুষ্ট থাক্‌তেন না, পরাশর আরো চারটী ধীবর-কন্যাকে নিশ্চয়ই খুঁজতেন। শাস্ত্রে সকলেরই ভালোমন্দ সব আচরণ অকপটে বলা হয়েছে। সুতরাং ব্যাস বা পরাশরের চরিত্রদোষ থাক্‌লে সে কথা গোপন রাখবার প্রয়োজন শাস্ত্রকারের নেই। তাই, একথাই মান্‌তে হবে যে, স্ত্রী-জাতি

শুধুই প্রসবের যন্ত্র নন, শুধুই সন্তান-ধারণের জন্মপেটিকা নন। নীচজাতীয়া নির্দ্দিষ্ট রমণীতে মহৎ সন্তানকে গর্ভে ধারণের বিশেষ কতকগুলি যোগ্যতা দেখেই ব্রাহ্মণ-কন্যাদেরও অনাদর ক'রে এরা অভিলষিত আধারে পুত্রোৎপাদন করেছেন। অর্থাৎ শুকী, সত্যবতী, ওলকা প্রভৃতিও নিজ নিজ বিশিষ্ট যোগ্যতার দরুণই লোকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণের মা হ'তে পেরেছিলেন।

কারাপাড়া, খুলনা
২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪০

কারাপাড়া হাইস্কুলে পূর্ণ তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা হইল। সংযম, সন্নীতি, ব্রহ্মচর্য্য, যৌগিক আসন-মুদ্রা প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি ভগবদ্বিশ্বাস সম্পর্কে বলিতে লাগিলেন।

বিশ্বাস তোমার নিজস্ব স্বভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাস তোমার সহজাত সংস্কার। বাইরের বিরুদ্ধ মতবাদে তোমার সহজাত সংস্কার যখন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন তুমি অনুমান ক'রে থাক যে, তুমি নাস্তিক। অথচ নাস্তিক হবার ক্ষমতা কিন্তু তোমার সত্য-সত্যই নেই। কারণ, কখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি নাস্তিক নও। মঙ্গলময় পরমেশ্বরে প্রেমময় ভাবযুক্ত মধুর বিশ্বাস তোমার অন্তরের অন্তরে এমনি ভাবে দৃঢ়নিবদ্ধ যে, বাইরের ঘন-সন্নিবিষ্ট যুক্তিজাল কখনো কখনো তোমার ভিতরের সেই দেদীপ্যমান সত্যকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করলেও পরিণামে পূর্ণ সাফল্য কখনই অর্জ্জন

কত্তে পারে না। বিশ্বাস তোমার নিজস্ব স্বভাব, বিশ্বাস তোমার ব্যক্তিত্বের মূল উৎস।

জোর করিয়া বিশ্বাস উৎপাদন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জোর ক'রে কেউ কাউকে বিশ্বাসী করাতে পারে না। বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বতঃসৃষ্ট জিনিষ। বিশ্বাস করাবার জন্য যখন জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন হয়, মিথ্যা যুক্তি, কুযুক্তি বা অসত্যের অবতারণার প্রয়োজন হয়, তখন বুঝতে হবে, এর পরিণাম আনন্দময় ধর্ম্মজীবন নয়, এর পরিণাম শয়তানের বীভৎস লীলা। আর জোর ক'রে কারো উপরে বিশ্বাস চাপাতে গেলে সে হয়ত বিশ্বাসী না হ'য়ে অবিশ্বাসীই হ'য়ে উঠবে।

অবিশ্বাসীর সঙ্গ-বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাইরের লোক কে কোথায় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তার তুমি খোঁজ ক'রো না। অবিশ্বাসীদের দলে হয়তো খুব নামজাদা লোকেরাই আছেন। কিন্তু তুমি তাঁদের নাম মুখস্থ কত্তে চেষ্টা ক'রো না। অবিশ্বাসীদের বিষয় চিন্তা ক'রে বা অবিশ্বাসীদের সঙ্গ ক'রে তুমি নিজের ভিতরে আবর্জ্জনা সঞ্চয় ক'রো না। জগতের সেরা নাস্তিকেরাও মরণকালে একবার ভগবানের নাম ক'রে তারপরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাদের চর্চ্চা পরিহার ক'রে নিজ নিজ অন্তরকে অনুসন্ধানে ব্যগ্র হও যে, তোমার হৃদয়-আসনে বিশ্বাসের ভূমি কতটুকু রচিত হয়েছে।

বিশ্বাসীর লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি কতখানি ভগবদ্‌বিশ্বাসী, তার প্রমাণ হবে তোমার মুখের বাক্যে নয়,—তোমার কার্য্যে, তোমার ব্যবহারে। বিশ্বাসীর দৃষ্টি বড় প্রশান্ত, বড় স্নিগ্ধ। বিশ্বাসীর মুখের বাক্য বড় মধুর, বড় কোমল। বিশ্বাসী মাত্রেই প্রেমিক, প্রেমধনে ধনী,—ভগবানের প্রতি প্রেম, জগজ্জনের প্রতি প্রেম।

বিশ্বাসই শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাস মানবের এক সুমহতী শক্তি। বিশ্বাসীর হৃদয় নিত্য-অভয়ের বলে বলীয়ান্। বিশ্বাসীর বাহু কোনো বিঘ্নেই পরাজয় স্বীকার করে না। বিশ্বাসীর নয়ন পরাজয়-সম্ভাবনাকে কল্পনা ক'রে ক'রে কখনো নিষ্প্রভ হয় না। বিশ্বাসের বল তোমার যত অধিক, তোমার জীবনের মহৎ কাজ তত বিরাট। দুর্ভাগ্য দুর্দ্দৈন্যপীড়িত চির-দুর্গত-সামান্য মানব তার বিশ্বাসের বলে জগতে অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়। অবিশ্বাসীর মত দুর্ব্বল কেউ নেই। প্রতি পদে তার পরাজয়, প্রতি পদে তার অসাফল্য। বিশ্বাসী হও, বলীয়ান্ হও।

বিশ্বাসী হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার যুক্তি নয়, তর্ক নয়, তোমার বক্তৃতা নয়, তোমার বাগ্মিতা নয়, তোমার অন্তরের বিশ্বাসই অপরের মনে বিশ্বাসের উদয় ঘটাবে, জগৎকে যদি বিশ্বাসী কত্তে চাও, তবে নিজে বিশ্বাসী হও।

মাগুরা (যশোহর)
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

কার্ত্তিকের ২৭শে তারিখে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বাগেরহাট হইতে মাগুরা আসিয়াছেন এবং আনন্দভবনে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেবা ও সৌজন্যে শ্রীশ্রীবাবামণি বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং সুরেনবাবুর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার গুণে ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে স্থানীয় হাইস্কুলে একদিন এবং আনন্দ-ভবনে দুইদিন বক্তৃতা-কার্য্য সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দৈনিক একশত হইতে দেড়শত ধর্ম্মপিপাসু এবং আত্মগঠনেচ্ছু নরনারী শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়াছেন এবং যিনি যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবামণি তখনই সহাস্য-আননে সেই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া সংশয়-ভঞ্জন করিয়াছেন। ঠিক তারিখ মত সব উপদেশ সঙ্কলিত হয় নাই, এজন্য সকল দিনের সকল উপদেশ একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিবাহান্তে কতকাল সংযম বাঞ্ছনীয়

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বিবাহান্তে কতদিন স্ত্রীর সহিত শারীরিক-সম্পর্ক-বিরহিত থাকা উচিত ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতদিন স্ত্রীর দেহ সন্তান-ধারণের যোগ্য না হয়, তার মন সন্তান-পালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ না হয় এবং তার শিক্ষা-দীক্ষা সন্তানকে মানুষ ক'রে

গড়ে তোলার উপযুক্ত না হয়। বিবাহের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যই থাকা উচিত শক্তিশালী, ধৈর্য্যশালী, সংযমী, কর্ম্মঠ, ন্যায়পরায়ণ, চরিত্রবান্, সততাসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক সন্তানের আবির্ভাবকে সম্ভব করা। এই মূল কথা মনে রেখে চলবে, তা হ'লেই কখন কি করা উচিত আর কখন কি করা উচিত নয়, তা' নিজের বিচার দিয়েই ধ'রে নিতে পারবে।

কখন স্বামী স্ত্রী-ত্যাগের অধিকারী

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কোন্ কোন্ অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বলতে গেলে কোনো অবস্থাতেই না। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, স্বামী সন্তানের আশা ত্যাগ ক'রেই নিজের জীবনে এবং স্ত্রীর জীবনে ধর্ম্মাচরণের শ্রেষ্ঠফল ও আধ্যাত্মিক সাধনের চরম উৎকর্ষকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলার জন্য চেষ্টা পাবেন, পত্ন্যন্তর গ্রহণে বিরত হবেন। স্ত্রী যদি রুগ্না হয়, স্বামী তার সেবার মধ্য দিয়েই নিখিল মানব জাতির প্রেমময় সেবার অনুশীলন করতে চেষ্টা করবেন। তবে স্ত্রী যদি ভ্রষ্টা হয়, তবে ধার্ম্মিক স্বামীর তার প্রতি কোনো কর্ত্তব্য নেই।

স্ত্রীর পতি-ত্যাগের অধিকার

প্রশ্ন—স্ত্রী কোন্ অবস্থাতে স্বামীকে ত্যাগের অধিকারিণী ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের ভার স্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দাও। এতকাল আমরা শাস্ত্র লিখে কেবলি

বলেছি যে, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি'—স্ত্রীলোকদের স্বেচ্ছানুসারে চলার অধিকার দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু শত শত বিধি, শত শত নিষেধ রচনা ক'রেও আমরা তাদের একেবারে বশংবদ ক'রে তুলতে পারি না। তার বহু কারণের মধ্যে একটী কারণ এই যে, আমরা পুরুষের জাতি স্ত্রীলোক সম্পর্কে যে একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য জোর ক'রে চালিয়ে নিতে চেয়েছি, পুরুষের জাতি সম্পর্কে এইরূপ চেষ্টা প্রবল ভাবে করি নি। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা দশরথ ব্যতীত অন্য পুরুষের কল্পনাও করেন নি, অথচ শুনি নাকি দশরথের ষাট হাজার মহিষী ছিলেন। আমাদেরই প্রতিবেশী একজন একালের মহারাজার প্রায় পাঁচশত সুয়োরাণী আছেন, একথা তোমরাও বোধ হয় জানো। মাত্র গরীব ব্রাহ্মণদের বহু পত্নীর কথা কম শোনা যায়, সেও আদর্শের দোহাই দিয়ে নয়। ব্রাহ্মণেরা গরীব, কটী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ কত্তে পারেন ? তবে তাঁরা শাস্ত্রীয় জীব ছিলেন ব'লে চিত্ত ছিল অতি কমই ভোগমুখী, তাই বহুস্ত্রীর আসক্তি বলতে গেলে ছিল না। কিন্তু ধনবলে বা বাহুবলে বলীয়ান্ অতীতের বৈশ্য আর ক্ষত্রিয় বহুপত্নী লাভের সুযোগ প্রায়ই ছাড়েন নি। একমাত্র রামচন্দ্র এক অতি দুর্লভ ব্যতিক্রম। একমাত্র-পত্নী-ব্যতীত দ্বিতীয়া নারীতে অভিনিবেশমাত্র-বিহীন পুরুষ শ্রীরাম ছাড়া আর খুব কম পরাক্রান্ত ব্যক্তিকেই দেখা যাবে। সুতরাং নারীরা স্বামিত্যাগের অধিকার চাইতে গেলে, অধিকারিণী ও অনধিকারিণীর বিচারের ভার মেয়েদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

স্বামিত্যাগিনীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—কোনও স্ত্রী যদি স্বামীকে ত্যাগ করে, তাহ'লে সেই স্বামীর কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যবস্থা হবে অবস্থা বুঝে। স্ত্রী যদি বিবাহিত জীবনকে ধর্ম্ম-সাধনের একান্ত প্রতিকূল বুঝে স্বামীর সংস্রব ত্যাগ করেন, তা'হ'লে গার্হস্থ্য প্রয়োজনের দাবী বুঝে স্বামী স্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে পুনরায় বিবাহ কত্তে পারেন। স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে নিয়ে সংসার পাতবার উদ্দেশ্যে স্বামীকে ত্যাগ করেন, তবে সেই স্ত্রীর ভাবনা স্বামী সম্পূর্ণই পরিহার কর্ব্বেন এবং অতীত জীবনটাকে একটা স্বপ্ন জ্ঞান ক'রে ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন। স্ত্রী যদি সাময়িক বুদ্ধি-বিভ্রমে বিপথে গিয়ে থাকে, স্বামী তাকে প্রেম ও সহৃদয়তার বলে সৎপথে ফিরিয়ে আন্‌বার চূড়ান্ত চেষ্টা কর্ব্বেন এবং সেই চেষ্টায় বিফল হ'লে কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ ক'রে নূতনভাবে জীবন পরিচালনে যত্নবান্ হবেন। আর যদি চেষ্টা সফল হয়, তবে স্ত্রীর জানা অজানা সব অপরাধ সরল মনে ক্ষমা ক'রে দুজনে মিলে পুনরায় পবিত্রতাময় ভাগবত জীবন যাপনের চেষ্টা কর্ব্বেন।

স্বামী বা স্ত্রীর অপরাধে কর্ত্তব্য

প্রশ্ন হইল,—স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অপরাধ করে, কিম্বা স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অপরাধ করে, তা হ'লে অপরাধীর প্রতি কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দোষ-সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়ে

প্রসন্ন মনে ক্ষমা। বিবাহিত হওয়াই একটা দারুণ কুকুমারী। তার উপরে যদি থাকে ক্ষমার অভাব, তাহ'লে সংসার হয়, অচল, দুর্ব্বিষহ।

ক্ষমার শক্তি

প্রশ্ন—ক্ষমা কি অনেক সময়ে অপরাধের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করে না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি—করে, কিন্তু সুপ্রযুক্ত ক্ষমা দ্বারা জগতের যত দোষের সংশোধন হ'য়েছে, জগতের সকল শাসন-দণ্ড মিলেও তার এক দশমাংশ দোষের সংশোধন কত্তে পারে নি।

চিরকৌমার্য্যেচ্ছুকা কন্যার পালনীয় কি

একজন প্রশ্ন করিলেন,—যে সব মেয়ে চিরকুমারী থাক্‌তে চায়, তাদের কি ভাবে চলা উচিত ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, সকল জীবের দাম্পত্য ব্যবহার সম্পর্কে কৌতূহলবর্জ্জিত সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব অবলম্বন। নরনারী বা জীবজন্তুর জান্তব ব্যবহার সম্পর্কিত সকল ঔৎসুক্য বর্জ্জন করা। মনকে সর্ব্বদা উর্দ্ধমুখ রাখা এবং জীবনকে মহত্তর আদর্শের চরণে উৎসর্গ করার জন্য অবিরাম সঙ্কল্প পোষণ করা। শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অশনে-বসনে সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা পরিহার করা। শরীরকে যথাসাধ্য কষ্টসহিষ্ণু, কর্ম্মঠ ও সৎকার্য্যে নিরত রাখা। বাক্‌সংযম অভ্যাস

করা এবং বাচিক সংযমের কালে মনকেও সংযত, সংহত, একনিষ্ঠ রাখ্‌বার চেষ্টা করা। দেহের সুখের প্রতি যাতে মন কখনো প্রলুব্ধ হ'তে না পারে, তার জন্য শরীরের অনিত্যতা অনুক্ষণ স্মরণ করা এবং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের সম্পর্কেই দৈহিক মাখামাখি বা ঘেঁষাঘেঁষি বর্জ্জন ক'রে চলা। এই সব নিয়ম যে মেয়ে সযত্নে পালন করে, তার পক্ষে চিরকৌমার্য্যব্রত প্রতিপালন খুব সহজ হয়। নিরহঙ্কার তেজস্বিতা, দৃঢ় মন এবং অনুক্ষণ পরমাত্ম-স্মরণ কৌমার্য্যধর্ম্মের প্রধান রক্ষক।

একদা-বিবাহেচ্ছুকার চিরকৌমার্য্য

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—যে সব মেয়েদের এক সময়ে বিবাহে প্রবল ইচ্ছা ছিল কিন্তু কারণাধীন বিতৃষ্ণা এসেছে এবং সেইজন্য তারা চিরকুমারী থাক্‌তে চায়, তাদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারী-পুরুষের মিলনে দেহের উৎপত্তি। সুতরাং দেহধারীমাত্রেরই ভিতরে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ একদা বিবাহে অত্যন্ত আগ্রহবতী ছিল ব'লেই পরে কখনো চিরকুমারী হ'তে পার্ব্বে না এ কোনো কাজের কথাই নয়। কেউ কেউ নিজ প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় না জেনে বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু আত্মসম্বিৎ ফিরে এলে নিজেকে নিজে চিনতে পায়, তখন তার পক্ষে চিরকৌমার্য্যের ব্রত পালন সহজ হয়। এসব ক্ষেত্রে চির-কৌমার্য্য নিন্দনীয় নয়।

সংযম-চেষ্টার মহিমা ও প্রভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কারণ তোমার যাই থাকুক, জীবনে যেই ছেলে যেই মেয়ে দু-পাঁচ-দশ বছর কৌমার্য্য-সঙ্কল্পকে ধারাবাহিক পোষণ ক'রেছে, সে যদি পরে বিবাহও করে তবু তার দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ বংশের ভিতরে শক্তির সঞ্চার ঘট্‌বে। ইন্দ্রিয়-সংযমের সঙ্কল্প একটী দিনের জন্যও যে পোষণ করেছে, সে-ই দেশকে সকলের অজ্ঞাতে কিছু শক্তির উত্তরাধিকার প্রদান কচ্ছে। সংযম-চেষ্টার মহিমা অপরিসীম, প্রভাব অতুলন। দশটা বছরের জন্য যদি একটী দেশের যুবক-যুবতীদের মনে সংযমের প্রেরণা ধারাবাহিকভাবে রক্ষা করা যায়, তাহ'লে তার স্থায়ী ফল এক শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা সূক্ষ্ম স্রোতে চল্‌বে। দেশের মূর্খ নেতারা এই কথা কেউ বুঝ্‌লেন না, যাঁরা বুঝ্‌লেন, তাঁরা নিজ নিজ চরিত্রের দৈন্যে কথাটা প্রচার করার সাহস পেলেন না; আর যাঁদের চরিত্রের দৈন্য নেই, তাঁরা হাজার কাজের হট্টগোলে সব চেয়ে দরকারী এই কথাটা বল্‌বার অবকাশ পেলেন না। জান্‌বে, তোমার দেশের এটাই সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

সাময়িক সদ্‌বৃত্তির স্থায়ী সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চোরের সঙ্গ চৌর্য্যবৃত্তির প্ররোচক, ডাকাতের সঙ্গ ডাকাতি-বৃত্তির উত্তেজক, অসংযমীর সঙ্গ অসংযমের প্রশ্রয়দায়ক। সৎসঙ্কল্পযুক্ত দশটী লোক একস্থানে বাস করলে নিজেদের অজ্ঞাতসারে বাইরের লোকেরা সদ্‌বিষয়ে

অনুরাগ অনুভব কর্ত্তে থাকে। সুতরাং যাদের ভিতরে সাময়িকভাবেও সদ্‌বুদ্ধির, সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনের উন্মেষ ঘটেছে, তারাও প্রকারান্তরে দেশহিতৈষী, সমাজসেবক ও জগতের কল্যাণকারী। এক বা দুইজনের সাময়িক সদ্‌বৃত্তিরও স্থায়ী সুফল কম নয়।

সংসারীর সাধন-ভজন

একজন প্রশ্ন করিলেন,—সংসারে আমরা দিন আনি, দিন খাই, অবিরাম অন্নার্জ্জনের চেষ্টাতেই থাকি ব্যস্ত। তার উপরে আজ ছেলের অসুখ, কাল মেয়ের অসুখ। এভাবেই আমাদের দিন চলে। আমাদের দ্বারা ধ্যান, ভজন, উপাসনা প্রভৃতি কি ভাবে চলা সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুবিধা-অসুবিধা, বিপদ-সম্পদ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কোনো কিছুর পানে না তাকিয়ে চোখ্-মুখ বুজে নিজ নিয়মিত সাধনের সময়ানুবর্ত্তিতাটী রক্ষা ক'রে যাবে। মন বসুক কি না বসুক তার দিকেও তাকাবে না। পরন্তু দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বকর্ম্মের সাথে সাথে এবং ফাঁকে ফাঁকে মঙ্গলময় ভগবানের পরম-পবিত্র নাম স্মরণ কর্ত্তে থাকবে। এর ফলে একদিকে ক্রমশঃ বিঘ্ন-বিপত্তির সংখ্যা, পরিমাণ ও গভীরতা কমতে থাকবে এবং অন্যদিকে অভিনিবেশের দৃঢ়তা, গাঢ়তা ও একতানতা আসতে থাকবে। সংসারী বলেই ভয় পাবার কিছু নেই, কিম্বা সংসারের সহস্র কর্ত্তব্যের প্রতি উপেক্ষা ক'রে কাপুরুষের মত পলায়নেরও প্রয়োজন নেই।

মহিলাদের আশ্রম-বাস

একজন প্রশ্ন করিলেন,—গৃহে থেকে অনেকেই ঠিক্ ঠিক্ মত সাধন-ভজন কর্ত্তে পারেন না। সংসারের ভেজালে সদাচার-পালন অসম্ভব হয়। পুরুষদের পক্ষে মাঝে মাঝে মঠ, আশ্রম প্রভৃতিতে বাস ক'রে, সদাচার শিক্ষার এবং মনের মোড় ফিরিয়ে নেওয়ার সুবিধা আছে। কিন্তু মেয়েদের তা' নেই। এমতাবস্থায় মেয়েদের জন্য কি কতকগুলি মঠ, আশ্রম, প্রভৃতি নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেইরূপ প্রতিষ্ঠান নির্ম্মিত হ'তে পারলে ত' খুবই ভাল, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বৃথা বাক্যালাপ পরিহার ক'রে নিয়ত রসনায় সৎপ্রসঙ্গই কর্ব্বেন, এমন জেদওয়ালা মেয়ে চাই। যে মেয়ে প্রজল্প, পরনিন্দা, কুৎসা, কলহপরায়ণতা প্রভৃতি পরিহার ক'রে চল্‌তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়, তাকে পাঠালে তার সঙ্গের দোষে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অসাত্ত্বিকতা ও অনার্য্য ব্যবহার সংক্রামিত হবে। বিলাস-বর্জ্জন, দেহরক্ষার জন্য আহার্য্য গ্রহণ, আহারীয়মাত্রকেই ভগবানের পবিত্র প্রসাদজ্ঞান, প্রসাদের পাপ-হরণ-ক্ষমতায় গভীর বিশ্বাস, প্রসাদগ্রহণ কালে মনকে অন্তর্মুখ ক'রে রাখা এবং বস্তুর প্রতি নয় পরন্তু বস্তু-নিরপেক্ষভাবে ভগবানের প্রেমময় সত্তার প্রতি অনুরক্তি, কেবল ভগবৎ-সাধন ও ভগবদ্-ভজনের জন্যই শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ, নিরন্তর নাম জপ, প্রভৃতি বিষয়ে যাঁদের অকপট ও নিরভিমান অধ্যবসায়, মাত্র তাঁরাই মহিলাদের মঠ বা মহিলাদের আশ্রম গড়ার

অধিকারিণী এবং মাত্র তাঁরাই স্থায়ী বা সাময়িক ভাবে সে সব প্রতিষ্ঠানে বাসের যোগ্য। নতুবা প্রথম দু'চারদিন ভাল গেলেও কয়েকদিন পরে, অবলা জজের মেয়ে আর কমলা ব্যারিষ্টারের স্ত্রী, রমলা মুদির বউ আর অমলা সুদখোরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, এসব নিয়ে দারুণ কলহ-কচায়নের সৃষ্টি হবে।

দম্পতির আশ্রম-বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়েদের প্রতিষ্ঠান মেয়েরা গড়লেই ভাল। কিন্তু পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া যদি সাত্ত্বিক হয়, তাহ'লে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্রত নিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী দুইজনেই একসঙ্গে গিয়ে আশ্রম-বিশেষে বাস ক'রে নিরন্তর সৎকথা শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তন, অবিচ্ছেদ নাম-জপ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, প্রকৃত সাধুসন্তের জীবনের উৎকৃষ্টতম অংশের অনুকরণ প্রভৃতি দ্বারা শক্তি, সাহস ও উৎসাহ সঞ্চয় ক'রে নিয়ে আসতে পারেন। সুব্যবস্থা থাক্‌লে শিশুদের বা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের নিয়েও বাপ-মা এরূপ আশ্রমে বাস করতে পারেন। কারণ, তাতে শিশুদের জীবনের উপরে সৎ-সংস্কারের প্রভাবপাতের সম্ভাবনা খুব বেশী।

নববিবাহিতের আশ্রম-বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নববিবাহিত দম্পতি যদি বিবাহের পর থেকে একটী নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ সংযম পালন ক'রে চলার ব্রত নেন এবং সংযমপালন-কালটুকু এই জাতীয় কোনও সৎপ্রতিষ্ঠানে বাস ক'রে আসেন, তবে তাদের নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক উভয়বিধ কুশলের সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্তু যে সব দম্পতির পক্ষে একজনকে ছেড়ে আর একজনের আলাদা শয্যায় শয়ন কত্তে গেলেই প্রাণ আইঢাই করে, তেমন দুর্ব্বল ও রুগ্নমনা দম্পতীর পক্ষে কোনও আশ্রমে গিয়ে আশ্রমের অপমান না করাই ভাল।

কিরূপ আশ্রম বর্জ্জনীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনও কোনও আশ্রম-নামধেয় প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মের আবরণে ঘৃণ্য কদাচারের অনুষ্ঠান হয়, সরলচিত্তা রমণীদিগকে নানা বচন-বিন্যাসে মুগ্ধ ক'রে নীতি-বিগর্হিত কদর্য্য কার্য্যে প্ররোচিত এবং বাধ্য করা হয়। সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ছায়াও, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কারো পক্ষে মাড়ানো উচিত নয়।

মহাপাপীরও নামজপ নিষ্ফল নয়

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কাউকে কাউকে দেখা যায়, দিবারাত্রি মালাজপ কচ্ছেন, অথচ অতি নিকৃষ্ট কার্য্যের সুযোগ পাওয়া মাত্র নীচবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন কচ্ছেন। এদের নামজপ কি নিষ্ফল নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামজপ কোনো অবস্থাতেই নিষ্ফল হয় না, যদি নামজপকালে নামীর অর্থাৎ ভগবানের সেবার উদ্দেশ্য স্মরণে থাকে। "হে প্রভো, তোমার অন্য কোনও সেবা আমার আয়ত্ত নয়, আমি তোমার এই পবিত্র নামের অঞ্জলি দিয়ে তোমার সেবা কত্তে চাই,"—এই ভাবটী নিয়ে যদি কেউ

নামজপ ক'রে যায়, তবে যতবারই ব্রতভ্রষ্ট হোক্, যত রকমের সে অন্যায় কার্য্য করুক, নামের শক্তিতে আস্তে আস্তে তার পাপপ্রবৃত্তি দুর্ব্বল এবং সৎপ্রবৃত্তি সবল হ'তে থাকবেই, পূর্ব্ব-সংস্কারের প্ররোচনায় এবং পূর্ব্বাভ্যাসের আকর্ষণে কেউ একজন অতীব গর্হিত নানাবিধ পাপের অনুষ্ঠান কচ্ছে ব'লেই একথা বলা চলে না যে, শরণাগত মনোভাব নিয়ে সে যে নামজপ কচ্ছে, তা ফলহীন হবে। তার অভ্যাস ও সংস্কারের তুলনায় যতদিন পর্য্যন্ত তার নামাভিনিবেশ মহত্তর ও গভীরতর না হবে, ততদিন সে বারংবার পদস্খলিত হবে এবং কালক্রমে নামই জয়ী হবেন এবং পাপ দূরে পলায়ন কর্ব্বে। এজন্য মহাপাপীরও অবিরাম নামজপ ক'রে যাওয়া উচিত এবং শতবার পাপপঙ্কে ডুবেও উৎসাহ না হারানো উচিত।

কুকার্য্যের উদ্দেশ্যে কৃত সৎকর্ম্ম

প্রশ্ন—একজন যদি কুকাজ করার সুযোগ পাবার জন্যই নামজপের অভিনয় করে, তাহ'লে এতে তার পাপ ও পুণ্য কতখানি হবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অভিনয় সকল অবস্থাতেই পাপ। তবে মন্দ অভিনয়ের চেয়ে ভাল অভিনয়ে কখনো কখনো কম পাপ। কেন ? না, ভাল অভিনয়ের ফলে কখনো কখনো ভাল হবার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু কার্য্য অপেক্ষা উদ্দেশ্যের পাপ-পুণ্যই অধিকতর পাপ বা পুণ্য। তুমি যদি অতি নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে অতি মহৎ কাজ কর, তাহ'লে সেই মহৎ কাজেরও

লভ্য হবে পাপ। নারীকে অধর্ম্মপথে চালিত কর্ব্বার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কেউ নামদীক্ষা দান করে, তাহ'লেও দীক্ষাদানের পুণ্য গণনায় আস্‌বে না, উদ্দেশ্যের পাপই তার লভ্য হবে। খবরের কাগজে একবার বেরিয়েছিল যে, বরিশাল জেলায় একদল ডাকাত রাস্তা দিয়ে "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ, প্রাণগৌর নিত্যানন্দ" ব'লে কীর্ত্তন ক'রে যাচ্ছিল এবং ঐ কীর্ত্তন কত্তে কত্তেই গৃহস্থের গৃহে ডাকাতি করেছিল। এস্থলে কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যই ছিল, এরা যে ডাকাত, একথা লোকে যেন বুঝতে না পারে। এরূপ নামকীর্ত্তনে পুণ্য-সম্ভাবনা মাত্র এইটুকু যে, আজ ডাকাতির উদ্দেশ্যে যে নামকীর্ত্তন করেছে, কাল সে হয়ত কোনো কারণে অনুতপ্ত হ'য়ে পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে এই কীর্ত্তন করলেও করতে পারে। কিন্তু ডাকাতিটা ডাকাতিই, পরস্বাপহরণ পরস্বাপহরণই, —নামকীর্ত্তন ক'রেছ বলে এই পাপ থেকে রেহাই নেই। ক্রুশচিহ্ন বুকে ধারণ ক'রে যীশুর নাম কত্তে কত্তে যদি কেউ নরহত্যা করে বা "আল্লা-হু আকবর" ধ্বনি কত্তে কত্তে যদি কেউ প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগায়, তারা স্বর্গে মহাসুখে থাক্‌বে, এ বিশ্বাস পাগল কিম্বা মূর্খের পক্ষেই সম্ভব। পাপ সর্ব্বাবস্থাতেই পাপ, ভগবানের নাম ক'রে কর্‌লেও পাপ, দেশের সেবার নাম ক'রে কর্‌লেও পাপ।

নারী-নৃত্য ও ব্যায়াম

মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা সম্পর্কে একজন প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়েদের তোমরা নাচ শিখাবে,

এইটাই যখন ইচ্ছা, তখন আর এর ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করার কোনো অর্থ নেই। যাতে মেয়েদের ভালো হবে, তাই কর্ব্বে,—এই যখন হবে তোমাদের ইচ্ছা, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা না কর্ব্বেও বুঝতে পার্ব্বে যে, মেয়েদের নৃত্য শিখান প্রয়োজন, কি নিষ্প্রয়োজন, কুশলদায়ক কি অমঙ্গলবাহক।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—নারীদের নৃত্য-শিক্ষার স্বপক্ষে একটি মস্তবড় যুক্তি এই যে, এতে তাদের শরীর সবল, স্বাস্থ্যপূর্ণ এবং কর্ম্মদক্ষ হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে কতক লোকের মত যতই অনুকূল হোক, অধিকাংশ লোক একে একটা যুক্তি ব'লেই মানবে না। তাদের প্রশ্ন এই হবে যে, দৈনিক দুবেলা দু-মাইল ক'রে পথ হাঁটিয়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য-রক্ষার কোন চেষ্টা ক'রেছ কি ? দৈনিক দশমিনিট ক'রে পদ্ধতিবদ্ধ ব্যায়াম এবং আসন-মুদ্রাদির অভ্যাস করিয়ে তাদের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা ক'রেছ কি ? যেরূপ আয়োন্নতির চেষ্টা হাজার লোকের সামনে না দাঁড়িয়ে বা রঙ্গমঞ্চে না গিয়েও সম্ভব হ'তে পারে, তা কখনো ক'রে দেখেছ কি ? রামমূর্ত্তি, ভীমভবানী, গোবর, স্যাণ্ডো, মুলার, ম্যাকফ্যাডেন প্রভৃতি ব্যায়াম-তন্ত্রের ঋষিরা যে সব উৎকৃষ্ট অনুশীলন প্রচার ক'রেছেন, তার অনুবর্ত্তন ক'রে আগে দেখেছ কি ? এসব কিছুই যদি না ক'রে থাক, তবে আগে এগুলি কর। তাতেও যদি দেখ যে মেয়েদের শরীর সবল হয় না, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না, কর্ম্মপটুতা, শ্রমদক্ষতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে না, তবে তারপরে নারীনৃত্যের প্রচলনের

চেষ্টা কত্তে যেও।

নারীনৃত্য ও ভবিষ্যৎ জাতিধ্বংস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাজার লোকের করতালির লোভ, পত্রিকায় নাম-ছাপানোর বা ফটো-প্রকাশের প্রলোভন, এই ত' হচ্ছে মেয়েদের নৃত্যশিক্ষার প্রধান প্ররোচক। এর পশ্চাতে শরীর-গঠনের আকাঙ্ক্ষা কোথায়, মানুষের মত মানুষ হ'য়ে দুঃখদৈন্যে জীর্ণা জন্মভূমির দুঃখ-বিদূরণের প্রেরণা কোথায় ? প্রচ্ছন্ন ভোগলালসার ইঙ্গিতে পরিচালিত হ'য়ে বাইরে আর্টের একটা মুখোস পরিধান ক'রে অন্তরের লজ্জাকর গ্লানিকে ঢেকে রাখাই যদি নারী-নৃত্যের প্রকৃত স্বরূপ হ'য়ে থাকে, তবে জানবে এ থেকেই এ দেশের ধ্বংসের সূচনা হবে।

ভাবী সন্তান সম্পর্কে মানবের দায়িত্ব

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুরুষই হও আর নারীই হও, সন্ন্যাসী যদি না হও, তাহ'লে তোমার জীবনের সর্ব্ব-প্রধান পার্থিব কর্ত্তব্য হচ্ছে তোমার ভাবী সন্তানের প্রতি। কেমন ধারার জীবন যাপন কর্‌লে তুমি বলবান্, বীর্য্যবান্, উচ্চাকাঙ্ক্ষ, তেজস্বী, কর্ম্মঠ, সহিষ্ণু, সদাচারী, পরহিতব্রত, মহাপ্রাণ পুত্রকন্যার জনক বা জননী হ'তে পার, তাই হবে তোমার সবচেয়ে বড় অনুসন্ধানের বিষয়। তুমি যদি উপকারীর উপকার বিস্মৃত হও, অকৃতজ্ঞ হও, নির্দ্দয়, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর হও তোমার সন্তান-সন্ততিও সেই রুচি, সেই প্রকৃতি নিয়ে আবির্ভূত হবে। তার ফলে মানবের সমাজ নারকীয় সমাজে

পরিণত হবে। সন্তান-গোষ্ঠি যাতে মানুষের জাত ব'লে পরিচয় দিতে পারে, তারই জন্য তোমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে মানুষ হ'তে হবে। এই একটিমাত্র কথা মনে রেখেই প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যেকটী কর্ম্ম পরিচালন করা কর্ত্তব্য।

ভাবী সমাজ সম্পর্কে সন্ন্যাসীর দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য যাঁরই যা থাকুক, তাঁদের পার্থিব কর্ত্তব্য হচ্ছে জগতের ভাবী মানব-সমাজের মধ্যে দেবভাবের সম্ভাবনা-বৃদ্ধির চেষ্টা করা। এই জগতে যখন বাস কচ্ছ, তখন তুমি এই জগতের-মানুষের ঋণ পরিশোধের জন্য এ কাজটুকু কত্তে বাধ্য। সঙ্ঘগড়া, আশ্রম-রচা, মঠ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি সব কাজেই এই কথাটী তোমাকে মনে রাখতেই হবে। যেহেতু তুমি কৃষ্ণভক্ত, সেই হেতু একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত আর কারো প্রতি তোমার কর্ত্তব্য নেই, এই জাতীয় যুক্তি একক, নিঃসঙ্গ, পর্ব্বতগুহাচারী সাধকের পক্ষে যতই উপযুক্ত হোক্, মঠধারী, ভিক্ষাটনকারী, সংসারীদের সংসর্গকারী সাধুদের পক্ষে এরূপ যুক্তি আত্মবঞ্চনা বা ন্যায়ের ফাঁকি মাত্র। কৃষ্ণের প্রতি তোমার আত্মিক কর্ত্তব্য আছে ব'লেই ত' কৃষ্ণের জীবকে তুমি উপেক্ষা কত্তে পার না। ভগবানের জীব যাতে ভগবদ্‌ভক্ত হয়, সদাচারী হয়, সত্যশীল হয়, পরস্পরে ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ বর্জ্জন ক'রে শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিকামী হয়, এজন্য অনাগত সমাজের অনন্তকোটি মানব-মানবীর প্রতি তোমার সুগভীর কর্ত্তব্য রয়েছে।

শিশুদের ঘুম পাড়াইবার বিদ্যা

অপর একজনের একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিশুদের ঘুম-পাড়ান একটি মস্ত বিদ্যা। এই বিদ্যা যারা জানে, তারা ইচ্ছা করলে একটা জাতিকে জাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ গঠন ক'রে দিতে পারে। শোবার আগে সকল ছেলেমেয়েরাই গল্প শুনতে ভালবাসে। কতকগুলি রাক্ষসখোক্কশের বাজে গল্প না শুনিয়ে চরিত্রের মহনীয়তার দৃষ্টান্তস্বরূপ গল্প শুনালে ঘুমের ভিতরেও শিশুদের চরিত্রকে গঠনের উপাদান প্রদানকরা হয়। কিন্তু শোবার আগে কোন শিশুরই কানে এমন গল্প প্রবেশ করান উচিত নয়, যার ভিতরে মারামারি, কাটাকাটি, চুরি, ডাকাতি, বীভৎসতা বা ভয়ঙ্কর ব্যাপার কিছু আছে। কারণ, এই সময়ে এই জাতীয় চিত্তবিক্ষোভকারিণী কাহিনী শ্রবণে মনের প্রশান্তি ও প্রসাদগুণ নষ্ট হ'য়ে যায়।

দীক্ষা ও পূর্ব্বসংস্কার

অন্য একজনের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —দীক্ষাগ্রহণান্তে জীবনের সকল অমঙ্গলজনক কুসংস্কার, পূর্ব্বস্মৃতি এবং কদভ্যাসকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে দেবার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প করা আবশ্যক। নতুবা দীক্ষার পূর্ণ সুফল পেতে দেরী হয়। দীক্ষা নেবার আগে থেকেই এ বিষয়ে যথোচিত যত্ন সহকারে আত্মগঠন একান্ত আবশ্যক।

কৃতজ্ঞতা উন্নতির মাপকাঠি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অপরের কৃত উপকারের জন্য তার প্রতি তুমি কতখানি কৃতজ্ঞ, এই একটী ব্যাপারের উপরে নির্ভর করে যে, মনুষ্যত্বের সম্পদে তুমি কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছ। অকৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত একটি কৃতজ্ঞ গণ্ডমূর্খের চেয়ে অধম। অকৃতজ্ঞ দিগ্বিজয়ী মহাবীর একটি চিরপরপদানত কৃতজ্ঞ ভিখারীর চেয়ে নিকৃষ্ট। একটী সমাজের অন্তর্ভুক্ত জনসমাজ সাধারণতঃ উপকারীর উপকার কি ভাবে স্মরণ রাখে, তারই প্রমাণের উপরে বিচার হবে যে, এই সমাজ মানবতার বিচারে কতখানি উন্নত।

কৃতজ্ঞতা-সঙ্কটে তারতম্য বিচার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, এমন সঙ্কট মানুষের জীবনে থাকে, যখন একের প্রতি কৃতজ্ঞ হ'তে গেলে অপরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয়। সেই ক্ষেত্রে তারতম্য-বিচারে দক্ষতার প্রয়োজন হয়। লোকের রসনা যাই বলুক, এসব স্থলে অনুপাত বিস্মৃত হ'য়ে চলা সঙ্গত হয় না। কিন্তু কার্য্যে, বাক্যে ও মনে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় দেবার জন্য প্রত্যেক মানুষের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকই হ'তে চাও, আর সামাজিকই হতে চাও, মনে রেখো, কৃতজ্ঞ চিত্ত উৎকর্ষ লাভের এক উৎকৃষ্ট ভিত্তিভূমি।

উপযাচিকার সংখ্যা-বৃদ্ধিতে সমাজের ক্ষতি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লম্পট পুরুষ এবং অসংযতা নারী উভয়েই সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। পুরুষেরা যখন কামোন্মত্ত হ'য়ে হিতাহিত-বুদ্ধি হারায় এবং পাত্রী-অপাত্রী বিচার বর্জ্জন ক'রে অবৈধ নারী-সঙ্গমের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন বুঝতে হবে যে, এ সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয়েছে, এ সমাজ আর মানুষের সমাজ নেই। কিন্তু নারীরা যখন স্বভাব-দত্ত ভূষণ লজ্জাকে পরিহার ক'রে রিরংসার তাড়নায় পাগল-প্রায় হ'য়ে উপযাচিকা হ'য়ে পুরুষ খুঁজে বেড়ায়, তখন জানতে হবে যে, এ সমাজ পশুর সমাজের চেয়েও অধম,—এ সমাজ নারকীয় সমাজে পরিণত হ'য়েছে। লম্পট পুরুষকে সতীনারী তার অঙ্গুলিহেলনে অনেক সময়ে সংশোধন করতে পারেন, পশুর পশুত্ব ঘুচিয়ে পুনরায় মানুষ করতে পারেন। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি বর্জ্জিতা প্রগল্ভা উপযাচিকাকে নরক-নিবারণ ক'রে স্বর্গের পথে টেনে আনা সংযমী পুরুষের পক্ষেও সহজ কথা নয়। সতী নারী নিজ সতীত্বকে অটুট রেখেও লম্পটকে অনেক সময়েই সৎপথে ফিরিয়ে আনতে পারেন, নিজের চরিত্রকে অক্ষত রেখে লম্পটা নারীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা সৎপুরুষের পক্ষেও অনেক সময়েই অসাধ্য হয়। এইজন্যই উপযাচিকার সংখ্যাবৃদ্ধিকে সমাজের পরিপূর্ণ ধ্বংসের এক অতীব প্রকট লক্ষণ ব'লে মনে করবে।

কৌশলবতী উপযাচিকা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বহু উপযাচিকা বড়ই কৌশলবতী, বড়ই ছলনাময়ী। তারা মুখে নিজ প্রবৃত্তির তাড়নার কথা তোমাকে এসে বলবে না, কৌশল ক'রে এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যে, তার লোলুপ-বাসনার শিকার-রূপে তুমিই নিজে সে সব প্রস্তাব উত্থাপন কত্তে বাধ্য হবে, যা তার নিজ মুখেই ব্যক্ত করার দরকার ছিল। তোমাকে দিয়ে কুপ্রস্তাব উত্থাপিত করিয়ে অনৈতিকতার একটা নৈতিক দায়িত্ব সে তোমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে চায়। এটা একটা চমৎকার কৌশল। সে-ই তোমার ঘাড় মট্‌কাতে চায়, কিন্তু তুমিই যে তার ঘাড় মট্‌কেছ, এই দায়টা তোমার স্কন্ধে ন্যস্ত ক'রেও রাখতে চায়। যে সমাজ এই জাতীয় কু-নারীর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সেই সমাজের রক্ষার উপায় আর মানুষের হাতে নেই ব'লেই মনে করা উচিত।

কুসাহিত্যের ধ্বংস চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের লেখনীর গতি দেখে অনেকটাই বুঝতে পারবে যে, সমাজ কোন্ দিকে চলেছে। আবার সাহিত্য সমাজের স্রষ্টাও। যা বর্ত্তমান সমাজে নেই, এমন ব্যাপার সাহিত্যিকদের লেখনীর প্রভাবে সমাজ-মধ্যে ধীরে ধীরে নিজের জন্য প্রথমে ক'রে নেয় দাঁড়াবার স্থান, পরে করে বসবার, শোবার এমন কি জমিদারী চালাবার স্থান। এইজন্যই যে সাহিত্য লম্পটের বা উপযাচিকার সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য কর্ব্বে, সেই সাহিত্যকে

পদতলে নিষ্পেষিত ক'রে ধ্বংস করার জন্য তোমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। কু-সাহিত্যের ধ্বংসে জাতীয় উন্নতির একটা প্রধান সর্ত্ত জানবে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা নীচতার জয়গান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য খুবই এটা হট্টগোল উঠবে যে, এভাবে মানুষের মতামত প্রকাশের উপরে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে। বাস্তবিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে জগতে অনেক কদর্য্য জিনিষকে সমর্থন করার একটা ক্লীব প্রচেষ্টা অনেকের ভিতরেই দেখা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মেথর যখন রাস্তা দিয়ে পাইখানার মল নিয়ে যায়, তখন সে তার মলভাণ্ডের মুখ আবৃত ক'রে রাখে কেন ? মলগুলি ত' বলতে পারে,—''আমাদেরও আত্মপ্রকাশের অধিকার আছে।'' ব্যক্তি-স্বাধীনতার নাম ক'রে দুনিয়ার যত নীচতা, যত জঘন্যতা ও যত আবর্জ্জনার জয়গান করার প্রবৃত্তি একদল সাহিত্যিকদের থাকতে দেখা যায় কিন্তু জাগ্রত মানুষের সবল সমাজ এ সব বরদাস্ত করবে কেন ?

ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মপথে লেগে থাকার দরুণ বারংবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছ দেখেও ধর্ম্মপথ পরিহার ক'রো না। যারা অধর্ম্ম পথে চ'লে ঐহিক উন্নতি সাধন কচ্ছে, তাদের উন্নতি নিয়ে তারা থাকুক, তাদের প্রতি ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ঘৃণা বা বিরক্তি পোষণ ক'রে নিজ মনকে

রুগ্ন করাও তোমার সঙ্গত হবে না। তুমি নিজে যাকে সত্য ব'লে অনুভব কত্তে পেরেছ, একনিষ্ঠ প্রযত্নে তারই সেবায় নিয়ত থাক। তোমার সত্যনিষ্ঠা নিখিল জগতের সত্যনিষ্ঠদের সঙ্গে তোমাকে যুক্ত ক'রে দেবে। তোমার সত্যনিষ্ঠা নিখিল জগতের ধার্ম্মিকদের সাথে তোমার যোগাযোগ স্থাপন কর্ব্বে। চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র অধার্ম্মিকের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ ব'লেই একথা মনে ক'রোনা যে তুমি একা। অসতের পল্লীতে একটী সৎলোকই একা শত সহস্র জন জানবে। সঙ্গীহীন ব'লে নিজেকে দুর্ব্বল ক'রো না। ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

তুমি সমগ্র জগতেরও জন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা, তোমার সত্যনিষ্ঠা যে শুধু তোমারই আত্মোন্নতির জন্য, একথা কখনো মনে ক'রো না। অত সঙ্কীর্ণ আত্মোন্নতি যেন কখনো তোমার কাম্য না হয়। তোমার সকল নিষ্ঠা তোমার উন্নতির সাথে সাথে জগতের সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতির সূচনা করুক, এই হবে তোমার একান্ত প্রার্থনীয়। তুমি শুধু তোমারই জন্য নও, তুমি সমগ্র জগতেরও জন্য।

স্বাভাবিক প্রাণায়াম

একজন প্রাণায়াম-শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যখন জীবের পরমায়ু ছিল দীর্ঘ, সভ্যতার জটিলতা ছিল অল্প, তপস্বী যখন শুধু তপস্যাই কত্তেন, সংসারের অন্য

কোনও কর্ত্তব্যের দায় তাঁর ছিল না, গাভী ছিল দ্রোণক্ষীরা, * ভূমি ছিল অকাতরা, রাজা ছিলেন ঋষি-প্রতিপালক, আর ঋষিরা ছিলেন সুনিশ্চিন্ত, সেই যুগে প্রাণায়াম নিয়ে বহু কসরৎ চল্‌ত, তা' তখন শোভাও পেত। এখনকার যুগের অবলম্বনীয় হচ্ছে, সহজ কৌশলে বৃহৎ লাভের উপায়। তাই এখন হাজার রকমের প্রাণায়াম শিখ্‌তে গিয়ে অধ্যবসায়ের প্রয়োগ অনাবশ্যক। সহজ শ্বাসে সহজ প্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ কর। ভক্তিভরে একাজ কত্তে-কত্তে আপনা-আপনি পূরক, রেচক, কুম্ভক যখন যা হবার হোক্। নিজেকে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ক'রে উদাসীন দর্শকের মত প্রাণের স্বাভাবিক গতায়াত এবং বিরতি লক্ষ্য ক'রে যাও। কখনো প্রাণবায়ু বাইরে বিরত হবে, কখনো ভিতরে বিরত হবে। এই উভয়বিধ বিরামই যখন বেশ লক্ষ্যযোগ্য হবে, তখন তার সাথে সাথেও নাম জপ্‌তে চেষ্টা কর। এতেই সকল প্রণালীর প্রাণায়ামের সেরা ফল হবে। পুঁথি-পুস্তকে অনেক কথাই ত' লেখা থাকে বাবা। তা' নিয়ে মাথা গরম ক'রে লাভ নেই। যা স্বাভাবিক, তাই নিরাপদ। যা নিরাপদ, তাতেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে দীর্ঘ-প্রযত্নে লেগে থাকা যায়, কোনো প্রতিক্রিয়ার বা বিপদের ভয় থাকে না। শ্বাসে প্রশ্বাসে নামযোগে এই স্বাভাবিক প্রাণায়ামের অনুশীলন কর।

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

শ্রীশ্রীবাবামণি মাগুরা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কোথায় আসিয়াছেন, পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোনও নির্দ্দেশ দেখা যাইতেছে

* দ্রোণ শব্দের অর্থ বত্রিশ সের। দ্রোণক্ষীরা=বহুদুগ্ধদাত্রী।

না। অদ্য তিনি সমাগত বহু ভক্তকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

আহার-কালীন মৌন

একজন প্রশ্নকর্ত্তা আহার-কালে মৌন অবলম্বনের বিষয়ে প্রশ্ন তুলিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আহার-কালে মৌনের প্রকৃত উদ্দেশ্য মাত্র বাক্‌সংযমই নহে, আহার্য্য গ্রহণকালে মনকে উচ্চতত্ত্বে নিবেশিত রাখাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রতি গ্রাস অন্ন চর্ব্বণের সাথে সাথে হয় ইষ্টমন্ত্র স্মরণ কর্ব্বে, নয় জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প কত্তে থাক্‌বে। আহার শুধুই দেহ-ধারণের হেতু না হ'য়ে উন্নততর আধ্যাত্মিক শক্তি-স্ফুরণেরও সহায়ক হোক।

ত্রিবিধ আহারীয় গ্রহণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু রসনা-তৃপ্তির জন্য আহারীয় গ্রহণ পশুর স্বভাব। দেহকে মহৎ ও বৃহৎ কর্ম্মের যোগ্য ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্য আহারীয় গ্রহণ মানুষের স্বভাব। একমাত্র পরার্থে এবং পরমার্থে আত্মবলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আহারীয় গ্রহণ এবং অন্নগ্রহণ-কালে প্রতিক্ষণ আত্মবলি দিয়ে নিজেকে ধন্য করার সঙ্কল্প-গ্রহণ দেবতার স্বভাব। তোমরা দেবতা হ'তেই চেষ্টা ক'রো, পশুর স্তরে কেউ অধঃপতিত থেকো না।

সাধুত্বের সুযোগ নিও না

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— তুমি যে, একজন সাধু, সন্ত বা সজ্জন, তোমার ত্যাগ, বৈরাগ্য,

সাধন-নিষ্ঠা, ভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আপনি তা' চতুর্দ্দিকের লোকে জানবে। মনে রাখবে, এই সময়টী তোমার পক্ষে বড় বিপজ্জনক। তুমি সাধু ব'লে লোকে তোমাকে অনাবশ্যক খাতির কত্তে চাইবে। দোকানে কোনো জিনিষ কিন্‌তে গেলে হয়ত একটা কিছু ফাও দেবে। ট্রেণে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ, হয়ত তুমি সাধু ব'লেই পাঁচজন লোক নিজেরা কষ্ট স্বীকার ক'রে ঠেলা-ঠেলি ক'রে স'রে ব'সে তোমার জন্য একটু স্থান ক'রে দেবে, অথচ তোমার পাশেই হয়ত আরও দু-একজন তোমার চাইতে বেশী কষ্ট স্বীকার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পানে চাইবেও না। এই জাতীয় অনুগ্রহ-গ্রহণ অনেক সময়েই তোমার পক্ষে মারাত্মক এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা' তোমার সাধুত্বকে বিক্রয় করার তুল্য হবে। সুতরাং নিজে সাধুত্বকে যত কম জাহির ক'রে পার, ততই ভাল।

আর এই জাতীয় অনুগ্রহ যত কম গ্রহণ ক'রে চলতে পার, ততই নিরাপদ। দোকানদারের একটি ফাওয়ের ফাঁকে কোনদিন অহঙ্কার-পিশাচ এসে তোমার ঘাড় চেপে বসে, কে জানে?

পাপ ও পুণ্য-মিশ্রিত কর্ম্ম; ছাগপালন

অপর এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —এমন কতকগুলি কাজ আছে, যা লোক—প্রয়োজনীয় কিন্তু অবিমিশ্র পুণ্য নয়। এরূপ কার্য্যের পুণ্যাংশকে শ্রেষ্ঠতম ব্যবহারে এনে, পাপাংশকে বৃহত্তর পাপ নিবারণের উপায়রূপে ব্যবহার করা সঙ্গত। যেমন ধর, কোনও কারণে দেশ জুড়ে অসংখ্য

বলীবর্দ্দ, গাভী এবং বাছুর নিধন প্রাপ্ত হচ্ছে। মনে কর, এই গো-হননের প্রবল স্রোত প্রতিরুদ্ধ করার ব্যক্তিগতভাবে তোমার কিম্বা সঙ্ঘগত ভাবে সমগ্র জাতির সাময়িক কোনও সামর্থ্যই নেই। এই সময়ে শিশু, রুগ্ন এবং বৃদ্ধের আবশ্যকীয় পুষ্টিকর দুগ্ধের অভাব বিদূরণের জন্য ছাগ-পালন এবং ছাগীদুগ্ধ-পরিবর্দ্ধনের প্রয়াস পেতে পার। কিন্তু ছাগীর সবগুলি বাচ্চাই ত' আর পাঠী হবে না, প্রায় অর্দ্ধেক, পাঠাও হবে। এই পাঠাগুলিকে দিয়ে লাঙ্গল চালান চল্‌বে না। কিম্বা কুকুরের বা বিড়ালের ন্যায় অন্য কোনও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানও সম্ভব নয়। বরঞ্চ বেপরোয়া পাঠার বৃদ্ধির দ্বারা জন-সমাজের কৃষির গুরুতর ক্ষতি সাধিত হ'তে পারে। এমতাবস্থায় গোমাংসভোজী নর-সমাজকে পাঠাগুলিকে দিয়া গোহত্যার ব্যাপকতা অল্প পরিমাণে হ'লেও কমাবার প্রয়াস মন্দের ভাল ব'লে মনে কর্ত্তে হবে। ছাগীর দুধ শক্তিবর্দ্ধক, ক্ষয়নাশক, পুষ্টিকারক এবং একটু যত্ন নিলেই অল্প-প্রয়াস-লভ্য। সুতরাং গো-হননের সঙ্কট দেশে না এলেও ছাগী-পালন সমাজের শিশুগুলির বলবর্দ্ধনের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। তেমন অবস্থাতেও পাঠাগুলি একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়।

তোমার চিত্তের স্বাভাবিক অহিংসাবৃত্তি বল্‌বে,—এই পাঠাগুলি এমন কি অপরাধ ক'রেছে যে, এদের ঘাতকের হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কত্তে হবে ? কিন্তু ছাগী যদি পালন কর, পাঠা ত' হবেই হবে। এসব ক্ষেত্রে ছাগ-হত্যাকে গো-হত্যা-প্রতিরোধের এক অনুকল্প উপায়রূপে ব্যবহার করা অসঙ্গত হবে না। হাজার

তুমি শাস্ত্রবচন বল যে, পশুহননকারী, পশুআহরণকারী, পশুমাংস-বিক্রেতা, পশুমাংসরন্ধনকারী, পশুমাংসভক্ষণকারী এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদের সহায়তাকারী প্রত্যেকেই হিংসার অপরাধে অপরাধী, কিন্তু যতকাল সমাজে ছাগীদুগ্ধের প্রয়োজন থাক্‌বে, ততকাল পুরুষ ছাগগুলির দ্বারা একদল লোকের উদরপূরণের আবশ্যকতাও থাক্‌বে। ততদিন পর্য্যন্ত ছাগ-হননকে এর চেয়ে বহুগুণে গুরুতর গো-হনন নিবারণের অন্যতম উপায়রূপে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ হবে। কারণ, ছাগমাংস প্রচুর পেলে ইংরেজই বল আর মুসলমানই বল, গো-মাংসে রুচি কম ব্যক্তিরই হওয়ার কথা। তবে বিজ্ঞান যদি কখনো এমন সুনির্দ্ধারিত উপায় আমাদের হাতে এনে তুলে দেয়, যাতে ইচ্ছামত পাঠা বা পাঠীবাচ্ছা পাওয়ার পন্থা হবে, তবে একমাত্র জননকার্য্যের প্রয়োজন ছাড়া পাঠার প্রয়োজনই থাক্‌বে না, অতএব ছাগ-হননের প্রয়োজনও জগৎ থেকে উঠে যাবে।

মৎস্য-মাংসাহার ও পাপ-পুণ্য বিচার

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধু, সন্ত, রামায়ৎ, বৈষ্ণব, সদাচারী ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারী, বিধবা এবং সন্ন্যাসিনী এঁরা চিরকালই নিরামিষ আহার কর্ব্বেন, ভারতবর্ষে এটাই একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সর্ব্বজনীনভাবে মৎস্যমাংসাদির পরিপূর্ণ বর্জ্জন সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। দু-টুকরা রুটী বা দুগ্রাস অন্নকে প্রীতিসহকারে উদরস্থ করার উপকরণ হিসাবেই ব্যঞ্জনাদির সমাদর ও প্রয়োজন। অনেক দেশে বা

অনেক ক্ষেত্রে মৎস্য বা মাংসই উপকরণ হিসাবে সহজলভ্য বা আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক। সেই সব স্থানে জোর ক'রে সকলকে নিরামিষাশী কত্তে যাওয়াও এক প্রকার জেদাজেদী মাত্র। আবার, দেহরক্ষী সৈনিক, নরহত্যা যার ব্যবসায়,—যাকে গেরুয়া পরিয়ে তপস্বী ক'রে হিমালয়ের গহ্বরে প্রেরণ কর্লে দেশ পরপদানত হবে এবং ফলে হয়ত নরনারীর ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা লুপ্ত হবে, দেব-মন্দির রচনার বা সংস্কারের অধিকার নষ্ট হবে, ধর্ম্মব্যাখ্যান কর্লে প্রাণদণ্ড হবে, অপরকে নিজ ধর্ম্মমতে আকর্ষণ কর্ব্বার চেষ্টা কর্লে গুরুবর্গের উপরে অকথ্য অত্যাচার হবে,—সেই সৈনিককেও ছানার পায়েস আর বাগবাজারের রসগোল্লা খেয়ে যুদ্ধ কত্তে বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাংসাদি তার আহারীয়ের এক প্রধান উপকরণ হবে। এর সঙ্গে পাপ-পুণ্য-বোধের গুরুতর এক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা না ক'রে যে ব্যক্তির পক্ষে যা রুচিপ্রদ, সহজলভ্য ও হিতকর, সে ব্যক্তিকে সেইরূপ আহারীয়ের স্বাধীনতা প্রদান ক'রে তার কর্ত্তব্য-পালন সম্পর্কে তাকে একান্ত অবহিত করাই বড় কাজ হবে। তার পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, তার আত্মীয়বর্গের প্রতি কর্ত্তব্য, তার প্রতিবেশীবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য, তার গ্রামবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, তার দেশবাসীগণের প্রতি কর্ত্তব্য, তার জগদ্বাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, তার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য এবং ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য—এই কর্ত্তব্যগুলি সম্পর্কে সে যাতে সজাগ, সচেতন, সতর্ক থাকে, এই হবে প্রধান কথা। একজন নিরামিষ আহার করেন, কিন্তু বৃদ্ধ-পিতামাতাকে অন্ন দেন না, মাছের নাম শুন্‌লেই

ফিনাইলের জল দিয়ে কাণ তিনবার পরিষ্কার করেন, কিন্তু নিজ স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করেন এবং গণিকা পোষণ করেন, এদিকে হয়ত নিরামিষ খেয়ে গ্রামের সকল লোকের শাকসব্জীর বাগান উজাড় কচ্ছেন, ঐ দিকে আবার প্রতিবেশীদের সম্পত্তি কৌশলে অপহরণের চেষ্টার কোনও কসুর নেই, এদিকে হয়ত মাংসাশীদের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা, ঐদিকে হয়ত দেশবাসীর মঙ্গলের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, এমন নীচাত্মা ব্যক্তিদের মৎস্যমাংসাহার-বর্জ্জনকে ধর্ম্মের নিদর্শন ব'লে গণনা কর্ব্বে পাগলা গারদের অধিবাসীরা।

সকলের নিকটে নিরপরাধ থাকা সুকঠিন

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনকে শান্তি এবং উন্নতির পথে পরিচালনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল সতত নিরপরাধ থাকার চেষ্টা করা। জগতের কারো কাছে আমার যেন কোন অপরাধ না থাকে। গুরুজন, অনুজন, সতীর্থ, প্রতিবেশী, পূজ্য, স্নেহাস্পদ, প্রভু বা ভৃত্য সকলের প্রতি সর্ব্বদা ন্যায়পরায়ণ থাকা এবং যেখানে কাউকে রুষ্ট না ক'রে, ব্যথা না দিয়ে, আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রে শান্তিপূর্ণভাবে কর্ত্তব্যপালন ক'রে যাওয়া যায়, যেখানে অনর্থক ক্ষতি বা অশান্তির সৃষ্টি না করাই হচ্ছে অধিকাংশের নিকটে নিরপরাধ থাকার পন্থা। জগতের প্রত্যেকের নিকটে নিরপরাধ থাকা বড়ই কঠিন ব্যাপার, এমন কি অসম্ভব বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যে স্থলে একজনের কাছে নিরপরাধ থাক্‌লে অপরের কাছে অপরাধী

হ'তে হয়, সেই স্থলে তারতম্য-বিচারের পূর্ণ শক্তিকে প্রয়োগ কত্তে হয় এবং উভয়ের মধ্যে যাকে লঙ্ঘন কর্ল্লে অপরাধের মাত্রা বেশী হবে, প্রাণান্তেও তার মর্য্যাদা রেখে চল্‌বে। তোমার মাতা এবং তোমার পত্নী উভয়ে পরস্পর কলহ-পরায়ণা, কিন্তু মাতা তোমার গর্ভধারিণী, গুরুর গুরু, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। এইস্থলে যদি একসঙ্গে দুইজনের প্রতি নিরপরাধ থাকা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তবে পত্নীর প্রতি অপরাধ ক'রেও মাতার প্রতি নিরপরাধ থাক্‌বে। আবার পত্নী তোমার সাধ্বী সতী, একান্তভাবে তোমার ও তোমার মাতার হিতকারিণী, পরন্তু মাতা জৈব হিংসাদির বশে তোমার ভগবৎ-প্রীতিকামিনী সাধিকা পত্নীর প্রতি মিথ্যা আক্রোশাদিহেতু ঈর্ষাদুষ্টা। এক্ষেত্রে ভগবদ্‌ভক্তের গুরুত্বহেতু উভয়ের প্রতি একই সঙ্গে নিরপরাধ থাকা একান্ত অসম্ভব হ'লে পত্নীর প্রতিই নিরপরাধ থাক্‌বে। পিতা তোমার ধর্ম্মদ্বেষী, ঈশ্বর-বিরোধী, সদাচারনিন্দক এবং একান্তই জড়দৃষ্টি ও স্বার্থপর, এক্ষেত্রে একই সঙ্গে পিতা ও ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রতি নিরপরাধ থাকা অসম্ভব হ'লে উপদেষ্টার প্রতিই নিরপরাধ থাকার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ব্বে আবার তোমার ধর্ম্মোপদেষ্টা তোমার স্থায়ী স্বার্থের প্রতি উদাসীন পরন্তু তোমাকে দিয়ে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্বার্থগুলি পরিপোষণ- কল্লে তোমাকে পিতৃসেবারূপ মহৎ কর্ত্তব্যের পথ থেকে সুকৌশলে ভ্রষ্ট হ'তে প্ররোচনা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, এমত স্থলে উপদেষ্টাকে লঙ্ঘন ক'রেও প্রাণান্ত যত্নে তোমার পিতৃসেবাই একান্ত কর্ত্তব্য এবং পিতার প্রতিই নিরপরাধ থাকা আবশ্যক।

সকলের প্রতি নিরপরাধ থাক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এইরূপ পরস্পর-বিরোধী অবস্থা অহরহ থাকে না। সুতরাং জগতের যত জনের সঙ্গে তোমার ব্যবহারের আদান-প্রদান, প্রত্যেকের প্রতি নিরপরাধ থাকার চেষ্টা সকল সময়েই সমস্যা-সঙ্কুল নয়। ট্রেণে চেপেছ, বড়ই ভিড়, নিজে একটু কষ্ট ক'রে স'রে বসে যদি নিকটস্থ একজন যাত্রীর ক্লেশ একটু না কমাও, সে হয়ত তোমার উপরে কোনও দাবী করবে না, কিন্তু মনে মনে তুমি এর কাছে অপরাধী হ'য়ে রইলে। রুগ্ন নয়, দুর্ব্বল নয়, অথচ একজন লোক অপর পাঁচজনকে প্রাণান্ত কষ্ট দিয়ে একা একা আরাম ক'রে চল্‌বে, এটা নিরপরাধ কার্য্য নয়। দেশব্যাপী অন্নাভাব চলেছে, এই সময়ে তুমি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য যদি টাকা দিয়ে কিনেই গুদাম-জাত ক'রে রাখ, অন্য নরনারীরা হয়ত তোমার এই আচরণের প্রতিবাদ নাও কত্তে পারে, কিন্তু তবু তুমি সকল দেশবাসীর নিকটে অপরাধী। তোমারই প্রতিবেশীর পুত্রকন্যাগুলি না-খেয়ে তোমার চোখের সাম্‌নে ম'রে যাচ্ছে, আর তুমি তখন তোমার ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিষ্টার ক'রে আন্‌বার ব্যবস্থা কচ্ছ, এতে হয়ত তোমার প্রতিবেশীরা দোষ নাও ধরতে পারে। তুমি তোমার নিজের বা স্বকীয় ভবিষ্যৎ-বংশীয়ের উন্নতির চেষ্টা কর, এতে কোনো অপরাধ নেই, কিন্তু তোমার অস্তিত্বকে তুমি তোমার প্রতিবেশীর অস্তিত্ব থেকে পৃথক্ ক'রে ভাব্‌তে অধিকারী নও, সুতরাং নিরপরাধ থাক্‌তে হ'লে

সাধ্যমত তাদের সেবাও তোমার অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত হওয়া চাই। পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য, পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার কর্ত্তব্য, গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য, শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য, ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্ত্তব্য সুচারুরূপে উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত থাকাই হ'ল সকলের নিরপরাধ থাকার কর্ত্তব্য।

কিসে অপরাধ লঘু হয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ত্তব্যের অপালনে ক্রটী-স্বীকারের শক্তি অপরাধকে লঘু করে। নিজের অপালনকে যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা অপরাধকে গুরু করে। ক্রটি-স্বীকারের শক্তি আন্তরিক বিনয়ের অন্যতম ফল। আর, যে কাজে একবার ক্রটি হয়েছে, তাকে পরে ক্রটিহীনভাবে প্রতিপালনের চেষ্টা যদি না থাকে, তবে এই ক্রটি-স্বীকার একটা চালবাজী বা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপরাধ-মুক্ত চিত্তে নামের সেবা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— বহুকাল নাম-শ্রবণ ও নাম-কীর্ত্তন ক'রেও অনেকের প্রাণে ভগবৎ-প্রেমের উৎস ফুটে উঠে না। নাম-শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তন, নাম-জপ, অবিরাম চলেছে, তবু, "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" এর কারণ এই যে, জীবনকে সর্ব্ববিধ অপরাধ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে না থাকলে জীবনের উপরে

নামের মহিমা, নামের প্রতাপ প্রকাশে দেরী হয়। কারো প্রতি কোনো অপরাধ কর্ব্বে না, কারো সম্পর্কে কোনো অন্যায়ের অনুষ্ঠান কর্ব্বে না। এই ভাবকে নিজ ব্যবহারের ভিতর দিয়ে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলার চেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে যে স্মরণ-মনন-কীর্ত্তন, তার ফল সদ্যঃ এবং অমোঘ। পূয-রক্ত সাফ না ক'রে ক্ষতের গায়ে মলম লাগালে যেমন মলম সহজে ক্ষতের উপরে নিজের আরোগ্য-কারিণী শক্তিকে প্রকাশ করে না, দৈনন্দিন কার্য্যাবলীকে সেই রকম অপরাধমুক্ত ক'রে চল্‌বার চেষ্টা না কর্লেও নাম-সেবার সুফল প্রত্যক্ষ হ'তে দেরী হবেই হবে।

নাম-জপ ও সাধুসঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অসাধুর সঙ্গ এক বিরাট অপরাধ। অসাধুসঙ্গ বর্জ্জনে যাদের চেষ্টা নেই, তাদের নাম-জপ, নাম-শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তন অনেক সময়ে কপটতায় গিয়ে পর্য্যবসিত হয়। অসাধু-ব্যক্তিদের সঙ্গ মনকে নানা অবাঞ্ছনীয় নীচতায় আচ্ছন্ন করে এবং নামের প্রকৃত তত্ত্ব থেকে মনকে দূরে টেনে নিয়ে যায়। ফলে, মুখ দিয়ে নামের অক্ষরগুলির অবশ্য আবৃত্তি হ'তে কোনো বাধা হয় না, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নাম করা যায় না। সুতরাং যাতে অসাধুর সঙ্গ থেকে সর্ব্বদা রক্ষা পেতে পার, তার জন্য আগে প্রাণপণ চেষ্টা কর নিজে অসাধুত্ব-বর্জ্জিত হ'তে। তারপরেই চেষ্টা কর তাদের ভিতরে সাধুত্বের স্ফুরণ ঘটাতে, নিত্য তোমাকে যাদের সঙ্গ কর্ত্তেই হবে। সাধুসঙ্গের জন্য যদি সাধুর অন্বেষণ কর্ত্তে হয়, তবে এই দুইটি কর্ত্তব্য

করার পরে, আগে কিছুতেই নয়। যে নিজে সাধুত্ব অর্জ্জনে চেষ্টিত নয়, সাধু অন্বেষণ ক'রেও অনেক সময়ে সে সাধু চিনতে পারে না। যাদের সঙ্গ প্রত্যহ তোমাকে কত্তেই হবে, তাদের মধ্যে যদি সাধুজনোচিত সদ্গুণ ও সদুৎকর্ষ সমূহের সমাবেশে যত্নবান্ না হও, তাহ'লে সাধু-সঙ্গ ক'রে এসেও সেই সঙ্গের সুফল তোমাতে স্থায়ী হবে না।

নিজ গৃহকে পবিত্র কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক সাধক বা সাধনেচ্ছু ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য নিজ স্ত্রী, নিজ পুত্র, নিজ ভ্রাতা, নিজ ভগিনী, নিজ বন্ধু, নিজ বান্ধবী প্রভৃতি সকলকে অসাধুবর্জ্জিত হ'তে প্রেরণা দেওয়া ও সাহায্য করা। যাদের সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতা বা ঘনিষ্ঠতা বেশী, তাদের সাধুত্ব-বর্দ্ধনে তোমার প্রত্যক্ষ লাভ বেশী। সমগ্র সমাজের বা নিখিল দেশের প্রত্যেকটী নরনারীর ভিতরে সাধুত্বের সমাবেশের জন্য বিরাট আন্দোলনে সমাজের বা দেশের লাভ যতই হোক, তোমার প্রত্যক্ষ লাভ কম। কারণ, প্রত্যেক দেশবাসীর সঙ্গে তোমার দৈনন্দিন কোনও সংসর্গ নেই। ঘুম থেকে উঠেই কিম্বা নিদ্রা যাবার আগে তুমি দেশের প্রত্যেকটী সাধুজনের সঙ্গ কত্তে পার না। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই যাদের মুখ দেখ্‌তে হবে, ঘুমুতে যাবার আগে যাদের সাথে কথা কইতে হবে, তাদের চরিত্রে যদি সাধুত্বের সমাবেশ হয়, তবে তার দ্বারা অনুক্ষণ তুমি প্রত্যক্ষ উপকার পেতে পার। মাতার অভয়-চিত্ততা, ভ্রাতার সদা সহর্ষভাব, কন্যার একান্ত সত্যবাদিত্ব, পত্নীর

গভীর ঈশ্বর-নির্ভর এবং ভৃত্যের বশংবদ বিনয় অনেক পরিমাণে বাঞ্ছনীয় সদ্গুণ তোমাতে অনুক্ষণ সংক্রামিত করবে। সুতরাং নিজগৃহকে পবিত্র ও সুন্দর করাই তোমার পক্ষে প্রত্যক্ষ লাভের ব্যাপার।

প্রচারক হও, প্রতারক হইও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায়, বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে বেদান্তের আলোচনা করেন, কিন্তু নিজের স্ত্রীটী চিরনিরক্ষরা নিরেট মূর্খই থেকে যায়। তাঁরা পরের কন্যাকে গিয়ে ভাল ভাল ভজন গান শিক্ষা দেন, কিন্তু নিজের কন্যাটির গ্রাম্য কু-সংস্কার ঘুচাবার বিষয়ে মন দেন না। তাঁরা পরের ছেলেকে, পরের ভাইকে সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বর-সাধন, যোগাভ্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাল ভাল ভাষণ শ্রবণ করান, কিন্তু নিজের পুত্র বা নিজের ভ্রাতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। এঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহস্থিত স্বাভাবিক স্বর্গকে উপেক্ষা ক'রে অবহেলার ফলে নরকের জঞ্জাল-স্তূপে পরিণত করেন, অথচ অপরের আস্তাবল পরিষ্কার করার জন্য হাজার মণ ঘৃত ভস্মে ঢালেন। তোমরা প্রত্যেকেই প্রচারক হও এটা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু প্রচারকের নিজের গৃহের আঙ্গিনা যেন সর্ব্বাগ্রে হয় কাচের মত স্বচ্ছ। নতুবা প্রচারকদিগকে ভাগ্য-বিড়ম্বনায় শেষে প্রতারক হ'তে হবে।

(দশম খণ্ড সমাপ্ত)

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥

দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥

পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥

অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে।
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥

কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥

সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥

নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥

চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর, আনন্দ আমার!

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পূর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে ''ভাই''॥

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি মুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমারি জাতি॥

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥

ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিব অশ্রুনীরে,

বিপদে আপদে বাহু যুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥

কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

(৬)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি॥

নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,

* মঙ্গল মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা,
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি॥

আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী॥

সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠবে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্ভরা প্রাণী॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।

(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ॥

জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই!
ভালবাসায় থাকব আমি
অনিন্দ্য অম্লান॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।

(৮)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়।
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়॥

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল-রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না ''প্রণব'' এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়॥

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব-মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,

আমারি ত' কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়॥

যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায়॥

(৯)

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার
জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে
চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে
লভিবে ভারত লুপ্ত মান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য,
কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৬' নং গান।

জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।

গভীর পঙ্কে আবদ্ধ যার
ডুবিয়া সপ্ত শতাব্দী
ম্রিয়মাণ ছিল জীবন-চেতনা—
শুষ্ক, শীর্ণ, প্রেমাব্ধি;
নিজের মাঝারে বিশ্ব-জগৎ,
বিশ্ব-জগতে আপনারে,
—চক্ষু থাকিতে অন্ধ,—তাই ত'
দেখিয়াও দেখা গেলনা রে;
কেবল আত্ম-বঞ্চনা-নীতি
নিজেরে বাঁধিল শৃঙ্খলে;
দাস-ক্রীতদাস বংশানুক্রমে
বাড়িল কেবল দলে দলে।
তাহারি মাঝারে লুকাইয়াছিল
ঋষির সাধনা সুজাগ্রৎ,
আবার ভারতে নূতন রীতিতে
দেখাতে মুক্ত শুদ্ধ পথ।
বর্ষ দ্বিশত প্রতীচীর যত
বিলাস মদিরা করিয়া পান

হইল বিভল সংযম-বল,
মত্ত চপল হইল প্রাণ,
লালসা-তাড়না জীবন-সাধনা,
স্বার্থ হইল জপ ও তপ,—
যে যেখানে আছ, সবে শুধু বাঁচ
করিতে স্বার্থ-মহোৎসব!
কঙ্কাল-সার নিরন্ন আর
বিবস্ত্র নিঃসম্বলে
কর বঞ্চনা, শুধু প্রতারণা
ছলে বলে আর কৌশলে।
ইহাই বর্ত্তমানের চিত্র,
কিন্তু এ নহে শাশ্বত,
আবার ভারত লভিবে মূর্ত্তি
গৌরবময় অক্ষত।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
অখিল বিশ্বে দেখাতে পথ,—
নির্ভর করে ভারতের 'পরে
নিখিল-বিশ্ব-ভবিষ্যৎ।
রণ-বাহিনীর বাজে জিঞ্জির
বিশ্বের প্রাণে সৃজিয়া আস,
বিশ্বের যারা শত্রু, তাহারা
চাহিছে বিশ্ব করিতে গ্রাস।

দিকে দিকে শুধু মিথ্যার মধু
মুক্ত হস্তে করিয়া দান
হিংসা-ঈর্ষ্যা-ঘৃণা-বিদ্বেষ
তরঙ্গ তুলি' খেলিছে বান
কে পারে কাহারে কত-কাল ধ'রে
পদানত করি' রাখিতে আজ,
শুধু তারি তরে রেষারেষি ক'রে
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-সাজ;—
এর মাঝখানে ভারতের প্রাণে
জাগিবে সত্য বজ্রবৎ,
বান্‌চাল করি' মিথ্যার তরী,
দেখাতে নিত্য সত্য পথ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
ভয় নাই, ভয় নাই কোনো,
যে আছ যেখানে একান্ত প্রাণে
কাণ পেতে মোর কথা শোনো,—
সংযম-বলে হও বলীয়ান,
সাধনার বলে হও মহীয়ান,
নিজ নিজ হৃদি-ক্ষেত্রের মাঝে
ব্রহ্মনামের বীজ বোনো—
ক্ষুদ্র বটের বীজটীর মাঝে
মহা-মহীরুহ লুকাইয়া আছে;

সিঞ্চিবে বারি মহোৎসাহের,
ব্যর্থ হবে না একজনও।
বীর্য্যের বলে মহাকুতূহলে
আরোহণ করি' চিত্ত-রথ
করহ আপন ত্রিভুবন-জন
নেহারি' সবারে আত্মবৎ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,—
এ নহে মিথ্যা কল্পনা,
এ নহে রচিত অলীক কাহিনী,
বল্গা-বিহীন জল্পনা।
দিব্য নয়নে দেখেছি, ভারত
অতিক্রমিয়া মৃত্যু-পথ
ভৃঙ্গার ভরি' অমৃত বিতরি'
বিশ্বের হিতে নিত্য-সৎ।
বর্ত্তমানের দক্ষ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ মহৎ সু-বৃহৎ।

* অখণ্ড-সংহিতা দ্বাদশ খণ্ড হইতে গৃহীত 'ভারতবর্ষ উঠিবে আবার'।

(১০)

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক॥

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ;
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

অখণ্ড সংহিতা

বা

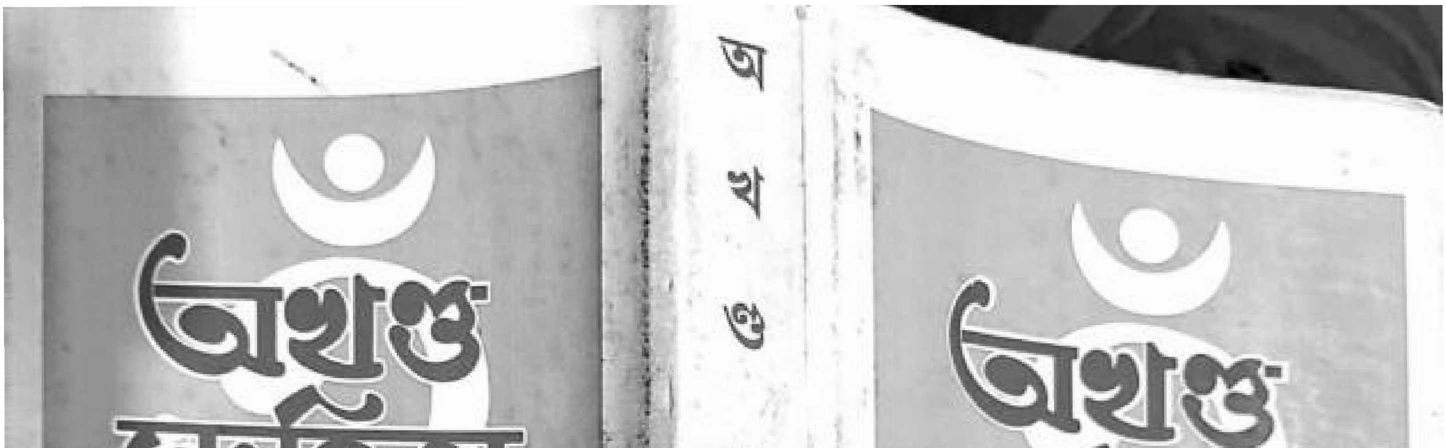
দশম

শ্রী শ্রী স্বামী

খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী


অখণ্ড সংহিতা বা
দশম
শ্রী শ্রী স্বামী
খণ্ড
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের
উপদেশ - বাণী
অখণ্ড - সংহিতা
দশম